কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত দুটি উপন্যাস যুগলবন্দী ও বসন্তরাগ নিয়ে এই 'যুগলবন্দী' গ্রন্থ প্রকাশ করা হ'লো। গ্রন্থ-পিপাসু পাঠক-পাঠিকাদের বইটি ভালো লাগবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

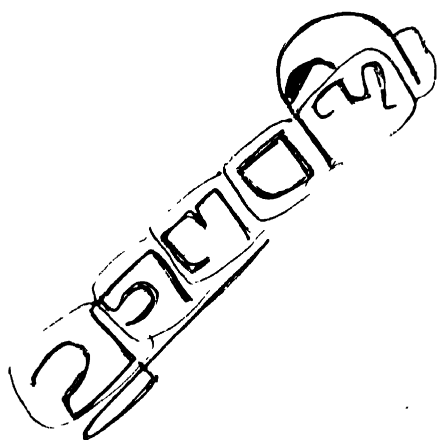
—প্রকাশক

Saroj Choudhury

সাহিত্যম্ প্রকাশিত
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অন্যান্য বই

তারাশঙ্কর বীথিকা	১২·০০
মনের আয়নায়	১২·০০
বিচিত্র রূপিণী	৮·০০

যুগলবন্দী



১১৬১ হিজরীর বর্ষার প্রারম্ভ। আষাঢ় মাস। ইংরিজী ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস। মুর্শিদাবাদে ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী খাঁ মারাঠাদের বাংলা থেকে তাড়িয়ে কটক পর্যন্ত জয় করে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেই অসুখে পড়েছিলেন। কিন্তু তিন মাস পর অসুখ থেকে সেরে উঠেই সংবাদ পেলেন উড়িষ্যা আবার মীর হবিবের সাহায্যে মারাঠারা দখল করেছে। নিজেকে ধিক্কার দিলেন তিনি। ধিক্কার দিলেন—একটা প্রায়-ভিক্ষুক শ্রেণীর লোভীকে বসিয়ে এসেছিলেন উড়িষ্যার নায়েবের গদীতে। তিনি জানতেন, কিন্তু তাঁর যে এ ছাড়া আর উপায়ও ছিল না। কোনো চিন্তাশীল ওমরাহ কি আমীর এ গদীতে বসতে চান নি। কারণ বর্গীদের অত্যাচারে তখন উত্তরে দিল্লী পর্যন্ত পূর্বে বাংলা পর্যন্ত অশান্তির আর শেষ ছিল না। তার উপর উড়িষ্যা মারাঠা রাজ্য এবং সুবা বাংলা প্রান্তসীমা আজ এ দখল করে কাল ও দখল করে। কাজেই এ উড়িষ্যার গদীতে কোনো চিন্তাশীল ওমরাহ বসার চেয়ে সামান্য জীবন যাপন করাকেও নিরাপদ মনে করেছিলেন। কিন্তু রাজা দুর্লভরামের পল্টনের এই মুসলমান সামান্য মনসবদার শেখ আবদুস শোভান—সে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে বলেছিল—'জনাব আলি, মুলুকের মালিক, এই গরীব বান্দার শির জামিন, আর ভরসা দীনদুনিয়ার মালিকের। গোলাম এই দায় পুরতে রাজী।' অগত্যা পাঁচ হাজার আফগান পল্টন তারই তাঁবে রেখে আলিবর্দী সঙ্গে সঙ্গে কটক ত্যাগ করেছিলেন। কারণ সামনে আসন্ন বর্ষা। তাঁর পল্টনের সিপাহীরা একেবারে থ'কে গেছে। তারা যে পরিশ্রম করেছে সে তাদের চেয়েও তিনি বেশি জানেন। তাঁর নিজের কথা তিনি ভাবেন না। বর্ষার সময় বর্গীদের মুলুকে একেবারে সামনে থাকাটা নিরাপদ মনে করেন নি তিনি, ফিরে এসেছিলেন।

বর্গী হাঙ্গামার আগে পাটনায় ছ মাস থাকা তাঁর অন্যায় হয়েছিল। পাটনায় নাতি সিরাজুদ্দৌলাকে নায়েব করে রাজা জানকীরামকে দেওয়ান করে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন গত অগ্রহায়ণে। মারাঠারা তখন বাংলায় ঢুকেছে। জানোজী কাটোয়ায় তাঁবু গেড়ে বসে আছে, সঙ্গে তার মীর হবিব। একটা সাক্ষাৎ শয়তান। পারস্যের সিরাজ থেকে ভাগ্যান্বেষী মীর হবিব হিন্দোস্তানে এসে প্রথমে হুগলীতে গৃহস্থের

বাড়িতে বাড়িতে ফিরি করে বেড়াত, ব্যবসার বস্তুর কোনো-কিছু ঠিক ছিল না। আজ হীরা জহরৎ মুক্তা নিয়ে বেড়াত, কাল মসলিন মলমলের বোঝা পিঠে ফেলে ফিরত। যেটা সে মহাজনের কাছে বলে-কয়ে ধারে পেত তাই নিয়ে বের হ'ত। তা থেকেই তার জীবিকা নির্বাহ হ'ত। লিখতে জানে না, পড়তে জানে না—আছে শুধু আশ্চর্য মিষ্ট মুখ ও কৌতুকপারঙ্গমতা, তার সঙ্গে কুটিল বুদ্ধি। শয়তানের মতো কুটিল বুদ্ধি। আর বলতে পারে খাসা ফার্সী বয়েৎ, তা তার অনেক মুখস্থ। তারই জোরে বড় আমীর মহলে তার ঢুকবার সুবিধা হয়েছিল। এবং সুজাউদ্দিনের জামাই হুগলীর ফৌজদার রোস্তম জং-এর পারিষদ হয়ে নোকরি পেয়েছিল। রোস্তম জং হুগলী থেকে ঢাকা গেল নায়েব হয়ে। মীর হবিব গেল তার পরামর্শদাতা ও পারিষদ হয়ে। মানুষের নসীবের চাকা যখন ঘোরে এবং তখন যদি উঁচু ডালের পর উঁচু ডাল বা উঁচু ধাপের পর উঁচু ধাপগুলিকে আঁকড়ে আঁকড়ে যেতে পারে তবে আর উন্নতির সীমা থাকে না। মীর হবিব রোস্তম জং-এর উন্নতি করে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও অর্থ সঞ্চয় করেছিল প্রচুর। বিশেষ করে ত্রিপুরার রাজার কাছ থেকে সে কয়েক লক্ষ টাকা ঘুষ খেয়ে আরও উন্নতি করে নিয়েছিল। তারপর ঢাকা থেকে রোস্তম জং-এর সঙ্গে এল উড়িষ্যায়। উড়িষ্যার সে নায়েব হয়েছিল। নবাব আলিবর্দী যখন মুর্শিদাবাদ দখল করে রোস্তম জং-এর বিদ্রোহ দমন করতে উড়িষ্যায় যান তখন রোস্তম জং পালিয়ে গেলে সে আলিবর্দীকে আশ্রয় করেছিল—তার চাতুর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে চাকরি দিয়েছিলেন। আলিবর্দী নিজে বিচক্ষণ চতুর—চতুর লোক ভালবাসতেন। তবে চোখে চোখে রেখেছিলেন।

প্রথম বর্গী হাঙ্গামার সময় ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে যখন যুদ্ধ করেছেন আলিবর্দী, তখন মীর হবিব নবাবের সঙ্গে। বর্ধমানে ঘটল বিপর্যয়। আলিবর্দী কোনোমতে আত্মরক্ষা করে লড়াই দিতে দিতে এসে ঢুকলেন মুর্শিদাবাদে। হবিব বন্দী হ'ল মারাঠাদের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক সুবিধাবাদী যোগ দিলে মারাঠাদের সঙ্গে। উড়িষ্যা থেকে বাংলা পর্যন্ত পথঘাট সব তার নখদর্পণে। নবাবী শক্তি তার জানা; এবং ফৌজের নাড়ীনক্ষত্র তার মুখস্থ। উড়িষ্যা মেদিনীপুরের সমস্ত রাজা জমিদারের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। এই রাজারা বিচিত্রচরিত্র। আজ নবাবের পক্ষে, কাল বর্গীর পক্ষে। মীর হবিব

তাদের নিয়ে খেলা করছে। এইসব মূলধন নিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সে খেল খেলে আসছে। বাংলার সর্বনাশ করছে। আজ আট বৎসর সে বাংলাদেশের নসীবের আসমানে শনি-নক্ষত্রের মতো দৃষ্টি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছে। শৃগালের মতো ধূর্ত। নেকড়ের মতো ক্ষুধার্ত। বাঘের মতো তার রক্তের তৃষ্ণা। আবার শশকের মতো সে বনে-জঙ্গলে লাফ দিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। কটক থেকে আলিবর্দী খাঁ বর্ষার কথা ভেবে তাঁর পল্টনের অবস্থা বিবেচনা করেই তাড়াতাড়ি ফিরেছিলেন। ওই উল্লুক অপদার্থ আবদুস শোভানকেই উড়িষ্যার নায়েবীতে বসিয়ে চলে এসেছিলেন। ঠিক সাত দিনের মধ্যেই ধূর্ত শিয়াল চিতাবাঘের চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছিল। অর্থাৎ মীর হবিব এসেছিল বর্গী নিয়ে। শোভান লড়াই দিয়ে আহত হয়ে পালিয়েছে। চরের খবর—শোভান এখন ডাকাতি করছে। উড়িষ্যার জঙ্গলে তার বাসা। ওদিকে মীর হবিব বালেশ্বরে মারাঠা শক্তিকে নতুন বাংলা অভিযানের জন্য সমবেত করছে। মোহন সিং এসেছে মারাঠা ফৌজ নিয়ে। মুস্তাফা খাঁর ছেলে মুর্তজা তার পাঠান পল্টন নিয়ে যোগ দিয়েছে। আলিবর্দী তাঁর আয়োজনে ব্যস্ত হয়েছেন। বাংলাদেশে লোকের মুখ শুকিয়েছে। আবার বর্গী আসছে। অনেক লোক ভাবছে দেশ ছেড়ে পালাবে। কিন্তু পালাবেই বা কোথায়, গোটা হিন্দুস্থানে বর্গী কোথাও নেই। আসে তারা কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো। দেখতে দেখতে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়। ঝড় ওঠে, বিদ্যুৎ চমকায়, বাজ পড়ে, শিলাবৃষ্টি হয়। ঘরের চাল উড়ে যায়, গাছ ভাঙে, পাতা ছিঁড়ে আকাশময় ওড়ে। নিরাশ্রয় মানুষ বাজে পুড়ে মরে, শিলার আঘাতে জখম হয়ে মরে, বৃষ্টিতে ভিজে থরথর করে কাঁপে—বর্গীর হাঙ্গামাও ঠিক তাই। এরই মধ্যে মেদিনীপুর অঞ্চলে মানুষ ব্যস্ত-ত্রস্ত বেশী। বিশেষ করে জমিদার রাজারা। এই অঞ্চলটিতে—বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে জমিদার রাজার সংখ্যা অনেক। সে বহুকাল থেকে। কর্ণগড়, ঝাড়গ্রাম, মহিষাদল, নয়াগড়, নয়াবাসান, হিজলী, ময়না, নয়াগ্রাম, কিয়ারচান্দ ঃ বাঁকুড়ায় বিষ্ণুপুর রাজ প্রভৃতি নিয়ে এ অঞ্চলটি জমিদার জায়গীরদারদেরই রাজত্ব। নবাবের শাসন এখানে ঠিক কোনোকালেই কায়েম নয়। সেই পাঠান আমল থেকে মোগল পাঠানের আধিপত্যের যুদ্ধের লীলাভূমি এবং প্রাচীনকাল থেকে

উড়িষ্যা এবং বাংলার সীমান্ত হিসাবে এই অঞ্চলটি সামন্তদের দ্বারাই শাসিত হয়ে আসছে। নবাবের শক্তি যখন থাকে, দেশে শান্তি বিরাজ করে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় যখন থাকে না তখন নবাব রাজাদের কাছে কর পেয়ে থাকেন, কিন্তু শান্তি না থাকলে পান না। তখন তিনি এদের সীমান্ত রক্ষার জন্য সাহায্য পেলেই সন্তুষ্ট থাকেন। সামন্তেরা, নিজেদের রাজ্য বা জায়গীরের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। নিজেদের সৈন্য, নিজেদের সেনাপতি, নিজেদের বিচার, নিজেদের কোতোয়ালী—সব নিজেদের। জমির চেয়ে জঙ্গল বেশী। বিরাট ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল এখানেই। সে জঙ্গল মেদিনীপুরের সমস্ত পশ্চিম অংশটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এবং বাংলার সীমান্ত পার হয়ে উড়িষ্যার উত্তর-পশ্চিম ও বিহারের দক্ষিণ-পূর্বের মধ্য দিয়ে মধ্যভারতের পৌরাণিক দণ্ডকারণ্য নৈমিষারণ্যের সঙ্গে মিশে গেছে। এরই মধ্য দিয়ে বর্ধমান হুগলী আরামবাগ হয়ে বাদশাহী সড়ক চলে গেছে। ওদিকে বিহার অঞ্চল থেকে সড়ক এসে মিশেছে। আবার চলে গেছে মধ্যভারত অভিমুখে উত্তর-পশ্চিম উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে। অন্যটি চলে গেছে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত—আধুনিক তমলুক অভিমুখে। আবার একটি সড়ক চলে গেছে উড়িষ্যার পূর্বভাগে ঢুকে নীলমাধব জগন্নাথদেবের অধিষ্ঠানভূমি পুরী পর্যন্ত। অন্যদিকে কটক পর্যন্ত। দক্ষিণভাগে সমুদ্র। পূর্বভাগে সমুদ্র। পশ্চিমভাগে সব অরণ্যভূমি। চাষের জমি কম। সাধারণ হিন্দুগৃহস্থেরা চাষ করে, গ্রামের আশেপাশে জমি। কতকাংশ লাল মাটি ও কাঁকরে ভরা রাঢ়ের মাটি। কতকাংশ কালো মাটি। চাষীরা চাষ করে কিন্তু খুব বেশি নয়। কারণ সামন্তে সামন্তে বিবাদ লেগেই আছে। তার উপর আজ তিনশো বছর ধরে চলে এসেছে মোগল আর পাঠানের লড়াই। কয়েকটি নবাব উপাধিধারী পাঠান জমিদারও রয়েছে। তাদের সঙ্গে ছত্রি জমিদারদের বিরোধ বাধে নানান কারণে। কখনও কন্যা দাবি করে। কখনও বলে মন্দিরের চূড়া বেশি উঁচু হয়েছে, খাটাও। ভাঙো।

এ ছাড়া আছে পাইকদের উপদ্রব। পাইকরা এইসব সামন্তদের পাইক। এ দেশের আদিম অধিবাসী। যুগ যুগ ধরে এইসব যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে প্রয়োজনে সামন্তদের দলভুক্ত হয়ে যুদ্ধ করে এসেছে ; যুদ্ধ-বিগ্রহ না থাকার জন্য নিরুৎসাহ এবং ক্লান্তি বোধ করলে শান্ত কৃষকদের গ্রাম

লুঠ করে এসেছে। অন্য সময়ে এইসব জঙ্গল মহলে বাঘ ভালুক নেকড়েদের সঙ্গে লড়াই করেছে। চাষ এরা করে না। অরণ্যের মধ্যেই বাস; অরণ্যের মধ্যেই ঘোরাফেরা। পাইকদের ব্যবহার রূঢ়, এদের চুয়াড় বলে থাকে। এ ছাড়া উত্তর অঞ্চলে আছে বাগ্দী। এরাও রণনিপুণ। সামরিক জাতির মতো উগ্রস্বভাব তখন। বাঁকুড়ায় আছে বাউরি-বাগ্দী ডোম। রাজা লাউসেনের ছিল ডোম বাহিনী—সেনাপতি ছিল কালু সর্দার। বিষ্ণুপুরের রাজার ছিল বাগ্দী বাহিনী, তারা দলমাদল কামান নিয়ে লড়াই করেছে। লড়াই এরা কখনও কখনও এই সব ছত্রি রাজাদের সঙ্গেও করেছে। ছত্রি রাজাদের রাজ্যেও ডাকাতি করেছে। উপদ্রব করেছে। সেই প্রথম যুগে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করেই রাজ্য স্থাপন করেছিল ক্ষত্রিয়েরা। ক্ষত্রিয়েরা এদের বশ মানিয়ে বর্বর যুদ্ধের বদলে উন্নত ধরনের যুদ্ধ শিখিয়ে শক্তিশালী সৈন্যদলে পরিণত করেছিলেন। এমনি একটি দল বাগ্দী পাইক সেনাদল নিয়ে গভীর অরণ্যে বাস করত দলুই সর্দার—দলপৎ সিং।

দলুই সর্দার ক্ষত্রিয়। এককালের রাজবংশধর। শোলাঙ্কী রাজপুত-রাজার বংশের সন্তান। কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে, স্বাধীনতা এবং জীবন-রক্ষার জন্য আজ অরণ্যচারী। কয়েক পুরুষ ধরে এইভাবে বনে বাস করে বিচিত্র ধরনের মানুষে পরিণত হয়েছে।

দলুই সর্দার শোলাঙ্কী রাজপুত। অর্থাৎ অগ্নি কুলের রাজপুত। অগ্নিবংশ, সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের মতই পবিত্র। পুরাণে আছে দৈত্যদের অত্যাচারে মুনি-ঋষিদের যাগযজ্ঞ বন্ধ হয়ে গেলে স্বয়ং মহাদেব যজ্ঞ করে তাতে আহুতি দিতেই চারজন ক্ষত্রিয় বীর আবির্ভূত হয়েছিল। প্রমার প্রতিহার শোলাঙ্কী (চালুক্য) আর চৌহান। তাঁরা দৈত্যদের অত্যাচার নিবারণ করেছিলেন। শোলাঙ্কী বা চালুক্য বংশ একদিন ভারতবর্ষে প্রবলপ্রতাপ ছিল।

চালুক্য বংশের শুক্ল দ্বারকায় রাজা ছিলেন, গুজরাট ছিল তাঁর রাজ্য। গুজরাটে শোলাঙ্কীদের বিপর্যয় ঘটল পাঠান সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর সময়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অগ্নিবংশীয় বীরেরা পরাধীন হয়ে গুজরাটে বাস করতে চান নি। তাঁরা স্বাধীনতাকে মাথায় করে দেশ ছেড়েছিলেন বলতে গেলে নিরুদ্দেশে। ভারতের নানান দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন নূতন স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করবার জন্য। একদল এসে-ছিলেন বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্তভূমে। মেদিনীপুর জেলায়। এখানে

কেদারেশ্বর মহাদেব ছিলেন মাটির তলায়। স্বপ্ন পেয়ে তাঁরা মহাদেবকে এবং উষ্ণ প্রস্রবণ সিদ্ধকুণ্ড আবিষ্কার করে রাজ্য স্থাপন করেন। এই ভূমির নাম তাঁরাই দিয়েছিলেন 'কেদার কুণ্ড'। রাজা ছিলেন মহাবীর মহারাজ বীরসিংহ। রাজধানীর নাম হয়েছিল বীরসিংহপুর।

তখন এখানকার বাগ্দীরা ডাকাতের দল বেঁধে রাজার রাজ্যে উপদ্রব শুরু করেছিল। ক্ষত্রিয়দের উচ্ছেদ করবার ইচ্ছেই বোধ হয় ছিল তাদের। কিন্তু মহারাজা বীরসিং তাদের পরাজিত করে সাতশো জন দুর্ধর্ষ ডাকাতের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। তারপর সাতশো মুণ্ড আর সাতশো ধড় দিয়ে পাশাপাশি দুটো স্তূপ তৈরি করে মাটির পাহাড় তৈরি করিয়েছিলেন মুণ্ডু-মরাই ও গর্দা-মরাই। এর ফলে বাকি বাগ্দীরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। রাজপুতেরাও তাদের যুদ্ধ-শিক্ষা দিয়ে করে তুলেছিল সত্যকারের সৈনিক।

ভাগ্যের দোষে অদৃষ্টের চক্রান্তে যখন মন্দ সময় আসে তখন তাকে রোধ করা বোধ হয় মানুষের অসাধ্য। তা ছাড়া কলিকাল। এই কালে সারা হিন্দুজাতির অদৃষ্টে মন্দ সময় এসেছিল। নইলে যে মুসলমানের কাছে গুজরাটের রাজ্য হারিয়ে ধর্ম এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শোলাঙ্কীরা এসে কেদার কুণ্ডে রাজ্য স্থাপন করে নিশ্চিন্তে বসবাস করছিল, সেখানেও একদিন আবার কেন এল মুসলমানের হানা? গৌড়ের সুলতান মহম্মদ ইলিয়াস শাহ উড়িষ্যা বিজয়ের পথে কেদার কুণ্ড আক্রমণ করলেন। সে যুদ্ধ হয়েছিল প্রবল প্রচণ্ড যুদ্ধ। রাজ-পুতানার মরুবিজয়ী ক্ষাত্রবীর্য আগুনের মতো জ্বলে উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু সংখ্যা যুদ্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। গৌড়ের সুলতান মহম্মদ ইলিয়াস শাহের বিশাল বাহিনীর কাছে মুষ্টিমেয় শোলাঙ্কী রাজপুতের বীর্য বহ্নিবীর্য হলেও কতক্ষণ জ্বলবে? সঙ্গে বাগ্দী সৈন্য অবশ্য ছিল। কিন্তু রাজত্ব ক্ষুদ্র, তার বাহিনীও ছোট, সুলতানের সৈন্যবাহিনীর শক্তি ধুলোঝড়ের মতো বয়ে গিয়ে ধুলো চাপা দিল বহ্নিবীর্যকে, আগুন নিভে যেতে বাধ্য হ'ল। তারপর শুরু হ'ল নিধন পর্ব। সুলতানের সেনাপতি কঠিন আক্রোশে শোলাঙ্কী রাজপুতদের হত্যা করতে হুকুম দিলেন। এ বহ্নিবীজ রাখা চলবে না। এ আবার কোনদিন জ্বলে উঠে সর্বনাশ করবে। নারী শিশু বৃদ্ধ সব হত্যা কর। যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তারা বাঁচতে পারে। যুদ্ধে সবল শক্তিমান যারা তারা সকলেই প্রাণ দিয়েছিল, বাকি যারা ছিল তারা ওই বৃদ্ধ শিশু আর নারী।

বৃদ্ধেরা পরামর্শ করলেন—কি করবেন? শাস্ত্রে আপদ্ধর্মের বিধান আছে। সেই বিধান অনুসারে জাতির বীজ এবং অবশেষকে রক্ষা করবার জন্য স্থির হ'ল আপাতত আত্মগোপন করে বাঁচতে হবে। যারা বয়স্ক, যাদের উপনয়ন সংস্কার হয়ে গিয়েছিল, রক্তবর্ণ উপবীত যাঁদের চিহ্ন তাঁরা বনের মধ্যে সমবেত হয়ে, অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে রক্তবর্ণ উপবীত অগ্নিকে সমর্পণ করে বললেন—তুমি আমাদের বংশের আদিপুরুষ কুলদেবতা, তোমার কাছে গচ্ছিত রইল আমাদের উপবীত। স্বাধীনতা অর্জন করে এই উপবীত যেদিন চাইব সেদিন তুমি আমাদের ফিরিয়ে দিয়ো। এই ভূমিকে চিহ্নিত করবার জন্য ভূমির নাম হ'ল সূতা-ছাড়া।

তারপর তাঁরা আশ্রয় নিলেন স্থানীয় অধিবাসীদের ঘরে। মাইতি মণ্ডল অধিকারী সামন্ত প্রভৃতি নানান ঘরে আত্মগোপন করলেন, এবং আশ্রয়দাতার উপাধিতে পরিচয় দিয়ে আত্মগোপন করে তখন বাঁচলেন।

পরে অবশ্য একাংশ আবার পূর্ব উপাধি এবং উপবীত গ্রহণ করে উড়িষ্যার ক্ষত্রিয় রাজাদের অধীনে কর্ম নিয়েছেন। একাংশ সেই উপবীতহীন অবস্থায় আশ্রয়দাতার উপাধি গ্রহণ করেই কৃষিকর্ম করেন। আর দিন গণনা করেন কবে আসবে স্বাধীনতা। আজ তাঁরা শোলাঙ্কী রাজপুত হলেও শুক্লী নামে পরিচিত। প্রতীক্ষা করে আছেন এদিন কবে ঘচবে।

এরই মধ্যে দলপৎ সিং-এর পিতামহ প্রথম যৌবনে একদল বাগ্দী সৈন্যদের নিয়ে এসে দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বাগ্দী সৈন্য নিয়ে রাজত্ব করতেন অরণ্যের মধ্যে। একেবারে আরণ্য জীবন। অরণ্যই রাজত্ব। সেখানে অবাধ স্বাধীনতা। না থাক সভ্যতা।

*　　　　*　　　　*

এর দুপুরুষ পরের পুরুষ দলুই সর্দার।

দলুই সর্দারের জীবনেও একটা দারুণ বিপর্যয় এসেছিল। সেই বিপর্যয়ের ফলে দলুই সর্দার তার অনুগত বাগ্দী পাইকদের নিয়ে পিতামহের স্থাপন করা অরণ্য রাজ্য ছেড়ে আরও নিবিড়তর জঙ্গলে এসে বসতি স্থাপন করে, সেইদিন গণনা করছে কবে অসেবে সুদিন সুপ্রভাত। সে আজ বিশ বৎসর হয়ে গেল।

দলুই সর্দার নিজেই জায়গাটার নামকরণ করেছে 'ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড়'। 'জঙ্গলগড়' কথাটার সঙ্গে ছত্রিশ জাতিয়া শব্দটা যোগ হওয়ার একটা কারণ আছে। এখানে বিশ বছর আগে—ছত্রিশ জাতিয়া নামে একটা বিচিত্র জাত বাস করত। তারা এদের কাছে হার মেনে এদের সঙ্গেই বাস করছে।

উড়িষ্যার সড়ক থেকে দূরে একটা গভীর জঙ্গল এবং পাহাড়ে জায়গার উপর ছোট একখানি গ্রাম—ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড় গ্রামে ঘর তিরিশেক পাইকের বাস। তবে পাহাড়টার মাথাটা এবং আরও কয়েকটা ছোট পাহাড়ের মাথায় আরও খান-আষ্টেক গ্রাম নিয়ে বেশ ছোট একটি পাইক রাজত্ব বলা চলে। এরই মধ্যে খড়ের চাল কিন্তু মোটা মোটা পাথর ও কাদায় গাঁথা দেওয়াল, খোয়া পিটানো মেঝে, একখানি অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ি। সামনে একটা চণ্ডীমণ্ডপ। তার সামনে শক্ত শালকাঠের খোদাই খুঁটির উপর তৈরি একটা আটচালা। আটচালার সামনে পাথর-কাদায় গাঁথা দুটো মোটা খাটো থাম—অর্থাৎ ফটক। আটচালায় একটা বড় নাগরা। এটি এখানকার এই দশখানা গ্রামের পাইক সমাজের সর্দার দলুই শুক্লীর বাড়ি। দলুই সর্দার নতুন অভিযানের খবর পেয়ে চণ্ডীমণ্ডপে বসে ভাবছিল বিশ বছর আগে যখন তারা এখানে প্রথম এসেছিল তখনকার কথা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল মীর হবিবের ধ্বংস না হলে লোকসমাজে সে ফিরবে না। শোলাঙ্কী রাজপুতদের জীবনে যে বিপর্যয় কয়েক পুরুষ আগে এসেছিল তার পিতামহের আমলে, তারপর দলুই সর্দারের আমলে এই মীর হবিবের চক্রান্তে এসেছিল দ্বিতীয় বিপর্যয়। তখনই এই প্রতিজ্ঞা করেছিল সে।

বিশ বছর পূর্বে চন্দনগড় জায়গীরের রাজা মাধব সিং-এর মৃত্যুর পর তারা ওই জায়গীরে তাদের বসত ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে আত্মগোপন করে এখানে এসে বসবাস স্থাপন করেছে। তখন ওরা সংখ্যায় ছিল কম। মীর হবিবের চক্রান্তে মাধব সিং রাজা—তাঁর জামাই খুন হয়েছেন। সমস্ত সক্ষম শুক্লী রাজপুত আর বাগ্দী পাইকরা লড়াই করে মরেছে। বাকি কিছু সক্ষম পাইক আর নিজের কন্যাকে নিয়ে দলুই সর্দার এখানে এসেছিল। আর সঙ্গে ছিল কেবল পাইকদের মেয়েছেলেরা। এখন ওরা দশখানা গ্রামে বিশ থেকে তিরিশ ঘর হিসেবে আড়াইশো ঘর। তখন সংখ্যায় ছিল একশো-

জন। তার মধ্যে তিরিশজন জোয়ান, বাকি সব মেয়েছেলে। চন্দনগড়ে ওরা ছিল চার-পাঁচশো জোয়ানের একটি দল। কিন্তু চন্দনগড়ের ছত্রি সেপাইরা তাদের সমূলে ধ্বংস করবে বলে আক্রমণ করবার উদ্যোগ করতেই ওরা বেরিয়ে পড়ে। হাজার দেড়েক ছত্রি পল্টন তাদের আক্রমণ করতে তারা ঘুরে দাঁড়ায়। জনকয়েক ছেলেমেয়েদের নিয়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করে। যারা লড়াই দিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল তাদের বড় কেউ ফেরে নি। দলুই সর্দার বাকি জোয়ান আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিবিড় থেকে নিবিড়তর জঙ্গলে প্রবেশ করে। এখানে এসে একদিন রাত্রে বিশ্রামের জন্য থামে। অনেক রাত্রি অনেক জায়গায় তারা থেমেছে, আবার সকালে যাত্রা করেছে। থামবার ইশারা ছিল জল। সন্ধ্যার মুখে জল সন্ধান করে যেখানে জল পেত, সেখানেই তারা গাছতলায় গাছতলায় রাত্রের আস্তানা পাতত। কিন্তু রাস্তার ধারে নয়। যাত্রা বলতে গেলে নিরুদ্দেশ।

সেদিনও সন্ধ্যার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে সর্দার কয়েকজনকে চারিদিকে জলের সন্ধানে পাঠিয়েছিল। যারা যেত তারা হাতে কাটারি আর পিঠে বর্শা বেঁধে নিয়ে যেত; যাবার সময় যেত পথের গাছে কোপ মেরে দাগ রেখে রেখে, অধিকন্তু গাছের ডালও কেটে কেটে ফেলে যেত। যেটার নিশানা ধরে তারা পথ না হারিয়ে ঠিক ফিরে আসত। সেদিন দলুই সর্দারের চিন্তার অবধি ছিল না। কারণ তার একমাত্র কন্যা পূর্ণগর্ভা, তার শরীর সেদিন ভাল ছিল না। দলের মেয়েদের মধ্যে প্রবীণা অম্বিকে বাগ্দিনী এসে তাকে বলেছিল—সর্দার, আর হাঁটা হবে নাই বাপু, থামতে হবেক।

তখন বেলা তিন প্রহর। দলুই জিজ্ঞাসা করেছিল, ক্যানে? তু যদি না পারছিস তো ওই একটো ছালার ঘোড়ার পিঠে চড়্। লইলে কারুর পিঠে ওঠ্। না পারিস তো থাক্ পড়ে। বাঘে তুকে ধরে খাক্।

—উঁহু। সি লয়। রুক্মিণীর শরীলটো খারাপ করছেক। কি হয়!

চমকে উঠেছিল দলুই। রুক্মিণী আসন্নপ্রসবা। তার এই প্রথম সন্তান এবং তার এই শেষ।

রুক্মিণী বিধবা হয়েছে। সদ্য-বিধবা সে। সিঁথির সিঁদুর মুছে সে চেপেছে

ডুলিতে। কেঁদেছে যদি তবে ডুলির মধ্যে বসে কেঁদেছে। জানলে একমাত্র জানে ওই বুড়ী অম্বিকা বাগ্দিনী। অম্বিকাই তাকে মানুষ করেছে তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর। লোকে অম্বিকাকে তার দাসী ও স্নেহের পাত্রী বলে—সে তা অস্বীকার করে না।
সে এখন শুক্লী—আগে ছিল শোলাঙ্কী। রাজপুতানার শোলাঙ্কী রাজপুত। তারা ভীলেদের কন্যা ছিনিয়ে আনত। এখনও আনে, আনে এই সব জাত থেকে।

যে জায়গাটার কথা হচ্ছিল সেটা আস্তানা গাড়বার পক্ষে ছিল অত্যন্ত খারাপ জায়গা। একজন ছোকরা বাগ্দী একটা খুব উঁচু গাছে চড়েও জল দেখতে পায় নি। তার উপর জঙ্গলের আবরণ ছিল বড় পাতলা। আধ ক্রোশ দূরে একটা সড়ক। সেখানকার রাহীদের চোখে পড়বার ভয় আছে। দলুই সর্দার বলেছিল সকলকে ডেকে—হাঁকিয়ে চল, জোরে চল।
ডুলির বাহকদের সঙ্গে চলেছিল জন বিশেক জোয়ান, আর ঘোড়াগুলো। দলে মানুষই শুধু ছিল না, তার সঙ্গে কুড়িটা ঘোড়া ছিল। গোটা তিরিশেক গরু ছিল। তাদের পিঠে ছিল তাদের ঘর-সংসার—যাযাবরের সংসারের মতো। ছেলেমেয়ে গরু প্রভৃতি নিয়ে তিরিশজন জোয়ান, জনা দশেক বৃদ্ধ মন্থরগমনে পিছিয়ে আসছিল পথের নিশানা ধরে। আগের দলের জোয়ানেরা ওই গাছের ডাল কেটে কেটে নিশানা রেখে যাচ্ছিল।
সন্ধ্যে হয়-হয় এমন সময়ের মুখে উৎকণ্ঠিত দলুই সর্দার পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত মুখে জল খুঁজতে পাঠিয়েছিল। এখনও দণ্ড দেড়েক বেলা আছে। যে জায়গায় তারা এসে পৌঁছেছিল—সে জায়গায় বনটা নিবিড়। সামনে খানিকটা পশ্চিমে কয়েকটা পাহাড়, তার তলায় জঙ্গল আরও ঘন। রাত্রিতে আর অগ্রসর হওয়া যাবে না। গেলে ওই পাহাড়ের বাধায় ঠেকতে হবে। রাত্রে ক্লান্ত মানুষ জানোয়ার কারু পক্ষেই সম্ভবপর নয় পাহাড়ে ওঠা বা পথ খুঁজে বের করা। সড়ক অনেকখানি ছেড়ে বনের ভিতর ঢুকেছে তারা। সেখানেই থেমেছিল। মনে ভরসা হয়েছিল পাহাড় যখন আছে তখন নিশ্চয়ই ছোটখাট কোনো জোড় বা নদী মিলবেই। বইবে তারা পূর্ব মুখে, কিংবা দক্ষিণ মুখে। কারণ পূর্ব-দক্ষিণে সমুদ্র আছে।

কিছুক্ষণ পর লোক ফিরে এসে বলেছিল নদী একটা আছে। জল সে সঙ্গে এনেছিল। রাস্তার নিশানাও রেখে এসেছিল। সেই নদীর কাছাকাছি গিয়ে তারা আস্তানা গেড়েছিল রাত্রির মতো। সারা রাত্রি প্রসববেদনায় কাতরেছিল রুক্মিণী, কিন্তু প্রসব হয় নি। একটা জায়গা কাপড় দিয়ে ঘিরে তার মধ্যে রুক্মিণীকে নিয়ে বসেছিল অম্বিকা এবং ওদের অন্য প্রবীণারা। দলুর বিধবা বোনও ছিল। থাকবার মধ্যে দলুর আছে ওই বোন আর মেয়ে। সন্তান হয়েছিল ভোরবেলা সূর্যঠাকুরের উদয়-লগ্নে। পাখির ডাকের সঙ্গে শিশুর কান্না মিশে গিয়েছিল। দলু সর্দার সারারাত্রি উদ্বেগে জেগেই বসেছিল। ঘুম আসে নি। বনের রাত্রির স্তব্ধতা বড় বিচিত্র। সারা অরণ্য জুড়ে ঝিঁঝিঁর ডাক, বনজোড়া অন্ধকারের মধ্যে একটা বনজোড়া নিরবচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহ বেয়ে যায়। অন্ধকারই যেন গুনগুন করে কাঁদে, নয়তো অবিরাম মৃদু তরঙ্গে হাসে। নয়তো ঘুঙুর পরে নাচে। তার আর উঁচুনীচু পর্দা নেই, একটানা—এক পর্দায়। মধ্যে মধ্যে নিশাচর পাখি ডাকে। কোনো পাখি হা-হা করে হাসে, কোনো পাখির বাচ্চারা চেঁচায়—যেন কাঁদে। প্রহরে প্রহরে প্যাঁচাদের সমবেত ডাক ওঠে। শেয়ালেরা ডেকে ওঠে। মধ্যে মধ্যে হোঁ-হোঁ নেকড়েরা ডাকে। বড় খ্যাঁকশেয়ালী খ্যাক-খ্যাক শব্দ করে ডাকে। দূরে শম্বরেরা ডাকে। সারা রাত্রির মধ্যে বার তিনেক বড় বাঘের গর্জনও শুনেছে দলু।

তারই মধ্যে পথশ্রান্ত ছেলেমেয়েরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে; কোনো উদ্বেগ হয় নি, আতঙ্ক হয় নি। জঙ্গল মহলের বাসিন্দা তারা, এসবের কিছুই তাদের কাছে নতুন নয়। রাজাদের বাসস্থান মাত্র একটা বড় গ্রাম। একটা মাটি ও পাথরের পাঁচিলের মধ্যে গড়, সেই গড়ের মধ্যে রাজবাড়ি। দু-চারখানা পাকা ছাদের দালান, বাকি সবই মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, পোড়া শালকাঠের কাঠামো। শালকাঠ এখানে প্রচুর। শালকাঠের দেওয়াল মেঝে-ঘরেও আছে কিছু কিছু। গড়ের বাইরে গ্রাম। দু'চার, বড় জোর আট-দশখানা দোকান; আর থাকে একটা হাট। হাটগুলো বড় হয়। গ্রামের আশপাশ থেকেই জঙ্গল শুরু। গ্রামের বাসিন্দারা প্রকৃতপক্ষে বনের মধ্যেই শুয়ে থাকে, ঘুমোয়, বাস করে। কিছু কিছু চাষের জমি থাকে। তার চারিদিকেও অরণ্য। নবাবী সেরেস্তায় অঞ্চলটার নামই জঙ্গল মহল। আর বাগ্দীদের বসবাস বলে একটা পরগনার নামই হয়ে গেছে বাগড়ী পরগনা।

পাইক বাগ্দীদের ছেলেমেয়েরা পুরুষ বৃদ্ধ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে। ঘুমোয় নি কেবল যারা পালা করে পাহারা দিচ্ছিল তারা। আর ঘেরার মধ্যে প্রসবযন্ত্রণাকাতর রুক্মিণী, তার দুই পাশে অম্বিকা বাগ্দিনী ও দলুইয়ের বিধবা বোন অহল্যা আর দাইয়ের কাজ জানা মাসী। দলুই চোলাই মদ খেয়েছে, আর কল্কেতে সেজে শুখা তামাক টেনেছে। তার সঙ্গে শুধু ভেবেছে—রুক্মিণী যদি মরে যায়! হে ভগবান, হে গোবিনজী, হে কিষণজী, হে রাম! তার গোবিন্দ-কিষণজী তার সঙ্গেই আছে। তাকে সে ভুলে আসে নি। সারাটা পথ সেই চন্দনগড় থেকেই সে বলতে বলতে আসছে, তুমি শেষে এই করলে কিষণজী! এই তোমার মনে ছিল গোবিনজী! সে-সব কথা আজ এই খবর শুনে যেন নতুন করে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে সেদিন সে ভেবেছিল—হায় কপাল! এককালের শোলাঙ্কী রাজপুত তারা। তাদের দেবতা শিব আর কিষণজী। বীরসিংহে তাদের শিব এখনও আছেন। মহারাজ বীরসিংহের বংশতারা তারা বারভাইয়া শুল্‌কি। মহারাজার রাজ্যে সেনাপতি মন্ত্রী নিয়ে ছিল বাহাত্তরজন রাজপুত, তাদের বংশধরেরা বাহাত্তর-বরি, বাকি পল্টনের লোক সাধারণ রাজপুত। তারা দশাশই। দলুইয়ের পিতামহ জ্ঞাতি এবং পাইকদের নিয়ে বাস করত তখন আর এক জঙ্গলের মধ্যে—বীনপুরের থেকেও পাঁচ কোশ দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটি গ্রামে। একটা ছোট নদী ওখান থেকে গিয়ে মিশেছিল কাসাইয়ে। সেই ছোট নদীর ধারে; অঞ্চলটা ঘন বনের অঞ্চল। তারা রাজপুত দশ-বারো ঘর ছাড়া বাগ্দীরা ছিল প্রায় শ দুয়েক ঘর। তার পিতামহ ছিলেন সকলের মালিক। তার পর তাঁর এক ছেলে—ছেলে মারা গেল জোয়ান বয়সে তিন ছেলে রেখে। এই তিন ছেলেকে মানুষ করেছিলেন সেই বৃদ্ধ বীর ভূপৎ সিং। তিনি তিন নাতির মধ্যে ভাগ করে দিয়ে গিয়েছিলেন পাইকদের মালিকানি স্বত্ব। দলু ছিল পঁচিশ ঘরের সর্দার। পঁচিশ ঘর মানে—একশো পঁচিশ ত্রিশ বাগ্দী পাইক। পঞ্চাশ বছরের বাপ—তার দুই তিন ছেলে। বত্রিশ থেকে বাইশ তাদের বয়স। তার সঙ্গে বড় ছেলের ছেলে চোদ্দো-পনরো বছরের। আবার যার বয়স ষাট-বাষট্টি—তার ছেলের বয়স বিয়াল্লিশ-চল্লিশ থেকে ছোটর বয়স বত্রিশ। তার ঘরে বাইশ থেকে পনরো-ষোলো বছরের ছয়-সাত নাতি। বাগ্দী পাইকের ছেলে, চুয়াড় পাইকের

ছেলে বারো বছর থেকে লড়াই শেখে। লাঠি, তীর, ধনুক, গুলতি, তলোয়ার, বর্শা চালাতে শেখে।

দলুর বড় ভাই গুনা সর্দার ছিল সবার উপরের মানুষ। গণপৎ আর দলপৎ তাদের নাম। ছোট ভাইয়ের নাম ছিল ধনপৎ—ধনা সর্দার। এরা ভগবান ছাড়া কারুর অধীন ছিল না। এই অরণ্য-রাজ্যে আপন আপন সর্দারি নিয়ে বাস করত। কোনো রাজার সঙ্গে কোনো রাজার বিবাদ উপস্থিত হলে এরা সে সময় তাদের কাছে টাকা নিয়ে যুদ্ধ করত। মধ্যে মধ্যে বনে বনে দূরদূরান্তর গিয়ে চাষেবাসে সমৃদ্ধ সমতল গ্রামগুলি লুঠে ধান চাল টাকাকড়ি নিয়ে আসত। অনেক সময় হুকুমনামা পাঠাত—আমরা যাব, আমাদের জন্য যেন এই সব মাল মজুত থাকে। অনেক সময় ওদিকে উড়িষ্যা, এদিকে চন্দ্রকোণা সড়ক ধরে এগিয়ে যেত। যে-সব মহাজন মাল নিয়ে যেত, তাদের কাছে কর আদায় করত। বাধা দিলে সব লুঠে নিত। নবাবী ফৌজের পিছনেও তারা লুঠেছে, পাঠান ফৌজেরও লুঠেছে। ছোটখাট ফৌজের দলের উপর এদের লোভ বেশি, আর তাদের সঙ্গে লড়াই করে আনন্দও বেশি। তাতে শুধু রসদই মেলে না, টাকাকড়িই মেলে না, তার সঙ্গে হাতিয়ার মেলে। এবং এইসব পেশাদার সিপাহীদের সঙ্গে লড়ে হারিয়ে গৌরবও অনুভব করে বেশি। লুটতরাজ করে এসে তাদের পিতামহের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরে জয়ধ্বনি দিত। থরথর করে গাছের পাতা কাঁপত। বনে বনে শব্দ ছুটে যেত দূরে দূরান্তরে। ঘণ্টা বাজত দেবতার মন্দিরে—বলত খাজনা এসেছে তাদের রাজ্যের। ওদের বাড়িতেই ছিল ওদের ঠাকুর। উপবীত ত্যাগ করে ভিন্ন উপাধি নিয়েও স্বধর্মের বীজটুকু ওরা হারায় নি। পৈতে ফেলেও ওরা কিষণজী গোবিনজী মহামায়াকে ভোলে নি। পিতামহের ঠাকুর—গোপাল, কিষণজী আর মা যোগমায়া। ঠাকুরগুলি পাথরের। উড়িষ্যা থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন ওদের বাপ। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পিতামহ ভূপৎ সিং। তাদের তিন ভাইকে ভাগও করে দিয়েছিলেন ওই তিনি—ভূপৎ সিং—দলুর দাদো অর্থাৎ পিতামহ। বড় নাতিকে তিরিশ ঘর, মেজকে পঁচিশ ঘর, ছোটকে বিশ ঘর পাইক যেমন দিয়েছিলেন তেমনি দিয়েছিলেন তিন ঠাকুর তিনজনকে। গোপাল তাদের প্রথম

ঠাকুর, সেই ঠাকুর পেয়েছিল গণপৎ। দলপৎ পেয়েছিল কিষণজী, ধনপৎকে দিয়েছিলেন যোগমায়ার সেবা।

তিন ভাই বিপদে এক হলেও অন্য সময়ে ছিল পরস্পরের বিরোধী। চলত প্রতিযোগিতা চলত দেবসেবার সমারোহ নিয়ে। তা ছাড়া ছোটখাট ঝগড়া তো ছিলই।

দলুর কন্যাভাগ্যে কিষণজী যেন জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন। সাত-আট বছর বয়স থেকে 'ফিরানি' কাপড় (গামছার আকারের) কোমরে জড়িয়ে গায়ে একটা কাঁচুলি পরে কিষণজীর মন্দির-অঙ্গন পরিষ্কার করত, পূজার ফুল তুলত, সন্ধ্যার সময় হাতে তালি দিয়ে নাচত। মাঝেমধ্যে সন্ন্যাসী সাধু আসতেন। অরণ্যভূমের শুক্লী যাদের দেহের ভিতরে রাজপুতানার শোলাঙ্কী রাজপুতের রক্ত, তাদের ঘরের মেয়েরা খেলতে খেলতে চলে যেত বনের মধ্যে। তখন থেকেই বনকে চিনত। বনের মধ্যে যে রহস্যময়ী প্রকৃতি আছে—যার বিচিত্র রূপ, যার এক অঙ্গে ফুলের হার, ফুলের কঙ্কণ, সে অঙ্গের পরনে গাছের বাকল, পাতার পাড়, লতার বালা, সেদিকের হাতের বীণায় বাজে পাখির গান, ঝরনার শব্দ—তার অন্য অঙ্গের দিকে তাকালে শিউরে উঠতে হয়। অন্য অঙ্গে ফুলের হারের আধখানা হয়েছে সাপের হার। সেদিকে হাতে বৃশ্চিকের বাজুবন্ধ, প্রকোষ্ঠে হাড়ের কঙ্কণ, হাতের আঙুলে বাঘের নখ। সে হাতে আছে ভয়াল শিঙা, তাতে ফুঁ দিলে জাগে বাঘের ডাক, হাতীর গর্জন। সেদিকের অঙ্গে পরনে আছে বাঘের ছাল—তাতে অজগরের চামড়ার পাড় বসানো। বনের ঠাকুরানীর একদিকের ঠোঁটে হাসি, অন্যদিকে ক্রোধ হিংসা। একদিকের মুখে খায় মধু—অন্যদিকের মুখে ওগরায় বিষ। এ প্রকৃতিকে বনের মেয়ে চেনে। বনের মেয়ে, তার উপর শুক্লীর মেয়ে, তাকে সে ভয় করে না। ছোটবেলা থেকে তার সঙ্গে মিতালি তার। চলে যেত বনে ফুল তুলতে, চলে যেত ফলের সন্ধানে, চলে যেত সজারুর কাঁটা খুঁজতে। পাখি দেখতে। সঙ্গে থাকত বাগ্দিনী সঙ্গিনীরা। একবার বনের মধ্যে গাছতলায় এক সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে তাকে হাতের ফুলগুলি দিয়ে হাত জোড় করে বলেছিল, সাধুজী, আমাদের বাড়িতে কিষণজীর মন্দিরে সেবা নিবেন আসুন। সন্ন্যাসী এই মেয়েটির অনুরোধ আর কিষণজীর নাম—এ ঠেলতে পারেন নি। এসেছিলেন। কিষণজীকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম

করে বলেছিলেন, ক্যা নয়া খেল্ খেল্‌নে কো লিয়ে ইয়ে বনমে ফিন বনবিহারী বন্ গিয়া রে খেল্‌নেওয়ালা। বড়া বদ্‌মাস হো তুম—বড়া বদ্‌মাস। ইয়ে লেড়কী কি বন্ধনমে গির গয়্যা? আঁ?

যাবার সময় বলেছিলেন, সর্দার, শুনো বেটা। ইয়ে লেড়কী তুমহারা বহুৎ ভাগ্‌মানী হ্যায়, কিষণজীকে পিয়ারী হ্যায়। ইয়ে তো বাবা রানী বনেগী, রাজমাতা হোগী। ইন্‌কি কভি কুছ খারাব নেহি বোল্‌না। কভি না। হুঁ! তোমারা কুল, বন্‌শ্ উজালা কর্ দেগি।

সেই অবধি দলু মেয়েকে কিছু বলে নি। বলত না কখনই। স্ত্রী মেয়েকে দু বছরের রেখে মারা গিয়েছিল, কিন্তু সে আর বিয়ে করে নি। তা বলে সে ব্রহ্মচারী ছিল না। অরণ্য-জীবনে দুর্বার মোহ আছে। সেই মোহবশে তার তখন তিন চারটি সেবিকা। তারা বলে 'রাখনি'। তার মধ্যে দুটো ছিল লুঠে আনা মেয়ে। আর এই অম্বিকে বাগ্দিনী। বালবিধবা অম্বিকেকে সে প্রথম যৌবনে স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভালবেসে ঘরে এনেছিল। অম্বিকেই মানুষ করত রুক্মিণীকে।

রুক্মিণীর আদর ছিল যথেষ্ট। সে আদর আরও বাড়ল সাধুজীর কথায়। সে কিষণজীকে নিয়ে প্রায় খেলা শুরু করে দিলে। মধ্যে মধ্যে বাপকে বলত, বাবুজী, আজ কিষণজী এই মিঠাই খেতে চেয়েছে। দলু বিশ্বাস করত এবং সেই মিষ্টি যোগাড় করে ভোগ দিত। এমনি নানানতর কথা বলত রুক্মিণী।

একবার সে বললে, বাবুজী, কিষণজী বলেছেন তুই নাচ শেখ রুক্মিণী, তোর নাচ আমি দেখতে ভালবাসি। গীত তুই ভালই গাস। আমি নাচ শিখব বাবা।

দলু সর্দার তাও অবিশ্বাস করে নি। অনেক ভেবেচিন্তে বিষ্ণুপুরের দরবারে গিয়ে সেখান থেকে নিয়ে এসেছিল নাচিয়ে এক প্রৌঢ়া বাঈকে। নিয়ে আসা ঠিক নয়, প্রায় চুরি ডাকাতি করে এনেছিল। পাণ্ডা সেজে গিয়ে বলেছিল, আমি আসছি পুরী থেকে। মহাপ্রভুর বড় ইচ্ছা তোমার নাচ দেখেন। অবিশ্বাস করো না। তোমার টাকা অলঙ্কারের ভয় তুমি করো না। তুমি শুধু চল, একটি অলঙ্কার নেবে না, একটি পয়সা নেবে না, সব আমাকে দিতে হুকুম হয়েছে। ভেবে দেখ, তোমার যৌবন গেছে, রাজদরবার তোমাকে ডাকে না, যারা রূপ যৌবন বিলাসী, তারা তোমার দিকে

তাকায় না। সুতরাং কোনো লোভে আমি আসি নি। দেবতার হুকুমে এসেছি।

প্রৌঢ়া অবিশ্বাস করে নি। সে সানন্দে রাজী হয়েছিল। দলু বলেছিল, কিন্তু একলা যেতে হবে। আমি তোমাকে ডুলি করে নিয়ে যাব।

শহরের বাহিরে তার দল ছিল, ডুলি ছিল। সকলেই পুরীর লোক সেজেছিল। তারপর নিয়ে এসে তুলেছিল তাদের অরণ্যের আস্তানায়। সেখানে কিষণজীর মন্দিরের সামনে তাকে নামিয়ে বলেছিল, ইনিই মহাপ্রভু। যিনি জগন্নাথ তিনিই কিষণজী। এঁর আদেশই আমি গিয়েছিলাম। রুক্মিণীকে কাছে এনে দেখিয়ে সকল বৃত্তান্ত বলেছিল শপথ নিয়ে। তারপর বলেছিল, রুক্মিণীকে আমার নাচ শিখিয়ে দাও বাঈ। আমি তোমাকে বলছি তুমি আমার মা, আমি তোমাকে ছেলের মতো রক্ষা করব, যত্ন করব, আর নাচ শেখানো হলে আমি নিজে তোমাকে পুরীতে নীলমাধব দর্শন করিয়ে আনব।

সে-কথা সে রেখেছিল। এককালের নামকরা লাস্যময়ী সরস্বতী বাঈ যে যৌবনে লাস্য ও রূপের জন্যে নাম পেয়েছিল সুরতিয়াবাঈ, সে প্রৌঢ় বয়সে এখানে ওই কিষণজীর সামনে রুক্মিণী বেটিয়াকে নাচ গান শেখাতে এসে বদলে গিয়েছে। এবং পুরী যাবার সময় বলেছিল, সর্দার বাপুজী, তোমাকে, তোমার বেটীকে আমার বহুৎ বহুৎ আশীর্বাদ দিয়ে যাচ্ছি! তোমরা আমাকে ওই নাগরের প্রসাদ দেওয়ালে। আমার জিন্দেগী সফল হয়ে গেল। ধন্য তোমার বেটী। তবে তোমার বেটীকে আমি শুধ্ নাচ আর গান শেখাই নি, আরও অনেক দিয়েছি। ও যদি কোনো রাজার সামনে দাঁড়ায় তবু ঠকবে না। ওই নাগরের সামনে দাঁড়াবার মূলধন—সে ওর আছে। তাই ও আমাকে দিয়েছে।

রুক্মিণী সত্যসত্যই আশ্চর্য কন্যা হয়ে উঠেছিল। লাস্যে হাস্যে বাক্‌চাতুরিতে সুরতিয়াবাঈ বলতে গেলে ওকে নাগরী করে তুলেছিল। মুখে মুখে উর্দু গান বয়েৎ মুখস্থ করিয়েছিল।

রুক্মিণীর বয়স যখন ষোলো তখন বিয়ের সমস্যায় দলু সর্দার খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। একে তারা শুক্লী, তার উপর দলুরা বনে বাস করে অরণ্যের মানুষ হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে নিজের জাত ছাড়া

কারুর সঙ্গে চল নেই। এ মেয়ে দেবে কার হাতে? নিজেদের জ্ঞাতির মধ্যে তারা আবার বারোভাইয়া; জানাশোনা বারোভাইয়া যারা তাদের ঘর খোঁজ করে কোনো ছেলেকেই পছন্দ হচ্ছিল না তার। এমন সময় একদিন রুক্মিণী বললে, বাপ্!

—কি বেটী?

—তুমি আমার শাদির লেগে মাথা ঘামিয়ো না। আমার মন উঠছে না বাপ।

সাধুর কথা স্মরণ করেও দলু বলেছিল, কার হাতে তুকে দিয়ে যাব বেটী? আমি অমর লই। মরব তো একদিন।

—কেন বাপ্, ওই তো রয়েছে কিষণজী!

—তোর সঙ্গে কথা হয় বেটী?

—না বাপ্, আমি বলি, ও বলে না। তা বলাব একদিন। আর না বলে তোমার সর্দারী আমি করব।

—তুই আমায় কাছে ঠিক বাত বলছিস না। কিষণজীর সঙ্গে বাত তোর হয়।

রুক্মিণী হেসে বলেছিল, না গো, বাপ্, আমি ঝুটা কেন বলব তোমাকে?

তবু বিশ্বাস করে নি দলু। সে বিশ্বাস করেছিল তার মেয়ের সঙ্গে কিষণজী কথা কয়, সে তার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু হাজার হলেও বেটী, আর সে তার বাপ, লজ্জায় বলতে পারছে না।

অম্বিকাও তাকে তাই বলেছিল।

রুক্মিণী শুক্লীর মেয়ে, ছেলেবেলা থেকে অরণ্য-জীবনের স্বভাব-ধর্মে আত্মরক্ষার জন্য তীরধনুক বর্শা ছুঁড়তে শিখেছিল। একটা বাজপাখি পুষেছিল। পাখিটা ছিল পক্ষিণী। ইচ্ছে করেই সে পুরুষ পাখি পোষে নি। বলেছিল, ওই একটা পুরুষ পুষেছি, তাকেই মানাতে পারছি না, আবার পুরুষ পোষে!

পাখিটা নিয়ে শিকার করতে যেত। তীরধনুক নিয়েও শিকার করত। আজ থেকে একুশ বছর আগে দোলের পর কিষণজীকে নিয়ে সে এবং তার সখী সম্প্রদায় মিলে গিয়েছিল বনভোজনে। তাদের গ্রাম থেকে ক্রোশখানেক দূরে ঝরনার ধারে বনভোজন। ঠাকুরকে একটা পাথরের উপর বসিয়ে চলছিল তাদের নাচ গান। তামাশা রঙ্গ সব ওই দেবতাটিকে নিয়ে। এরই মধ্যে হঠাৎ তার বাজপক্ষিণী

—সেটা ছিল একটা গাছের ডালে বাঁধা, সেটা উড়বার জন্য ঝটপট করে সারা হয়েছিল। কি হ'ল তারা প্রথমে বুঝতে পারে নি। হঠাৎ এক সখী আকাশের পানে তাকিয়ে বলেছিল, হুই দেখ সর্দার বেটী, হুই দেখ। বলে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

—কি ? কি ?

—হুই ! হুই ! দেখ আকাশের পানে চেঁয়ে। হুই সাদা পারা—হুই উড়ছে—ছুটছে গ !

দেখেছিল তারা। এবং বুঝতে পেরেছিল আর একটা বাজপাখি উড়ে চলেছে ঠিক সাদা হাউইয়ের মতো। আর প্রাণভয়ে উড়ে পালাচ্ছিল একটা সারস।

মেয়েটা তখনও হাসছে। মেয়েটার নাম মেনী, ভাল নাম মেনকা।

—এতে হাসছিল ক্যানে ?

বলে সে খুলে দিয়েছিল নিজের বাজকে। পক্ষিণীর নাম ছিল বাঁটুলী। অর্থাৎ বাঁটুলের নারী নাম।

পাখিটা ঝটকা মেরে আকাশে উড়েছিল এবং তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করেছিল। বাজপাখি শিকারের সময় ডাকে না। সে নিঃশব্দে যায়।

রুক্মিণী আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, মর্—ডাকিস কেন ? খুব তো তাগদের গুমোর দেখি !

মেনী আবার হেসে বলেছিল, ডাকবে নাই ? পরাণ বলে আনচান করছে উয়ার। উটা মরদ লাগছে গ—সর্দার বেটী।

কথাটা মিথ্যা নয়। ওরা তাকিয়ে দেখতে দেখতেই দেখলে, বাঁটুলী আকাশে উঠতেই সেই বাজটা শিকার ছেড়ে বোঁ করে পাক দিয়ে একেবারে নিচের দিকে মুখ করে পাখা গুটিয়ে নিজেকে ছেড়ে দিলে, পড়তে লাগল রাত্রির আকাশ থেকে খসা তারার মতো। তারপর মেলল পাখা। তখন তার থেকে আর মাত্র খানিকটা দূরে বাঁটুলী উড়ছে। বাঁটুলীও বাজপাখী। সেও বাজপাখির বিচিত্র ওড়ার কৌশল দেখিয়ে বাজকে নিচে রেখে উঠল উপরে। বাজও উঠল। বাঁটুলী পাশ কাটাল। বাজও বেঁকল। বাঁটুলী আবার ঘুরল। শূন্যমণ্ডলে সে যেন চোর ধরাধরি খেলা। বাজটাকে বাঁটুলী প্রায় নাজেহাল করে রাগিয়ে দিয়েছে। সে বিপুল বিক্রমে এবার যেন আক্রোশভরে তার দিকে ছুটল। বাঁটুলী কিন্তু আরও চতুরা—সে

এবার সাঁ সাঁ করে আকাশ থেকে নামতে লাগল পাখা গুটিয়ে ছোঁ মারার ভঙ্গিতে। তারপর পাখা মেলে এসে বসল যে ডালটিতে সে বসেছিল সেই ডালে। বসেই দিল আর একটা ডাক। দেখতে দেখতে বাজটা এসে ঝপ করে বসল পাশে। বাজটা বড়। পুরুষ কিনা। পায়ে মলের মতো সোনার গোল মল পরানো।

এবার সব সখীরা মিলে কলরব করে হেসে উঠল। তাই তো, একি! মেনী বলেছিল, মরণ! কাকে নিয়া আলি ল! অ বাঁট্‌লী! রুক্মিণীও হেসেছিল এবার। সে বলেছিল, দে লো, বাঁট্‌লীর বর এসেছে, ওকে খেতে দে।

সাধ হয়েছিল ওকে ধরবে। ভাল জাতের বাজ আর খুব শিক্ষিত বাজ। তাকে খেতে দিয়েছিল দুধের বাটি। সর চিনি। তা ছাড়া মাংসও ছিল। হরিণের মাংস।

শোলাঙ্কী রাজপুত্র শুক্রী হয়েছে, পেশায় যুদ্ধব্যবসায়ী। বহু বাগ্দী পাইকের মালিক। ওরা উপাসনায় কিষণজীর উপাসক হলেও মাংস খায়, হরিণ শিকার করে, বুনো বরা মারে। তবে কিষণজীর ভোগে তা দেয় না।

এখানেও হরিণের মাংস আলাদা রান্না হচ্ছিল, বাগ্দীদের মেয়েরা খাবে। খাবার সময় হতে হতে ছোট ছোট বাচ্চারা আসবে, তারাও খাবে।

মাংস খেতে দিয়ে সে একজন বাগ্দিনীকে পাঠিয়েছিল একটা ভালুকের বাচ্চা-রাখা খুব শক্ত লোহার খাঁচা আছে সেটা আনতে। ঠিক করেছিল খাঁচার ভিতর খাবার দিয়ে আগে ডাকবে বাঁট্‌লীকে। বাঁট্‌লী তার ডাকে ঠিক এসে ঢুকবে খাঁচায়, তখন তার পিছন পিছন বাজটাও ঢুকবে। বন্দী হয়ে যাবে পুরুষ।

কৌতুকে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল তার মন।

সে গান গাইতে লেগেছিল—রে কানাইয়া, আজ সব সখীরা মিলে তোকে ঘিরে বন্দী করব। আঁচলের পাকে পাকে বাঁধব। হাতের বাঁধনে বাঁধব। বাঁধব তোর গলা, বাঁধব তোর দুই হাত, বাঁধব তোর দুই পা। আমার ঠোঁটে রাখব তোর ঠোঁট। দেখি, তুই পালাস কেমন করে।

এরই মধ্যে কখন যে একজন ঘোড়সওয়ার এসে সামনে ঝরনাটা যেখান থেকে ঝরছে সেই উঁচু পাথরের মাথায় দাঁড়িয়েছে তা কেউ

দেখে নি। ঝরনা ঝরার শব্দের মধ্যে ঝরনাটার পিছন দিকে ওঠা ঘোড়ার খুরের শব্দও পায় নি তারা। যখন দেখল তখন তারা অবাক হয়ে গেল।

মাথায় পাগড়ি, পরনে চুস্ত পাজামা, গায়ে লম্বা পাঞ্জাবি চাদরের বেড় দিয়ে বাঁধা। পিঠে তূণ বর্শা। কোমরে তলোয়ার। রেকাবের উপর পায়ের নাগরা জুতো ঝক্‌ঝক্‌ করছে। কোনো সম্ভ্রান্ত লোক এবং হিন্দু। মুসলমান নয়।

রুক্মিণীর দল স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এমন এক অপরিচিতের আবির্ভাবে। আবার খিলখিল করে হেসে উঠেছিল সেই মেনী। স্তব্ধতা ভঙ্গ হয়েছিল।

অপরিচিত বিশিষ্ট জনটি মেনীকে বলেছিলেন, হাসছ কেন?

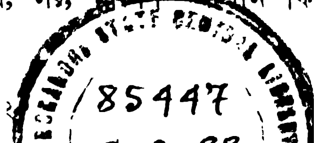
—হাসব নাই! আপনি এলেন—কাঁদতে পারি?

রুক্মিণী এবার সংযত হয়ে এগিয়ে গিয়ে রাজকীয় ঢঙে সেলাম করে বলেছিল, জনাব, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি কোনো মুলুকের মালিক। রইস আদমী। আপনি কে? আমরা এখানে মেয়েরা কিষণজীকে নিয়ে বনভোজনে এসেছি। শুধু মেয়েরা। এখানে আপনি?

তিনি বলেছিলেন, আমার হাউইয়ের সন্ধানে এসেছি। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন বাজটাকে। হেসে বলেছিলেন, একটা সারস দেখে ওকে ছাড়লাম। ও উড়ল। হঠাৎ দেখলাম আর একটা বাজ। ভাবলাম, বাজে বাজে শিকার নিয়ে লড়াই বাধবে। তারপর দেখলাম এই বাজটা ঘুরপাক খেয়ে নেমে পড়ল। আমার হাউইও তার পিছু পিছু ধাওয়া করে নেমে পড়ল এই বড় গাছটার কোলে। গাছটাকে নিশানা করে এখানে এসে দেখছি, তোমরা নাচে গানে এমন মত্ত যে আমার ঘোড়ার খুরের শব্দও কানে গেল না। পরে বুঝলাম, ঝরনার শব্দের জন্য শুনতে পাও নি। কিন্তু খুব আনন্দে মত্ত ছিলে দেবতার সম্মুখে, আমি সাড়া দিই নি। ভালও লাগছিল।

রুক্মিণী বলেছিল, তাহলে মেহেরবাণী করে আসুন, নেমে আসুন। নিয়ে যান আপনার বাজ।

নেমে এসেছিলেন তিনি। রুক্মিণী তাকে বসিয়ে বলেছিল, আপনার বাজকে আমরা খাইয়েছি দুধ, সর, মাখন; আপনি কিছু খান দেবতার প্রসাদ।



তিনি বলেছিলেন, কি জাত ? এদের তো দেখে মনে হয় বাগ্দী। তুমি ? তুমি তো তা নও ! চেহারাতেও পৃথক, তা ছাড়া এমন সহবতের কথা তো বাগ্দী মেয়ের নয়।

রুক্মিণী বলেছিল, আমি শুক্লী রাজপুতের মেয়ে। এরা বাগ্দীর মেয়েই বটে। সহবতের কথা ? আমার বাবা এক বাঈকে এনে রেখেছিলেন, তার কাছে শিখেছি। বিষ্ণুপুরের সুরতিয়াবাঈ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি বটে। সুরতিয়াবাঈ পাকা চুল ভাঙা গলা নিয়ে জগন্নাথ গিয়েছিল। বিষ্ণুপুর থেকে পুরী পৌঁছতে তার তিন বছর লেগেছিল। লোকে বলে, বনের ভিতর কোথায় সে তপস্যা করছিল। পুরীতে যখন গান গাইত তখন তার তুই চোখে ধারা বইত !

—দু বছর সাত মাস তিনি আমাদের এখানে ছিলেন, আমাকেই শেখাতেন নাচ গান সহবত।

—তোমার নাম কি ?

রুক্মিণী কুর্নিশ করে বলেছিল, জনাব আলি, আপনি রইস আদমী ; তরিবং সহবতের রাজা। আপনিই ফরমাশ করুন, আমি কুমারী মেয়ে, আপনার নাম আপনার পরিচয় না পেলে কি করে আমার নাম বলব ?

—চন্দনগড়ের নাম তো জান ?

সঙ্গে সঙ্গে নত হয়ে প্রণাম করেছিল রুক্মিণী। তারপর সখীদের বলেছিল, প্রণাম কর, প্রণাম কর।

তারা সার বেঁধে নত হয়ে প্রণাম করেছিল।

তিনি হেসে হাত তুলে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, আমার নাম মাধব সিং।

—আমি জানি জনাব আলি, মালিক বাহাত্বর ! আমি বোকা, হাজার হলেও বুনো মেয়ে। দেখেই আমার অনুমান করা উচিত ছিল, অন্তত কপালের ঐ দাগটা দেখে বোঝা উচিত ছিল। ষোলো বছর বয়সে শুধু তলোয়ার নিয়ে একটা শেরকে মেরেছিলেন। তখন শেরের নখ বসেছিল আপনার কপালে। এটা মুলুকের সবাই জানে।

—হ্যাঁ, দাগটা আমার চিহ্ন বটে।

রুক্মিণী বলেছিল, আমার নাম এবার বলি—

বাধা দিয়ে মাধব সিং বলেছিলেন—বলতে হবে না। আমি বোকা নই ! তোমার নাম রাধা। অন্তত এই নামটা আমি দিলাম।

সেলাম করে রুক্মিণী বলেছিল, না মালিক, আমার নাম রুক্মিণী।

—ওই হ'ল। দুয়ে তফাত কি?

—আমার গোস্তাকী মাফ হয় মালিক; দুইই কিষণজীর প্রিয়তমা হলেও রাধাকে তিনি ছেড়ে পালিয়েছিলেন, দুখ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া রাধার অনেক কলঙ্ক। আমি দুখও চাই না, কলঙ্কও আমার সইবে না। রাধা গোয়ালিন, আমি রাজপুতিন।

—সাবাস, সাবাস, সাবাস রুক্মিণী। আমি বোকাই বটে।

সখীরা অবাক হয়ে রুক্মিণীর এই বাক্‌চাতুরি শুনেছিল। তাদের সঙ্গে যে রুক্মিণী হাসে খেলে নাচে গায় এ তো সে নয়!

রুক্মিণী বার বার অভিবাদন করেছিল।

এই সময়ে এসেছিল খাঁচাটা। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ওটা কি হবে?

এবার চন্দনগড়ের রাজা—লড়াইয়ে যাকে লোকে বলে রুস্তম, সেই রুস্তম মাধব সিং সম্মুখে জেনেও মেনী আবার হাসতে শুরু করেছিল। রাজা বলেছিলেন, তুমি বড় হাস। হাসছ কেন?

মেনী ভয় পেয়ে বলেছিল, আপনি রাজা সাহেব, আমি ছোট বান্দীর বেটী, হাসি আমার রোগ বটে। দাঁতগুলান দুশমনের হাড়ে বিধাতা গড়ে বসায়ে দিয়েছে, ঠাঁই বাছে না, মানুষ বাছে না, বেরায়ে পড়ে।

—না না, তুমি হাস। ভাল লাগছে তোমার হাসি। কিন্তু হাসছ কেন?

—হুজুর, আপনি নিজে বললেন, আপনি বোকা। তা খানিক বটেন। খাঁচা আপনার হইটাকে বন্দী করবার তরে—

হেসে রাজা বললেন, ওকে বন্দী করবে কে? ধরে পুরবে কে?

—আমাদের বাঁটুলী। সে দেখিয়ে দিয়েছিল রুক্মিণীর বাজকে।

—আচ্ছা!

—ওটা মেয়ে বটে হুজুর!

—ও! তা আর তো হবে না। আচ্ছা, একটা বাজ আমি তোমাদের দেব।

—উটাই লিব। দেখেন। লেন, আপুনি ডেকে লেন আপনার হইকে। বলেই বলেছিল, দাঁড়ান। তারপর খাঁচার দোর তুলে রুক্মিণীকে বলেছিল, লাও গো সর্দার বেটী, লাও, ভর তোমার বাঁটুলীকে খাঁচাতে, ডাক তুড়ি দিয়া। রাজা হুজুরকে ভেল্কিটা দেখায়ে দাও।

রুক্মিণীরও কৌতুকের সীমা ছিল না। সে বলেছিল, আপনি হুকুম দিলেন তো ?

রাজাও কৌতুকভরে বলেছিলেন, দিলাম।

খাঁচার ভিতর বাঁট্‌লীর প্রিয় খাদ্য সব গুড় আর মাংস দিয়ে রুক্মিণী তুড়ি দিয়ে ডেকেছিল, বাঁট্‌লী, আয় আয়—বাঁট্‌লী—

বাঁট্‌লী একবার অপাঙ্গে হাউইয়ের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় তাকে ইঙ্গিত করেই মাটিতে নেমে পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে খাঁচার দরজার মুখে মুখ পুরেছিল। ওদিকে হাউই চঞ্চল হয়েছে। রাজা তাকে ডাকলেন, হাউই, হাউই, এই, আয় আয়। কিন্তু হাউই তাঁর কথা শুনল না, সেও পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে বড় খাঁচাটার মধ্যে বাঁট্‌লীকে অনুসরণ করে ঢুকে বসল।

সব মেয়েরা এবার খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

রাজা সেদিন সারাদিন থাকলেন। গান শুনলেন। নাচ দেখলেন। রুক্মিণীর সঙ্গে আলাপ করলেন। প্রসাদও খেলেন।

যাবার সময় রুক্মিণী খাঁচাটা তাঁর হাতে দিয়ে বললে, মালিক বাহাদুর, আপনি রাজা, আমি গরীব শুক্লীর মেয়ে, এককালে আমরাও ছিলাম শোলাঙ্কী রাজপুত। আজ আপদ্ধর্মে শুধু শুক্লী। বনে বাস করি। আমরা বনেই স্বাধীন হয়ে আছি। পৈতে নেই। আপনি তবু আমার ঠাকুরের প্রসাদ খেলেন, এ খাঁচা আপনাকে আমার নজরানা। বাঁট্‌লীকে সুদ্ধ নিয়ে যান।

রাজা বলেছিলেন, ও নজরানায় তো মন ভরল না আমার।

—আর কি আছে আমার মালিক ?

রাজা বলেছিলেন, ওই যে কিষণজী, তুমি তাঁর সেবিকা। আমি তাঁর সেবক। আমার নামও মাধব সিং। রুক্মিণী, যদি তোমাকে আমি তোমার বাঁট্‌লীর সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই ?

চুপ করে ছিল রুক্মিণী। সে ভাবছিল। সেকালে রাজাদের উপপত্নী রাখার কথা সে জানে। সমাজে দেশে সেটা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু সেটা আভিজাত্যের লক্ষণ। কিন্তু সে বারোভাটিয়া শুক্লী সর্দারের মেয়ে—ছেলেবয়স থেকে এ সময় পর্যন্ত কিষণজীকে ভজনা করে এবং ওই সুরতিয়াবাঈয়ের কাছ থেকে রাজপুতানার গল্প শুনে এমনই একটি মন পেয়েছে, ভাবনা পেয়েছে, যাতে সে উপপত্নী হতে ঘৃণা বোধ করে।

—কি ভাবছ রুক্মিণী ?

সে হাত জোড় করে বলেছিল, রাজা সাহেব, রুক্মিণী মাধবের গুণ শুনেই অনেক আগে থেকে মুগ্ধ। তবে সে তাকে কামনা করতে সাহস করে নি। মাধব যখন তাকে কামনা করছেন তখন তার থেকে বড ভাগ্য আর কি হতে পারে?
রাজা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রুক্মিণী হাত সরিয়ে নিয়ে বলেছিল, তবু একটা কথা সে বলবে। উত্তর শুনবে।
—বল।
—রুক্মিণীর মাধবের কাছে মিনতি তাঁর চরণের দাসী যে হবে সে রুক্মিণী নাম নিয়েই হবে তো?
রাজা তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। উত্তর দিতে পারেন নি।
রুক্মিণীই বলেছিল, সত্যভামা জাম্ববতী ষোলোশো মহিষী মাধবের ছিল। রুক্মিণীর তাতে তো বলবার কিছু নেই। কিন্তু সে তো নাম পাল্টাতে পারবে না হুজুর। রাধা ভাগ্য আমি চাই না রাজাবাহাদুর। তার থেকে আমি মীরাবাঈয়ের পথ ধরব।
রাজা তাকে বলেছিলেন, তুমি রুক্মিণী হয়েই যাবে রুক্মিণী।

রাজা মাধব সিং শুধু রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বীর, বড় শিকারী, দুর্দান্ত সাহসী। আর একটা কথা চলিত হয়েছিল যেটা লোকের মুখে মুখে চলে। সেটা হল—মরদ কি বাত হাতীকা দাঁত। মর্দানী মাধব সিংকা—বাত দেতা তো জান দেতা। বাত কি খিলাপ কভি নেহি হোতা।
তিনি বিয়ে করেই নিয়ে গিয়েছিলেন রুক্মিণীকে। বাধা পড়েছিল অনেক। কিন্তু সে বাধা তিনি মানেন নি। মুর্শিদাবাদে তখন নবাব সুজাউদ্দিনের আমল। সুজাউদ্দিন যখন উড়িষ্যা থেকে মুর্শিদাবাদে বসতে চলেছিলেন তখন মাধব সিং তাঁকে নজরানা পেশকষ পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু নিজে যান নি। তার কারণ তিনি বলেছিলেন, ছেলের সম্পত্তি যে কেড়ে নেয় সে বাদশাহী সনদে নবাব হয়েছে বলে নজরানা পাঠাচ্ছি, কিন্তু সেলাম দিতে যাব কেন? এমনই চরিত্রের লোক। সুতরাং যে কথা তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন রুক্মিণীকে, তা তিনি রেখেছিলেন।
রাজার আরও তিন বিয়ে ছিল। তিনটিই ছত্রি রাজার কন্যা। এ ছাড়াও উপপত্নী ছিল। উপপত্নীতে রানীদের আপত্তি ছিল না।

কিন্তু এই পৈতে ছাড়া শোলাঙ্কী রাজপুত শুক্রী সর্দারের মেয়েকে বিবাহে তাদের প্রচণ্ড আপত্তি হয়েছিল। ছত্রি মনসবদার ব্রাহ্মণ দেওয়ান এবং অন্যান্য ছত্রিদেরও আপত্তি ছিল প্রবল। শেষ পর্যন্ত নতুন শুক্রী রানীর জন্য আলাদা মহলের ব্যবস্থা করিয়ে তবে তারা সম্মতি দিয়েছিল। রাজা জেদ ছাড়েন নি। জেদ বজায় থেকেছিল কিন্তু বিয়েতে ছত্রি এবং ব্রাহ্মণেরা এসেই চলে গিয়েছিল সামান্য ফলমূল মিষ্টান্ন খেয়ে। বিয়ে হয়েছিল চন্দনগড়ে। দলু সর্দার কন্যা নিয়ে গিয়েছিল। তার ভাইরা যায় নি, ছেলে পাঠিয়েছিল। কিন্তু বাহাত্তর-ঘরিরা গিয়েছিল, দশাদ্বীরাও গিয়েছিল। আর গিয়েছিল বাগদী পাইকরা।

বিয়ে হয়ে গেল। রাজা ভেবেছিলেন লড়াইয়ে তিনি জিতলেন। কিন্তু বিয়ের পর দেখলেন, না, তিনি জেতেন নি, লড়াই লেগে রয়েছে এবং প্রথম দফায় তিনি জিতেছেন একথা সত্য হলেও দ্বিতীয় দফার জন্য প্রতিপক্ষরা দস্তুরমত লড়াই সাজিয়ে রেখেছে। রাজা দেখলেন—আলাদা-মহলে বাস করার জন্য রুক্মিণী রানীর মর্যাদা পাচ্ছে না।

মাধব সিং জেদী, দুর্দান্ত জেদী। কিন্তু তার থেকেও সমবেত জেদ আরও কঠিন, আরও শক্তিশালী।

গৃহদেবতা রাধামাধবের পুরোহিত বললে, পর্বেপার্বণে রানীদের কাজ আগের রানীরা করবেন। নতুন রানীকে করতে দেব না—এ হতে পারে না।

অন্য রানীরা, দেওয়ান এবং ছত্রিরা তাতে সায় দিলে। এদের মূল শক্তি মমসবদার সুচেত সিং—বড় রানীর সহোদর।

রাজা কি করতেন তা বলা যায় না, কিন্তু রুক্মিণী এর সমাধান করলে। বললে, তুমি আমার কিষণজীকে এনে দাও, আমার এখানে তাঁকে স্থাপন কর। তাঁকে পূজো করলেই তোমার বংশের ঠাকুরকে পূজো করা হবে। আর এ সমস্যার সমাধানও তিনি করে দেবেন। রাজা খুশী হলেন। তাই হোক। খবর পাঠিয়ে তিনি শ্বশুর দলু সর্দারকে আনিয়ে বললেন সমস্ত। তারপর বললেন, সর্দার, রুক্মিণীকে রক্ষা করতে একলা আমি। আমার ভয় হচ্ছে এরা কোনদিন—

হেসে বললেন, নিজের জন্যে ভাবি নে কোনদিন। কিন্তু রুক্মিণী? রুক্মিণী বলেছিল, তার জন্যে তুমি ভেবো না রাজা। দ্বারকার কিষণজী দেহত্যাগের আগেই রুক্মিণী বৈকুণ্ঠে চলে গিয়েছিলেন।

দলু বলেছিল, তুমি রাজা, তবু আমার জামাই। আমাদের বহু পুরুষ আগে হারানো সম্মান তুমি দিলে রুক্মিণীকে বিয়ে করে। যদি কিছু বাসের জায়গা আমাদের দাও তবে আমি আমার পৈতৃক পঁচিশ ঘর পাইক এখন চল্লিশ ঘর হয়েছে, তাতে মরদ পাইক এখন দুশোর উপর—তাদের নিয়ে এখানে আমি চলে আসি, বাস করি। কাজ করি। দুশো পাইকের জান থাকতে তোমাদের কেউ ছুঁতে পারবে না।

মাধব সিং সানন্দে মত দিয়ে বলেছিলেন, তুমি শ্বশুর, তোমার সঙ্গে বাপ-বেটার সম্পর্ক হয়েছে। তোমাকে আমার প্রণাম। যাও, নিয়ে এস পাইকদের যত জলদি হয়।

ওদের কিস্তির উত্তরে মাধব সিং ঘোড়া তুলে কিস্তিটাই শুধু ঢাকলেন না, তাঁর ফিলের মুখে উঁট-কিস্তি পড়ে গেল। মাসখানেকের মধ্যে চন্দনগড়ের পাশটায় যে জঙ্গলটা ছিল সেই জঙ্গল কেটে বসে গেল নতুন পাইকরা। চন্দনগড়ের শক্তিবৃদ্ধি হ'ল। চল্লিশ ঘর নয়, এল ষাট ঘর। বাহাত্তর-ঘরিদের তাঁবে থেকে বিশ ঘর পাইক দলু সর্দারের দলভুক্ত হয়ে ষাট ঘরের তিনশো জোয়ান এসে নিজেরাই নিজেদের ঘরদোর সব গড়ে নিলে।

তারপর হঠাৎ একদিন বিপদ বাধল আবার। ঠিক এক বছর পর মারাত্মক কিস্তি পড়ল। কটকের শাসনকর্তা সুজাউদ্দিনের জামাই রুস্তম জং-এর দরবার থেকে পত্র এল। মীর হবিব রুস্তম জং-এর দেওয়ান। সুজাউদ্দিনের ছেলে তকী খাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে নবাবের জামাই রুস্তম জং উড়িষ্যার নায়েব নাজিম হয়েছে, মীর হবিব তাঁর দেওয়ান। তিনি লিখেছেন পত্র : "সুবা বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সুবাদার মতোমন উল্‌মুল্ক সুজাউদ্দিন আসদ জং বাহাদুরের প্রতিনিধি উড়িষ্যার নায়েব নাজিম মহামান্য আমীর উল্‌মুল্ক মুরশিদকুলী রুস্তম জং বাহাদুরের আদেশক্রমে এই হুকুম-নামা চন্দনগড়ের রাজাবাহাদুর শ্রীযুক্ত মাধব সিং সাহেবের উপর জারি হইতেছে। নায়েব নাজিম বাহাদুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে ইহা অকাট্য সাচ্চা খবর বলিয়া ধরা পড়িয়াছে যে, আট-নয় বৎসর পূর্বে এক শুক্লী সর্দার—দলপৎ শুক্লী বিষ্ণুপুর রাজ-দরবারের আশ্রিত এক সুরতিয়াবাঈকে ভুলাইয়া অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। এই শয়তান সর্দার অতি ব্যভিচারী এবং ডাকাতিই তার একমাত্র পেশা। এই সুরতিয়াবাঈ প্রথম জীবনে হিন্দু থাকিলেও বাঈ হইয়া সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সুরতিয়াবাঈকে যখন

দলপৎ অপহরণ করে তখন তাহার সঙ্গে তাহার এক পালিতা বা আপন কন্যা ছিল। সেও পবিত্র ইসলামের আশ্রিতা মুসলমানী সুরতিয়ার কন্যা, সেও মুসলমানী। সেই কন্যা সুরতিয়ার মৃত্যুর পর হইতে দলপতের কাছে ছিল। সে তাহাকে কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এবং রাজা মাধব সিং সমস্ত জানিয়া বা না জানিয়া তাহাকে আপনার উপপত্নী করিয়া রাখিয়াছে। ইহার তুল্য ইসলামের অপমান কি হইতে পারে? সুতরাং নায়েব নাজিম বিচারক-শ্রেষ্ঠ রুস্তম জং-এর হুকুম, অবিলম্বে ওই কন্যাসহ রাজা মাধব সিং উড়িষ্যায় আসিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবেন। অথবা ওই কন্যাকে উপযুক্ত মর্যাদার সহিত নাজিমের মহলে পাঠাইয়া দিবেন। অন্যথায় উড়িষ্যার নবাবী ফৌজ চন্দনগড় ভূমিসাৎ করিয়া ইসলামের অপমানের শোধ লইবে।"

রাজা মাধব সিং জ্বলে উঠেছিলেন। তবুও নিজের মর্যাদা, এবং রাজ্যের বিপদের দিকে লক্ষ্য রেখে পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলে দেন নি। উত্তরে নিজে হাতে পত্র লিখে দিয়েছিলেন। সংক্ষিপ্ত পত্র: "যাহার তরবারির শক্তি আছে, সঙ্গে বহু অনুচর আছে, তিনি খেয়ালমতো আলোর রঙকে কালো বলিলে কোনো দুর্বল মানুষ কোনো প্রমাণ দিয়া প্রমাণ করিতে পারে না যে, আলো কালো নয়, আলো সাদা। যে অভিযোগ করা হইয়াছে—তাহা কোনো শয়তান আমার এবং আমার বিবাহিতা পত্নীর অনিষ্ট কামনায় নায়েব নাজিমের দরবারে হাজির করিয়াছে। বিনা প্রমাণ প্রয়োগে বিচার করিতে পারেন একমাত্র ঈশ্বর, খোদাতায়লা! নায়েব নাজিম সূক্ষ্ম বিচারক ন্যায়বান হইলেও তিনি ঈশ্বর নহেন। সুতরাং প্রমাণ প্রয়োগ গ্রহণ করার পূর্বে কোনো আদেশদান হইতে পারে না। এই কন্যার নাম রুক্মিণী, সে দলপৎ শুক্লীর কন্যা, সুরতিয়াবাঈ পুরী যাত্রার পথে দলপৎ রায়ের গ্রামে দুই বৎসর সাত মাস থাকিয়া তাহাকে নৃত্যগীত শিখাইয়াছিলেন। সুরতিয়াবাঈও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। পুরী মন্দিরে তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। আমাকে যে কোনো অজুহাতে ধ্বংস করা উদ্দেশ্য হইলে স্বতন্ত্র কথা। অন্যথায় নবাব ইহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া আশা করি।"

অন্দর মহল থেকে রাজসভার রানী ও সরকারী কর্মচারীরা এ উত্তর শুনে বেঁকে দাঁড়িয়ে বলেছিল, একি কথা! নবাব দরবার থেকে যে অভিযোগ এসেছে সে মিথ্যা হবে কি করে।

সাধারণ প্রজারা নবাবী ফৌজ রাজ্য আক্রমণ করতে পারে জেনে ভীত হয়েছিল।

রাজা মাধব সিং রুক্মিণীকে কাছে ডেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, কোনো ভয় নেই।

দলু সর্দারের দল অহরহ প্রস্তুত হয়ে থাকতে শুরু করেছিল। মেয়েরা তাদের পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে রেখেছিল, পুরুষেরা লড়াই শুরু করলে তারা বনে ঢুকে বসবে। দলু সিং সর্দারের বাগ্দী নায়কেরা আরও পাইক সংগ্রহ করে এনেছিল। সবসুদ্ধ মিলে তারা তখন পাঁচশো। তারা দুর্দান্ত, তারা মরিয়া। তাদের কাছে রাজ্যের ছত্রি এবং চুয়াড় সৈন্য হীনবল হয়ে পড়েছে। তারাও সংখ্যায় শ পাঁচেক। রাজা, দলু এবং রুক্মিণী সকলেই বুঝতে পেরেছে—এ সবই বড় রানী এবং তার ভাই সুচেত সিং-এর ষড়যন্ত্র। রানী দু'হাতে টাকা ছড়াচ্ছেন গোপনে।

রাজা মাধব একটা অন্যায় করেছিলেন। রুক্মিণীকেই তিনি সব করে তুলেছিলেন তাঁর জীবনে। অন্য রানীদের মহলে যেতেন না। ঠাকুর-বাড়িতে গিয়ে বাইরে থেকে প্রণাম করে চলে আসতেন। নিমন্ত্রণ কাউকে করতেন না, কারুর বাড়িতে নিমন্ত্রণে যেতেনও না।

তিনি দলুকে মধ্যে মধ্যে ডেকে পরামর্শও করতেন যে একদিন রুক্মিণীকে এবং সর্দার আর পাইকদের নিয়ে চন্দনগড় ছেড়েই চলে যাবেন দুর্গম অরণ্যের মধ্যে। সেখানে নতুন করে গড়ে তুলবেন নতুন রাজ্য। কিন্তু রুক্মিণী প্রায় আসন্নপ্রসবা। একমাস দেড়মাসের মধ্যেই তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা। প্রতীক্ষা করছিলেন সেই সন্তানপ্রসবের।

রুক্মিণী কখনও কখনও ছুরি নিয়ে খেলা করত। রাজা মাধব সিং হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিতেন। অবশেষে তাকে একদিন কিষণজীর সামনে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, সামনে কিষণজী, একটা সত্য কথা বলবে রুক্মিণী?

—কি?

—ছুরি নিয়ে যখন খেলা কর তখন কি ভাবো?

রুক্মিণী চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কথা বলে নি।

—রুক্মিণী!

এবার রুক্মিণী কেঁদেছিল। রাজা তাকে বুঝে নিয়ে বলেছিলেন, একটা শপথ করতে হবে তোমাকে।

—বল।

—যতদিন তোমার গর্ভে আমার বংশধর রয়েছে ততদিন এসব ভাববে না।

সে বলেছিল, ভাবব না।

ঠিক তার পরদিনই সংবাদ এসেছিল মীর হবিব আসছেন। সরজমিন তদন্ত করবেন। রাজা শঙ্কিত হয়ে দলুকে বলেছিলেন, কোন পথে কোন দিকে চন্দনগড় ছেড়ে যাবে শ্বশুর ঠিক করে রাখ। ডুলি ঘোড়া এসব যেন অষ্টপ্রহর তৈরি থাকে। মীর হবিব বাঘ নয়, সে সাপ।

তবে নবাবী চিঠির সুর এবার ভাল। পত্রে আছে: "নায়েব নাজিম সহিষ্ণু এবং সূক্ষ্ম বিচারক। তিনি রাজা সাহেবের নির্ভীক পত্রে অসন্তুষ্ট হন নাই, তুষ্টই হইয়াছেন। একটা সংবাদ ইতিমধ্যেই পাইয়াছি। সুরতিয়াবাঈ সত্যই শেষ জীবন পুরীতে অতিবাহিত করিয়াছে। এবং সে বলিত তাহার কেহ নাই। রাজা সাহেবের অন্য কথাগুলিও বিশ্বাসযোগ্য। তবুও তদন্ত না করিলে সূক্ষ্ম বিচার করা যায় না। সেহেতু নায়েব মীর হবিব আমীর সাহেব যাইতেছেন। সঙ্গে তাঁহার এক শতের বেশী সিপাহী থাকিতেছে না। সুতরাং কোনো আশঙ্কা করিবেন না। জানি, রাজা সাহেব সাহসী এবং বীর ব্যক্তি। রুস্তম বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।"

তবু রাজার সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু কিছু করার তো উপায় ছিল না। রাজ্যে কিন্তু অসন্তোষকে তখন প্রবল করে তুলেছে মাধব সিং-এর মনসবদার বড় রানীর ভাই সুচেত সিং। দিন দিন নানা গুজব রটছে। 'একশো সিপাহী নিয়ে আসছে মীর হবিব কিন্তু তার পিছনে আসছে পাঁচ হাজার পল্টন আর তোপখানা। রাজা মুসলমানী বাঈয়ের মেয়েকে না দিলে একেবারে সব ভূমিসাৎ করে দিয়ে যাবে। ও মেয়ে মুসলমানী।'

'রাজার পুরুত রাধামাধবের পূজারী বলছে, দেবতা বিমুখ হয়েছে। পূজোর ফুল পায়ে থাকে না, পড়ে যায় মাটিতে। ভোগও নাকি হয় না। ভোগের উপর তুলসীপাতা দিতে গেলে হাত থেকে খসে মাটিতে পড়ে যায়।' তবু মাধব সিং অটল রইলেন। দাঁড়িয়ে থেকে একদিন পূজো দেওয়ালেন, পূজো করালেন। ভোগ দেওয়ালেন। সেদিন কিছু হ'ল না, ফুলও পায়ে থাকল, তুলসীপাতাও ভোগের মাথায় থাকল। তবু গুজব ফিরতে লাগল। দলপৎ সিং-এর পাইকরাও অহরহ তৈরি হয়ে হয়ে ঘুরতে লাগল। রাজা অন্য সিপাহীদের টাকা

দিলেন একটা উপলক্ষ করে। সুচেত সিংরা চুপ হয়ে গেল। রাজা বললেন, দেখ, আসুক মীর হবিব। হোক তদন্ত।

মীর হবিব এলেন। তাঁর তাঁবু পড়ল গ্রামের বাইরে। সিপাহী একশোর বেশি নয়। তোপ নেই। হবিবকে অভ্যর্থনা করলেন রাজা। হবিব খুব কেতাদুরস্ত আমীর। কথাবার্তায় ভারী পারঙ্গম। দলু সর্দার সঙ্গে যায় নি। মাধব সিং তাকে রুক্মিণীর ভার দিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। রাজার বুদ্ধি ছিল খুব তীক্ষ্ণ। অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেতেন, এ-কথা দলু জানত। তবে দলু বার বার বলেছিল, তুমি বল রাজা সাহেব, একদিন রাতে সুচেত সিংকে কেউ শেষ করে দিক। কিন্তু রাজা তা দেন নি। বলেছিলেন, কত জনকে খুন করবে শ্বশুর? বড়রানী? সে যে বুকে বিঁধে আছে। আর তুই রানী? তারা? স্ত্রী হত্যা কি করে করব? করতাম ব্যভিচারিণী হলে, কিন্তু সে অপরাধ তো তারা করে নি।

চুপ করেছিল দলু। হ্যাঁ, ঠিক বলেছে জামাই। রাজবিচার! রাজবুদ্ধি!

সেদিন রাজার সঙ্গে ছিল গণেশ পাইক আর ভীম পাইক ডাইনে বাঁয়ে। পিছনে ছিল বিশজন পাইক একটু দূরে।

হবিব আমীর রাজাকে বসিয়ে হেসে বলেছিল ফার্সী বয়েৎ। তারপর বলেছিল, এ হ'ল দেওয়ানা কবি হাফিজের বয়েৎ রাজা সাহেব। অর্থ হ'ল—হাফিজ বলেছিল তাঁর যে প্রিয়া তার গালে একটি তিলের জন্য তিনি বোখারা সমরখন্দ দিয়ে দিতে পারেন। তুমি রাজা সাহেব তেমনি দেওয়ানা, মোহব্বতিতে দেওয়ানা আদমী। রাজা বলেছিলেন, আমীর সাহেব, আপনি পারসীতে পণ্ডিত, রসিক লোক। কিন্তু রুক্মিণী আমার বিবাহ করা ধর্মপত্নী।

—সগাই?

—না, শাদী।

—আচ্ছা! তা হলে তোমার মুল্লুক জুড়ে এমন চেল্লায় কেন?

—কেউ চেঁচায় না! সুচেত সিং আর তার বোন চেঁচায়। তার বোন, আমার প্রথম স্ত্রী।

হা-হা করে হেসে হবিব বলেছিলেন, সতীনের কাণ্ড! ঔরতি গোস্‌সা! তা হতে পারে। তবে মীর হবিবের পরখ একটি। এক পরখেই সে ঠিক ধরে নেবে—সত্যিটা কি। এক পরখ!

রাজা বলেছিলেন, বেশ, পরখ করুন।
একটু চুপ করে থেকে হবিব বলেছিলেন, জানেন রাজা, গুলাব তামাম মুল্লুকেই এখন ফোটে। কিন্তু বসরাই গুলাবের কাছে কেউ না। সে ধরবার ক্ষমতা ক'জনের? সবাই দেখে এক গুলাব। কিন্তু যার বাড়ি বস্‌রা সে ঠিক ধরে দেবে—এ গুলাব বস্‌রাই কি বস্‌রাই নয়।
রাজা সাহেব চমকে উঠে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।
হবিব বলেই চলেছিলেন, দেখিয়ে রাজা সাহাব—এ তো আপনি মানবেন যে এতকাল আপনারা রাজপুতানার রাজপুত শের এই বাঙ্গালে ভাত মুড়ি আর মচ্ছির মুল্লুকে বাস করছেন! তবু আপনাদের রাজপুত ঔরতদের একটা আলাদা জলুস আছে, একটা ছাঁচ আছে। তরিবতে সহবতে চোখের চাউনিতে বাংলার কালী লেড়কীর সঙ্গে ফারাক অনেক। তেমনি, ঠিক মুসলমান যারা ইসলামী একটা ছাঁচ একটা গড়ন একটা তরিবৎ থাকবেই। যতই হিন্দুয়ানীর রঙ দিয়ে ঢাকুক, সে ঢাকা যায় না। মুসলমানী বেটী আমি এক নজরে ধরতে পারি।
রাজা উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠেছিলেন, হবিব সায়েব! অর্থাৎ রাজা বুঝেছিলেন হবিব সায়েব এর পর বলবে রুক্মিণীকে এর পর হাজির করা হোক। উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।
হবিব চিৎকার করে উঠেছিল, এও বেওকুফ্, বে-তরিবৎ জংলী রাজপুত, বৈঠ যাও।
রাজা ডেকেছিলেন, ভৈরব! ভীম! গণেশ! চলো।
হবিব সাহেব চিৎকার করেছিলেন, সি-পা-হী লোক! ম-ন-স-ব-দা-র! সব তৈরিই ছিল। কিন্তু বোধ হয় কিছু আগে ঘটে গিয়েছিল। কিছু পরে হবার কথা ছিল। হবিবের সিপাহীরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাজা এবং ভীম ভৈরবদের উপর। রাজা লড়াই করতে করতে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, একজন যাও, খবর দাও দলুকে, রুক্মিণীকে!
বলতে বলতে তিনি লড়েছিলেন।
ভীম আর গণেশ ফেরে নি। ভৈরব ফিরেছিল,—সর্দার, সর্বনাশ, সব শেষ!
এরপর কি করতে হবে রাজা তা আগেই বলে রেখেছিলেন দলপংকে। রুক্মিণীকে তিনি বাঁচাতে বলেছিলেন। তিন রানীর মধ্যে কারুর পুত্র-সন্তান নেই। সব কন্যা। রাজা বলেছিলেন রুক্মিণীর গর্ভে যদি

বংশধর থাকে? ওকে বাঁচিয়ো শ্বশুর। তোমার আমার দু'জনের জলপিণ্ড। এখানে সুচেত সব বিষিয়ে দিয়েছে। ওরা তোমাদের মারবার চেষ্টা করবে। পালিয়ো—যে কোনো উপায়ে পালিয়ো। দুর্গম বনে। গভীর বনে। যে ভাবে তোমার দাদো পালিয়েছিল। তাদের সঙ্গে তুমি বেঁচো। নইলে রুক্মিণীর পালানোর মানে হয় না। নিজেদের পুরনো বনে ফিরে যেয়ো না, সেখানে ওরা তোমাদের পাত্তা করবে। নতুন দুর্গম বনে চলে যেয়ো।

দলপতের হুকুমে পাঁচশো জোয়ানের চারশো দিয়েছিল লড়াই। আর দলপৎ নিজে মেয়েছেলে, গরু, ঘোড়ার পিঠে নিতান্ত দরকারী জিনিস এবং ডুলিতে রুক্মিণীকে চাপিয়ে ঢুকে পড়েছিল বনে। সঙ্গে একশো জোয়ান, বাদবাকি মেয়ে বুড়ো আর বাচ্চা! সেই আসছিল তারা। বন থেকে বনে, গভীর বনে বনে, নালা টিবি পার হয়ে চলে আসছিল। সেদিন দুদিন পুরো হয়ে তিনদিনে পড়েছিল। তিন থাকি হয়ে চলেছে তারা। সামনে বিশ জোয়ান আর সে। তাদের সঙ্গে ডুলি আর ঘোড়ার পিঠে গরুর পিঠে জিনিসপত্র, তার সঙ্গে বাচ্চা বুড়ো আর রোগা লোক। তার কিছু পিছনে শক্তসমর্থ মেয়েরা। তাদের পিঠে জিনিস, কারুর পিঠে কচি বাচ্চা। তাদের সঙ্গে পঁচিশ জোয়ান। একেবারে পিছনে পঞ্চাশ জোয়ান। যারা পিছু নেবে—তাদের সঙ্গে প্রথম লড়াই তারা দেবে। ঠেকাবে। মাঝের জোয়ানেরা ঘাঁটি গাড়বে। তাদের সঙ্গে শক্ত মেয়েরা। তাঁরাও বাঁটুল ছুঁড়তে জানে, তীর ছুঁড়তে জানে।

এদিকে সামনের দল ডুলি আর মেয়েদের পিছনে রেখে আর একটা ঘাঁটি পাতবে, নইলে চেষ্টা করবে আরও গভীর বনে ঢুকবার। পঞ্চাশ জোয়ান যারা সবার পিছনে আসছিল—প্রথম লড়াই দেবার জন্যে তারা কেউ ফেরে নি। লড়াই দিয়ে তারা মরেছিল। বাকিরা ঢুকেছিল গভীর বনে।

দুই

বিশ বছর আগেকার কথা। তিন দিনের শুরুতে আবার এল বাধা, বিকেলবেলা প্রসববেদনা উঠল রুক্মিণীর। খুব জোর কদমে

হেঁটে সামনে পাহাড় দেখে থামতে হ'ল। একজন লোকও ফিরে এল। একটা জোড় অর্থাৎ ছোট নদী পাওয়া গেছে। আস্তানা পড়ল। কাপড় ঘিরে ঘেরা দিয়ে রুক্মিণীকে নিয়ে অম্বিকে বাগ্দিনী আর দলপতের বিধবা বোন অহল্যা ঢুকে বসল। লোকেরা চিঁড়ে ভিজিয়ে খেলে। আটটা গরুর পিঠে শুধু চিঁড়ে বোঝাই ছালা নিয়েছিল দলপৎ। দুটো ছালায় ভেলি গুড়। লোকজনেরা খেয়েদেয়ে শুল। মদ নেই। মদের জন্য প্রাণ হাঁইফাঁই করছে। পথে কিছু শিকার হয়েছে—দুটো বড় সম্বর হরিণ। তার চামড়া ছাড়িয়ে দুপুরে আগুন করে পুড়িয়ে নিয়ে খেয়েছে। নুন নেই। নুনের টিন ফেলে এসেছে। পাঁচ-সাতটা গাইয়ের দুধ আছে। ছেলে আর রোগারা খেয়েছে। রুক্মিণী খেয়েছে। আর পথে পেয়েছে গোটা দশেক মধুর চাক। এ দুদিনের মধ্যে চন্দনগড়ে কি ঘটেছে তার খবর তারা পায় নি। তবে পিছন কেউ নিতে পারে নি। তারা উড়িষ্যার এলাকার দিকে যায় নি। পুরীর পথকে বাঁ পাশে রেখে বনে বনে চলেছে। এলাকা বাংলার—সে দলপৎ চেনে। ঠিক করে নি কোথায় যাবে। তবে চলেছে। রুক্মিণীকে বাঁচাতে হবে আর তার বাচ্চাকে। মাধব সিং বলে গেছে, শ্বশুর, বেটাছেলে হবে আমার বিশ্বাস। আমার তোমার দু'জনের বংশধর, জলপিণ্ডের আধার। তাকে যেখানে হোক গিয়ে বাঁচাতে হবে।

সারাটা রাত্রি গাছের তলায় বসে। সে কি করবে? রুক্মিণীর এক-একটা কাতরানি ভেসে আসছিল আর বুকটা ধ্বক ধ্বক করে উঠছিল। সে চুপ করলে কি করবে ভেবেই যাচ্ছিল ঘটনাগুলো। দুদিনের মধ্যে ভাববার অবকাশ ছিল না। ভাবতে পায় নি। রাজার দেহটা? আঃ, কেউ ফিরল না? যাক, যাই হোক বাবা, রাজা মাধব সিং, তুমি ক্ষমা করো। তোমার বংশধর আর রুক্মিণীকে বাঁচাতে তোমার দেহ উদ্ধার করে সৎকার করতে পারলাম না। আসুক, আজ তোমার বংশধর আসুক। ওই কাতরাচ্ছে রুক্মিণী। সে আসছে। সে করবে তোমার সৎকার।

তখন জোয়ান বয়স দলুর, তখনও সে নোয়ায় নি, সোজা ছিল। চামড়া কোঁচকায় নি। দু-চার গাছা চুল পেকেছে। পাকুক, না হলে দাদো বলে মানাবে কেন? দাদো হয়ে সে এখনও পঁচিশ বছর পার করবে। তোমার বাচ্চা ষোল্লো বছরের হলে তার হাতে তোমার

তলোয়ার দিয়ে সে তলোয়ার ছাড়বে। দলপতের পাশে যে তলোয়ারখানা রয়েছে সেখানা মাধব সিং তাকে দিয়েছিলেন। যেদিন সে চন্দনগড়ে এসে তার পাইকদল নিয়ে রাজার পল্টনভুক্তান হ'ল সেই দিন। আর রুক্মিণীর কাছে আছে তোমার ছোরা। তারপর তাকে দিয়ে তোমার সৎকার করাব। গয়াধাম নিয়ে যাব। আর?

ঝিঁঝিঁ ডাকা রাত্রির বনে ঝিঁঝিঁর ডাক ঢেকে দিয়ে পাখিরা ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ও কি শব্দ? একটা কাতর আর্তনাদ রুক্মিণীর। তার সঙ্গে ওকি! শিশুর কান্না! পাখির ডাকে ঢাকা পড়ল।

চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এল অহল্যা। জয় কিষণজী! জয় কিষণজী! জয় কিষণজী!

—অহল্যা! চিৎকার করে উঠল দলপৎ।

অহল্যা বললে, শিঙাটা বাজা রে দাদা, শিঙাটা বাজা।

—কি হল বল্?

—কালা হয়েছিস? শুনছিস না চেল্লানি? কি চেল্লানি, কি চেল্লানি! বাপ রে বাপ! মার্ মার্ করছে যেন! বাজা, শিঙা বাজা, সবকে তুল্।

—ছেলে হ'ল?

—আঃ, সাত কাণ্ড রামায়ণের বাদে বলে সীতে কে? বললাম নাই চেল্লানির কথা! শুনছিস নাই?

হ্যাঁ, ছেলে চিৎকার করে কাঁদছে। চিৎকারে কান্নার বিলাপ নেই, রোষ রয়েছে যেন। হাসিতে ভরে উঠল দলপতের মুখ।

অহল্যা দুই হাতে একটা মাপ দেখিয়ে বললে, অ্যাই ছেল্যা, এই হাতের বাই। সদল বদল—

—কি ছেলে রে?

—কি আবার! বেটাছেলে না হলে অহল্যে চেল্লায়? শিঙা বাজাতে বল্। লে, শিঙা বাজা।

—না। শিঙা বাজালে সব ধড়মড়িয়ে উঠবেক। মনে করবেক কে কোথা দুশমন আইচে। সে গোলমাল হবেক। হবে, বাজবে শিঙা, বাজবে নাকাড়া, বাজবে ঢোল—সে দিন আসবেক। আজ লয়। জয় কিষণজী! জয় কিষণজী! জয় গোপাল! জয় যোগমায়া! জয় রাধামাধব! না, রাধামাধবের নাম সে করবে না। রাধামাধবের মন্দিরে রুক্মিণী ঢুকতে পায় নি। জয় কিষণজী! জয়

গোপাল! জয় যোগমায়া! তোমার বাচ্চার মঙ্গল করো। হে বনের দেবতা, তুমি মঙ্গল করো।

উপরের দিকে সে তাকালে। আকাশ ফরসা হয়েছে। ওইটা পূব দিক। গাছের ফাঁকে ফাঁকে লাল বরণ দেখা যাচ্ছে! পূবে সূর্য উঠছে। পশ্চিমে বন—কেবল বন, কেবল বন, দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহাড়গুলো এখনও কালো দেখাচ্ছে। আকাশের গায়ে মেঘের মতো।

সে উঠল, কালকের লোকেদের কাটা ডালগুলোর ইশারা ধরে যাবে সে নদীর ধারে। তার আগে সে ডাকলে, ভূপালে, এ ভূপালে, উঠ্। জেগে বস্। শুনছিস? রুক্মিণীর ছেল্যা হ'ল রে শুয়াররা। উঠ্। আমি আসছি।

আর একবার তাকালো সে রুক্মিণীর প্রসবস্থানের ঘেরাটার দিকে। গাছতলাটা সুন্দর। গাছটাও প্রকাণ্ড শাহী গাছ। অর্জুন গাছ। ঠিক হয়েছে। রুক্মিণীর বেটার নাম হবে অর্জুন সিং। আচ্ছা নাম। কিষণজীর দোস্ত অর্জুন। বহুৎ আচ্ছা হয়েছে।

[ক]

ভোরবেলা সে মুখ হাত ধোবার জন্যই ছোট নদীটির সন্ধানে ওই কাটা ডাল ফেলা বনতল দেখে ঘাটে গিয়ে পৌঁছল। ঘন বনের মধ্যেই নদীটি বয়ে যাচ্ছে। পাথরের বালিতে ভরা নদীবক্ষের উপর দিকে কাচের ধারের মতো জল তরঙ্গময় হয়ে উঠে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। এখন জল কম। অনেক বড় বড় কালো পাথরের মাথা উঁচু হয়ে বেরিয়ে রয়েছে। জলের দিকে তাকিয়ে দেখলে, স্বচ্ছ জলের তলায় পাথরগুলি সুন্দর গোলালো, নানা আকারের, নানা রঙের। কিছু কিছু পাথরের মাঝখানে সাদা সরু একটি বা দুটি দাগ পৈতের মতো বেড় দিয়ে রয়েছে। দলু সর্দারের সম্ভ্রম হ'ল। এ তো সবই শিবঠাকুরের জাতের পাথর। নদীটিকে তার পুণ্যময়ী বলে মনে হ'ল। সে খানিকটা জল মাথায় নিয়ে হাত জোড় করে বললে, মা, তুমি নিশ্চয় কোনো শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা। কোনো শাপ-শাপান্ততে নদী হয়েছ। স্বর্গে শিবপূজা করতে নিত্য, সে পুণ্যে শিবঠাকুর তোমার কোলে হাজার লাখ হয়ে তোমার ছেলের মতো খেলা করছে।

মা, আমি খুব বিপন্ন। আমার জামাইকে মেরেছে অন্যায় করে। আমার মেয়েকে নিয়ে বনে বনে ঢুঁড়ছি। কোথায় নিরাপদ ঠাঁই পাব যেখানে দুশমনেরা খোঁজ পাবে না। পেলেও তোমার মতো দেবতার দয়ার বেড়া ঠেলে আমাদের নাগাল পাবে না। দয়া কর মা!

হঠাৎ একটা গর্জনে চমকে উঠল দলু। একি! মা রাগ করলে! ওপারে একটা পাথরের উপর একটা বাঘ দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। সর্বনাশ! বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে শুক্লী বংশের ছেলে দলপৎ, শোলাঙ্কী রাজপুত ভয় খায় না। কিন্তু তার হাতে যে কিছু নেই বললেই হয়! একটা ভোজালি শুধু। সে অবশ্য পালাতে পারে। তখনও ওটা নদীর ওপারে। এক লাফে নদীটা পার হতে পারবে না। শয়তান ডোরা নয়, চিতা। কিন্তু ছুটলেই বেটা লাফ দিয়ে নদী পার হয়ে পিছু নেবে। এবং গিয়ে হাজির হবে ওদের আস্তানায়। রুক্মিণীর ছেলে হয়েছে। একটা শোরগোল হৈ-চৈ হবে। ভয় পাবে রুক্মিণী বাচ্চার জন্যে। ধাঁ করে একটা মতলব তার এসে গেল। সে যদি নদীর ধার ধরে আস্তানাকে দূরে পিছনে রেখে এগোয় তো কি করবে বেটা? বেটা কি তার সঙ্গে জিভ চাটতে চাটতে ওপার ধরে চলবে না? তারপর দূরে গিয়ে যা হয় বোঝাপড়া ওর সঙ্গে করবে দলু। একটা ভোজালিই যথেষ্ট, সে শোলাঙ্কী রাজপুত!

তাই সে করলে। ছুটে সামনের দিকে এগুলো সে যাতে আস্তানা দূরে পড়ে। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। তার মতলব হাঁসিল হয়েছে, বাঘটা একবার নদীতে নামবার উদ্যোগ করে আবার তীরে উঠে ঠিক দলুর সঙ্গে সঙ্গে চলল। দলু হেসে এবার বললে, আ বে, আও। আও মিয়া, আও। চলো, আওর থোড়া সামনে চলো। আওর থোড়া। চলছিল সে নদীর উজানে। ক্রমশ যেন বন মাটি উঁচু হয়ে উপরে উঠছে। নদীটা গভীর হয়েছে। সামনেই একটা জায়গায় উঁচু পাথরের গা বেয়ে নদীটা ঝোরার মতো ঝর ঝর ঝরে পড়ছে। নদীও সংকীর্ণ হয়েছে গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে। নদীর জল নীচে ঝরছে, নিচে একখানা পাথরের উপরে পড়ে ছিটকে উপরে উঠছে, চারিপাশে ছড়াচ্ছে। কুয়াশার মতো হয়ে বাতাসে ভাসছে। সে দাঁড়াল মুগ্ধ হয়ে। বাঘটাও ওপারে দাঁড়িয়েছে। দলু দেখতেই লাগল। ওঃ, অনেক—অন্তত পঁচিশ হাত নিচে পড়ছে জল। নদীগর্ভ প্রায় পঁচিশ

হাত গভীর এখানে। নিচে জল যেন ভাতের হাঁড়ির মতো ফেনায় ফেনায় টগবগ করে ফুটছে।
ওদিক থেকে 'ওঁ ঔ' শব্দ উঠল, বাঘটা শব্দ করছে। অর্থাৎ যেন বলছে কি বিপদ, লোকটা যে বিশ্রী জায়গায় দাঁড়িয়েছে। বেটার আর তর সইছে না। দলু বুঝতে পারলে এই ঝোরাটার কাছ থেকে সরলেই বাঘটা যা হোক একটা কিছু করবে। হয় লাফ দেবে, নয়—নয় কি করবে? নামবে নদীতে? কিন্তু সেই বা কি করবে? এইবার সোজা উলটো-মুখো পালাবে? আপসোস হ'ল বর্শাটা না আনার জন্যে। তলোয়ারখানা আনলেও হ'ত। হঠাৎ একটা ঘোঁত ঘোঁত শব্দে ওপারে বাঘের সামনের জঙ্গলটা নড়ে উঠল। বাঘটা চকিতে তার দিক থেকে সামনে দৃষ্টি ফিরিয়ে গর্জন করে লড়াই দেবার জন্যে দাঁড়াল যেন। দলু বুঝেছে কিছু নয়, এক বুনো শুয়োর। ঝোপের মধ্যে ছিল, বাঘটাকে দেখে ক্ষেপেছে। সে নিশ্চিন্ত হ'ল, সে খালাস। যা শত্রু পরে পরে। এবার বাঘটা পড়বে শুয়োরটাকে নিয়ে এবং ওই শুয়োরের মাংসেই আজ খুশী হবে। কিন্তু দুর্ধর্ষ শোলাঙ্কী রাজপুত-রক্তের কৌতূহল কম নয়। রক্তারক্তি জীবন-মরণের লড়াই দেখতে বিপুল উল্লাস। লড়াইটা তাকে দেখতেই হবে। সামনের ওই উঁচু জায়গাটা—যেখান থেকে ঝোরার জলটা ঝরছে ওখানটা থেকে বেশ দেখা যাবে। উঁচু একটা পাথরের চত্বরের মতো। চারপাশের ঘন ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য থেকে পাথরটার খানিকটা বেরিয়ে আছে। পাহাড় এপাশ ওপাশ দু'পাশেই এখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সে জায়গাটায় ওঠা সহজ নয়। অনেক ছোট বড় পাথরের চাঁই এবং ফাঁকে ফাঁকে কাঁটা জঙ্গল জন্মেছে। অবশ্য বনের মানুষ পাইক সর্দারের কাছে তা আদৌ দুঃসাধ্য নয়। সে পাথরটার উপর উঠে দাঁড়াল। ওপারটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঝোরাটা একটু আগে পড়েছে। ওঃ, ঝোপটা খুব জোরে দুলছে এবং বুনো শুয়োরটার গোঙানি শোনা যাচ্ছে। বাঘটা টান হয়ে দাঁড়িয়ে লেজ আছড়াচ্ছে! বা বা বা, লড়াইটা জমবে ভাল। প্রত্যাশামতো শুয়োরটা একেবারে তীরের মতো বের হ'ল, সামনে ছুটল; বাঘটাও একটা হাঁকাড় মেরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করল: লাগল দুই অসুরে মারামারি। শুকরাসুর আর বাঘাসুর। ঝোরার জল আর ঝরার শব্দ ছাপিয়ে তাদের হুঙ্কার উঠতে লাগল। চারিপাশের গাছ থেকে ভোরবেলার সদ্যজাগা

পাখিগুলো পাখা মেলে উড়ল। কলুর মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল দুটো ময়ূর। দলু ভুলে গেল রুক্মিণীর কথা, নাতির কথা, তার আস্তানা এবং নিজের কথা। দুই চোখ বিস্ফারিত করে দেখতে লাগল। সে নিজে বুনো শুয়োরটার দিকে। বাঘটা তার শত্রু। বাহবা বাহবা বাহবা! মুখে বাহবা দিয়ে হাতে তালি দিয়ে সে শুকরাসুরকে উৎসাহিত করতে লাগল। শুয়োরটার অঙ্গ-ভঙ্গির সঙ্গে কখনও নিজেই সামনে ঝুঁকছিল, কখনও বেঁকে যাচ্ছিল। বাঘটার সুবিধা হলেই সে তার দুই হাত হাঁটুর উপর রেখে স্থির হয়ে দেখছিল। হে মাতাজী, হে দেবকন্যা নদী, করুণা কর মায়ী—জিতিয়ে দাও ওই বরাহবীরকে।

সত্যিই ওই নদী মাতাজী শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা। তা নইলে বাঘের হার হয়! বরাহকে মাতাজীই জিতিয়ে দিলেন। বাঘটাকে এমন গুঁতো মারলে বরাহবীর যে বাঘটা ঘায়েল হয়ে পড়ল এবং পরক্ষণেই জান বাঁচাবার জন্যে জলে দিলে লাফ। বে-হিসেবী লাফ হয়ে গেল। হিসেবের ভুলে পড়ল একেবারে নদীর ভিতর। একেবারে আছাড় খেয়ে পাথরের উপর। সেই পঁচিশ হাত তলা থেকে ছিটকে উঠল জল। সাবাস! সাবাস! সাবাস! বুনো শুয়োরটাও জখম হয়েছে কিন্তু খুব বেশী নয়। তার সামনের শত্রু অদৃশ্য হতেই সে গোঁ গোঁ করে চলে গেল সামনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। দলু দেখলে বাঘটা নিচে জলের ঘুরনচাকে ঘুরছে—ডুবছে। পাক কতক ঘুরেই সেটা জলের তোড়ে ভেসে গিয়েই সজোরে ধাক্কা খেলে একটা উঁচু পাথরের সঙ্গে। একটু আটকে থেকে পাথরটাকে বেড় দিয়ে ছুটে চলা জলের স্রোতে চলল নিচের দিকে। দলুও ছুটল; এবার নিচের দিকে ভেসে যাওয়া বাঘটার সঙ্গে। কিছু দূর গিয়ে নদী যেখানটায় কম গভীর হয়েছে সেখানে সে নেমে পড়ল নদীর পাড় ভেঙে। জলের স্রোতের তোড়টা পা দিয়ে পরখ করে নিয়ে জলে নামল। জল ‹কে কোমর। ওই বাঘটা আসছে ভেসে। সে একটা চওড়া উঁচু পাথরের উপর বসল। বাঘটা ভেসে আসছে। এখনও চেষ্টা করছে যা কিছু পাচ্ছে তাই ধরবার। দলু ভোজালি হাতে সেই পাথরের উপর বসে অপেক্ষা করে রইল। বাঘটা পাথরটার সামনে এসেই থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরল পাথরটাকে। এবং আঘাতের যন্ত্রণায় জলের শ্বাসরোধী কষ্টের বিরক্তির উপর সামনে দলুকে দেখে দাঁত বের করে ভীষণ হয়ে উঠল। দলু সেই মুখের উপর তার ভোজালি দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করলে। হয়ে

লে—ইয়ে লে—ইয়ে লে! ইয়ে—। আ! বাঘটার থাবা ছেড়ে গেছে। পাথর থেকে সেটা জলে ডুবছে। দলু অপেক্ষা করে বসেছিল। লেজটা পেতেই সে হাতে চেপে ধরলে। তারপর এপাশ থেকে জলে নেমে টানতে টানতে নিয়ে এল কিনারার ধারে। বাঘের মুখখানাকে সে কোপে কোপে একেবারে চুর করে দিয়েছে। নিচের দাঁতের পাটিটাই ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে। সে শক্তিশালী লোক। সেটাকে টেনে কিনারায় ছেঁচড়ে তুলে আরও কটা কোপ মেরে উঠে দাঁড়াল। তারপর নদীকে প্রণাম করে বললে, জয় মাতাজী! এই বাঘের রক্ত নিয়ে গিয়ে অর্জুন সিং-এর কপালে তিলক লাগাবে। আর চামড়া ছাড়িয়ে ওর পাঁজরার সেই ছোট্ট হাড়টা, যেটা মানুষকে সৌভাগ্য দেয়, সেইটে পুরে একটা তক্তি বানিয়ে এখন গলায় ঝুলিয়ে দেবে। বড় হলে সেটা পরবে হাতে।

বাঘটাকে টেনে আনতে আনতে তার মনে হ'ল এটা তাকে নদীমাতা ইশারা দিলেন। বললেন, দলু বেটা, আমার কিনারায় থাক, আমি তোকে এমনি করেই রক্ষা করব। আমার খুশি হলে আমি সব পারি শিবের বরে। শিব আমার ছেলে। আমি বুনো শুয়োর দিয়ে বাঘ মারি। বাঘ হ'ল দুশমন। মীর হবিবও ওই—সুচেত সিংও ওই। থেকে যা এখানে। হ্যাঁ, ঠিক কথা। মাতাজীর কথা ঠিক। এবার একবার থমকে দাঁড়িয়ে সে ভাল করে চারিদিক চোখ মেলে দেখলে। সামনেই সেই পাহাড়। যা কাল সন্ধ্যে থেকে দেখে আসছে। এখন স্পষ্ট হয়েছে। সকালের রোদ পড়েছে পাহাড়ের উঁচু চূড়াগুলোর উপর। ওঃ, চূড়া তো একটা নয়! এক দুই করে গুনে গেল দলু। বারোটা! পাহাড় খুব উঁচু নয়। ছোট। একটাই বেশ উঁচু। গায়ে ঘন জঙ্গল। যে বারোটা পাহাড়ের চূড়ো বারোজন ভারী জোয়ানের মতো গোল হয়ে পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসেছেন এই মাতাজী। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা হলে তো এই বারো জোয়ান পাহাড়ের হাত ধরাধরি করা গোলাইয়ের ভিতরটা দেখতে হয়। ওর ভিতর তো ওই নদীর কিনারায় বড় ভাল জায়গা মিলবে বসতের। হাঁ, দুশমন হলে বারো পাহাড় রুখবে। আর তারা যদি বারো পাহাড়ের গায়ে দুই বারো চব্বিশ ঘাঁটি গাড়ে, তাহলে পাহাড়ের হাত ধরার মতো নিচু জায়গাগুলো খুব সহজে রুখতে পারবে। স্রেফ পাথর গড়িয়ে দিলেই কাম ফতে। এক পাথর পাঁচ-দশ

সিপাহীকে পিষে মেরে দেবে। বর্শা কিছু করতে পারবে না, তীর না, তলোয়ার না, এমন কি, কোনো শয়তান দুশমন কামান দেগেও তার কিছু করতে পারবে না।

ওই ভিতরটা তো গিয়ে দেখতে হয়। নিশ্চয় বসতের খুব ভাল জায়গা মিলবে। মিলতেই হবে। নইলে এমন হয়। এখানে থামাবার জন্যে নদীমাতার লীলাতে এইখানেই রুক্মিণীর প্রসববেদনা উঠল। অর্জুন সিং ভূমিষ্ঠ হ'ল। সকালে নদী-মাতা তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন বুনো বরা তার দুশমন বাঘকে মেরে দিল। আর ইশারা কাকে বলে?

[খ]

বেলা একপ্রহর হয়ে গেল দলু সর্দার পঞ্চাশ জোয়ানকে রুক্মিণী, অর্জুন সিং, বালবাচ্চা গরু-বাছুর পাহারায় রেখে, পঞ্চাশ জোয়ান সঙ্গে নিয়ে বের হ'ল ওই নদীমাতার কিনারা ধরে পাহাড়-ঘেরা জায়গাটা দেখবার জন্যে।

দু'ভাগ হয়ে তার দুই কিনারা ধরে এগোতে লাগল। দলু হুকুম দিলে, বাঘ দেখলে মারবে—সে দুশমন। হরিণ মারবে—সে খাদ্য। ময়ূর—সে দু'চারটে মারবে, তাদের সঙ্গে চাট হবে। সাপ মারবে—সে সব দুশমনের উপর দুশমন। গো-সাপ মারবে না, সে সাপ খায়। দু-একটা মারতে পার। মারবে না শুধু বুনো শুয়োর। না, ও মারা চলবে না। দুই দল নদীর কিনারা ধরে সেই ঝোরাটা পার হয়ে উপরে উঠে বাহবা বাহবা করে সাবাস দিয়ে উঠে থমকে দাঁড়াল।

দলু যা ভেবেছিল তাই। বারো পাহাড় গোল হয়ে সত্যিই বারো জোয়ানের মতো হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরটাও প্রায় একটা গোলাই। বারো পাহাড়ের গা বেয়ে পনরো-ষোলোটা ঝরনা নেমে এসে একটা বিলের মতো হয়েছে। সেই বিলের জল এই ঝোরাটার মুখে হরদম ঝর ঝর করে ঝরে নদীমাতাকে তৈরি করেছে। বিলের চারিপাশটায় ঘন জঙ্গল। বড় বড় গাছ। শাল অর্জুন বট অশত্থ। শাল অর্জুন বেশি। তেমনি নিচে ঝোপ ঝাড় আর জঙ্গল। বড় বড় লতা গাছে জড়িয়ে উঠেছে। লতা-গুলোর গোড়া পাহাড়ে চিতির মত মোটা। সরু কাঁটা ভরা ছোট

লতার অন্ত নেই। হুঁশিয়ারির সঙ্গে পা ফেলতে হবে। নইলে কাঁটা কাঁটা আর কাঁটা। শুধু তাই নয়, নিচের গোলাটার সমস্তই স্যাঁতসেঁতে। পাহাড়ের কোণগুলি থেকে অবিরাম জল চুঁইয়ে পড়ে মাটিকে প্রায় কাদার মত করে রেখেছে। বসবাসের চাষবাসের অযোগ্য। একটা সোঁদা জবজবে গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে। তবে একটা খবর ওই ভিজে মাটিতে লেখা ছিল সেটা দলু সর্দার আর তার বনচারী সঙ্গীদের চোখে পড়ল। নির্ভুল খবর এবং তারা তা নির্ভুলভাবেই পড়ে নিলে। নরম মাটির উপর পায়ের ছাপে ছাপে লেখা আছে এই পাহাড়ের বনের ভিতরকার বাসিন্দাদের সংবাদ। হরিণ আর বুনো শুয়োর বেশি। ভালুক কম নয়। বাঘের পায়ের ছাপও মিলল, তবে ছোট; চিতার পায়ের দাগ গোটা কয়েক। বড় পায়ের ছাপও রয়েছে। বাঁদরের হাত-পায়ের ছাপও দেখা গেল। আর সব পাখির পায়ের আলপনা। সজারু খরগোশ শেয়াল এসব তো আছেই। সাপের পেটের আঁকাবাঁকা দাগও রয়েছে তার মধ্যে। পাখিরা আকাশে উড়ছে। বাঁদরেরা গাছের ডালে রয়েছে। দুটো ময়ূর তাদের সামনেই ঝপ করে এসে জলের ধারে বসল। দলু বললে, মারিস না। দুই দল দু'পাশে দাঁড়িয়েছিল। দলু বললে, এক কাজ কর্ ইবার, তোরা সব উদিক দিয়ে পাহাড়ে উঠ্। আমরা ইদিকে উঠি। দুদিক থেকে সামনে এক মুখে চলি, তাহলে ঠিক মাঝ বরাবর দেখা হবেক।

তাই উঠল। দলু নিজের দল নিয়ে উঠল, সব থেকে উঁচু পাহাড়ের মাথাটা তার দেখার এলাকার মধ্যেই পড়বে। দলু আরও বলে দিলে, প্রথমেই প্রথম পাহাড়ের একেবারে মাথায় উঠে খুব উঁচু দেখে গাছের মাথায় চড়াবি কাউকে। দেখে লিবি আশপাশ। নিজের দিকের পাহাড়ে মাঝখান পর্যন্ত এসে সে খুশী হল। মাটি পাথর জমে বেশ শক্ত জমাট জমিন। গাছগুলো এখানে নিচের গাছের মত বড় নয়, জমির উপর পাহাড়ের লতাজঙ্গল আছে কিন্তু তা খুব ঘন নয়। বন পাহাড়ের আজীবন অভিজ্ঞতায় সে বুঝতে পারলে এখানকার জমি কেটেকুটে সমান করে নিলে বাস করা চলবে। খানিকটা মাটি হাতে নিয়ে দেখে একটু মুখে দিয়ে চাকলে, হাতে গুঁড়ো করে দেখলে, শুঁকেও গন্ধ নিয়ে দেখলে।

দলু উৎসাহিত হয়ে বললে, ঠিক আছে। মাটি ভাল। চল।

একজন বললে, চুপ। হরিণ। হুই!

বনের গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে একটা বড় সম্বর, ঘাড় উঁচু করে মুখ তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত বাতাসে মানুষের গায়ের গন্ধ পেয়েছে। কান খাড়া করেছে। বড় শিঙওয়ালা মরদ হরিণ। দলু ইশারায় বললে, তুই দল হয়ে তুদিকে থেকে। হরিণ চতুর, অত্যন্ত সতর্ক। কিন্তু মানুষ তার চেয়েও চতুর। এক দল এড়াতে গিয়ে সম্বরটা ছুটে একেবারে দলুর দলের সামনে এসে পড়ল। দলুদের বর্শা তৈরি হয়েই ছিল। একসঙ্গে তিনটে বর্শা তার ঘাড়ে বুকে গিয়ে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল। একটা গাছের ডাল কেটে বনের লতা দিয়ে সম্বরটার চার পা বেঁধে ওই ডালে ঝুলিয়ে কাঁধে তুলে তারা চলল। আরও মারা পড়ল একটা ভালুক। বড় বাঘ দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল বনের মধ্যে। বড় সাপ দেখে দলু থমকাল। 'শঙ্খচূড় লাগে। হিতে?'

হিতলাল পাইক সাপের বিদ্যা জানে। সাপ ধরে। সে গুণী ওস্তাদ। সাপটা একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে উঠছিল। হিতলাল দেখে বললে, শঙ্খচূড় ঠিক নয়, ওই জাতের বটেক। বেদো জাতের বটেক। ইয়ার মাটো বটেক শঙ্খচূড়, বাবাটো বটেক ঢ্যামন। উ জাতের মেয়েগুলান বড় ছেনাল। তবে ইও কম লয়। উয়ার লেগ্যা ভেবো নাই গ। বনে আমি ঈয়ের-মূল দেখে এসেছি। এনে লাগায়ে দিলে তার গন্ধে শালারা সে মুখে হাঁটবেক নাই।

বড পাহাড়টার উপর উঠে তারা থমকাল। পাহাড়ের বুকে পায়ে হাঁটা পথের চিহ্ন। মানুষের পায়ের পথ। মানুষ আছে এখানে! অতি সন্তর্পণে তারা এগিয়ে চলেছিল। মানুষের সব থেকে সেবা তুশমন মানুষ। তারা আছে এখানে। কিন্তু কারা? বনে পহাড়ে বুনো মানুষ অনেক জাতের আছে। একেবারে উলঙ্গ মানুষও আছে। বনের পশুর মতই ফল-মূল-পাতা জন্তু মেরে মাংস পুড়িয়ে খায়। অখাদ্য কিছু নেই, সাপ মেরেও মুণ্ডটা এবং কঙ্কালটা বাদ দিয়ে বাকিটা ঝল্‌সে নিয়ে পরমানন্দে খায়! তার থেকে ভাল মাংসা নাকি তাদের নেই। ঘাসের বীজ সেদ্ধ করে ভাতের অভাব মেটায়। তাদের সড়কি আছে, তীর আছে, সবই বিষ মাখানো। এবং লক্ষ্য তাদের অব্যর্থ। ওঁরাও মুণ্ডা সাঁওতালদের মত। অথবা আরও বুনো।

দেখাও মিলল কিছুক্ষণের মধ্যে। দলুরা সন্তর্পণে এগোচ্ছিল—হঠাৎ

একট গাছের আড়াল থেকে একটা কালো উলঙ্গপ্রায় মূর্তি যেন গাছের গুঁড়ির ভিতর থেকেই বেরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে তাদের ভাষায় চিৎকার করতে করতে ছুটল। এদেশেরই ভাষা তবে অনেক ওদের নিজেদের শব্দ মেশানো আছে। তারা আশ্চর্য হয়ে গেল লোকটা যা বলছে শুনে। কুটুম এসেছে কুটুম এসেছে বলে চিৎকার করছিল সে। কুটুম অর্থাৎ কুটুম্ব আত্মীয়। সেকি! দুশমন নয়?

দলু বললে, বজ্জাতি। বজ্জাতি বোধ হয়। সব তৈয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে যা।

গোল করে ব্যূহ রচনা করলে দলু। উল্টো দিকে মুখ করে দলুকে ভিতরে রেখে তারা গাছের আড়ালে আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল। একজন গাছে উঠল দেখতে। কোন্ দিক থেকে আসছে সে দেখে নিচের লোককে হুঁশিয়ার করবে।

সে হঠাৎ বললে, আসছে। হুই উপর দিক থেকে।

—কত জন রে?

—সর্দার!

—কি?

—ই তাজ্জব! সবগুলান মেয়ে লাগছেক।

—মেয়ে?

—হুঁ গ।

—ভাল করে দেখ্।

—দেখছি। উয়ারা আধা নেংটা গ। বুক দেখা যেছে। চুল দেখা যেছে। হাতে পাতায় করে কি সব আনছে। পিছাতে মরদরা। পিছাকার উরা মরদ বটেক। হাতে ধেনুক রইছে, কাঁড় রইছে।

—কত গুলান?

—তা, অ্যানেক বটেক। মেয়াতে মরদে একশো হবে।

দলু তাকে বললে, উদিকে, উদিকের পাহাড়ে আমাদের নোকদের দেখতে পেছিস?

—উঁহু। হাঁকব?

—থাক্। আসতে আসতে সব শেষ হয়ে যাবেক যা হবার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল অর্ধ-উলঙ্গ মেয়ে একটু দূরে এসে থামল। তাদের হাতে পাতার ঠোঙায় ঠোঙায় কিছু রয়েছে। জন দুয়ের মাথায় হাঁড়ি। বুনো জাতের ধেনো মদের তীব্র গন্ধ বাতাসে ভেসে

আসছে। তারা এসে থমকে দাঁড়াল। তাদের পিছনে একদল প্রায়-উলঙ্গ পুরুষ, তাদের হাতে মোটা বাঁশের ধনুক, পিঠে ফলাওয়ালা তীরের চোঙা এবং সড়কি।

মেয়েগুলো হেসে বললে তাদের ভাষায়, কুটুম এস, কুটুম বস। বস কুটুম, মদ খাও। মদের সাথে পিঠা খাও। মাংস খাও। আবার কুটুম, মদ খাও। না খাও তো ফিরা যাও। এ হুকুম মায়ের বটেক, এ হুকুম সাধুবাবার বটেক। খাও যদি তো কুটুম, লইলে দুশমন ওই দেখ মরদগুলান কাঁড় সড়কি লিয়ে তৈরী বটেক।

অবাক হয়ে গেল দলু। সে জিজ্ঞাসা করলে, তোরা কে?

—ছত্রিশ জেতে আমরা। খাও কুটুম, খাও। বস কুটুম, বস। না খাও তো মা ঠাকুর কোপ করবে। সাধুবাবা বলে গেছেক ইখানকার জ্বর ধরবে। ই জ্বর মরণজ্বর। ধরলে পরে বাঁচবে না। তারা পাতাগুলি নামালে কিছু দূরে তাদের সামনে। মদের হাঁড়িও নামালে। তারপর আবার ডাকলে, এস, খাও।

[গ]

বিচিত্র জাত। তিন পুরুষ অরণ্যভূমিবাসী, দলুদের কাছেও তারা অতি-বন্য এবং অতি-বর্বর। কিন্তু দলু তাদের সঙ্গে ঝগড়াটা করলে না। তাদের দেওয়া খাবার এবং মদ খেলে। তবে প্রথমেই বলেছিল, ওদের ভাষাতেই বলেছিল, খাবারে বিষ নাই কে বললে? দিস নাই তো?

—ওরে বাবা! ওরে মা! হেই ঠাকুর! হেই সাধুবাবা! না না না!

দলু বলেছিল, বেশ, তবে তোরাও আমাদের সঙ্গে খা।

খাবার—অন্য কিছু নয়, ঘাসের বীজের মোটা পিঠে আর মাংস।

তারা বলেছিল, তুমি খাঁটি কুটুম, খাঁটি কুটুম। তুমি খাও, আমি খাই। ভেঙে ভেঙে খাই।

দলু জিজ্ঞাসা করেছিল, মাংস কিসের? সাপ লয় তো?

—সাপ লয়, বুনো শুয়োর বটেক। খুব ভাল বটেক।

—আমাদের জাত যাবে যে!

—জাত ইখানে নাই। ইটা ছত্রিশ জাতের মায়ের হুকুম। আর সাধুবাবার হুকুম। আমরা ছত্রিশ জেতে।

দলু বলছিল, আগে মদ দে। তোরা খা আগে।

তারা হেসেছিল খিল খিল করে। মরদরা হেসেছিল হো হো শব্দে।

—পেসাদ—আমাদের পেসাদ খাবেক?

মদ খেয়ে দলু তাদের বিবরণ শুনেছিল।

এই যে নিচে নদীর দু'ধার, স্যাঁতসেঁতে জবজবে, এই যে ঘন জঙ্গল, এখানে এক মরণজ্বর আছে। সে জ্বর ধরলে মানুষের আর রক্ষা নেই। আর আছে ওই সাপ। ওই সাপে কামড়ালে হাতী মরে। এখানে আগে আগে মানুষ এসেছে। তারা সব ওই জ্বরে আর সাপের কামড়ে মরেছে। এখানে মানুষ আসে না। একদিন এক সন্ন্যাসী এল। এসে এই পাহাড়ে গাছতলায় বসল। সে মা মা করে কাঁদছিল। মা তাকে স্বপন দিয়েছে কি ওই মরণজ্বরের পাহাড়ে যা, সেখানে আমার দেখা মিলবে।

কদিন পর জ্বর হল সাধুর। খুব জ্বর। সাধু জ্ঞান হারাল। তখন একটি মেয়ে এসে মাথার কাছে বসে বললে, এই শিকড়টি খা। জ্বর তোর ভাল হবে।

সাধু বললে, তুমি কে মা?

মেয়ে বললে, আমি ছত্রিশ জাতের মা। আমি মদ খাই, শুয়োরের মাংস খাই। এই রাজ্য তোকে দিলাম আমি। আমার পূজা কর্। ওই মদ, ঘাসের বীজের পিঠা আর শুয়োরের মাংসে ভোগ দে। আর এই দিলাম জ্বরের ওষুধ। এই শিকড় পুঁতে দে, গাছ হবে। জ্বর হলে এই শিকড় দিবি, ভাল হবে। এখানে ছত্রিশ জাত এনে বাস করা। যত ঘর-ছাড়া ঘর-হারা মানুষ নিয়ে ছত্রিশ জাত। উঁচু নাই নিচু নাই—সব এক।

সেই সাধুর শিষ্য হয়ে বাস করেছিল এরা। যারা এসেছিল কেউ ছিল খুনে, কেউ ছিল ডাকাত, কেউ পলাতক, কতক হা-ঘরে বেদে। নিরাপদ আশ্রয় এটি। জ্বরের ভয়ে কেউ আসে না। আসতে চায় না। তা ছাড়া চারিদিকে পাহাড়। আবার শুধু জ্বরও নয়, এখানে এসে ছত্রিশ জেতেও হয়ে যায়। জাত থাকে না। জাত মানলে ওরা লড়াই করে, তাড়ায়, মেরে ফেলে। যদি কোন আগন্তুকেরা জেতেও তাহলেও থাকতে পারে না। কারণ তাদের ওই

জ্বর ধরে। যে জাত মানে তাকে ওষুধ দিতে মানা। ওষুধ কি তা কেবল একজন চেনে, আর কেউ চেনে না। তার মরবার সময় হলে সে আর একজনকে চিনিয়ে দিয়ে যায়। মায়ের আদেশ আছে সে যদি মায়ের আদেশ ভঙ্গ করে অন্য কাউকে ওষুধ বলে দেয় তবে তার হাতে ওষুধ খাটবে না। আর যে বলে দেবে—তার ছেলেপুলে সব মরবে। মায়ের দেওয়া আরও একটি ওষুধ আছে, সেটা ওই সাপের ওষুধ। সে ওষুধ কেবলমাত্র চার পাঁচ ঘরের লোকের মধ্যে জানে। তারা এখানে যখন আসে তখন বেদে ছিল—এখন সবার সঙ্গেই একজাত—ছত্রিশ জাতিয়া।

দলু এবং দলুর দল মদের নেশায় লাল চোখ বিস্ফারিত করে গল্প শুনছিল। মদটা খুব কড়া। নেশা যেন সাপের বিষের মত শন-শন করে রক্তের মধ্যে ফিরছে। মাথায় উঠে ঝিন্‌ঝিন্ ঝিন্‌ঝিম্ করিয়ে দিচ্ছে মগজকে। কিন্তু দলু পাকা মদ খাইয়ে এবং তার সর্দারী করা বুদ্ধি এরই মধ্যে বেশ হুঁশিয়ারির সঙ্গে খেলছিল। সে ইশারায় সকলকে বারণ করেছিল মদ খেতে। তাতেও সকলে বোঝে নি। তখন সে বলেছিল, হাঁ হাঁ বাবা পাইকরা, গুরুর আদেশ ভুলবি না। যে ঠাঁই যাবি সে ঠাঁইয়ের নিয়ম মানবি। মানলি তো বাঁচলি, সুখ পেলি। না মানলি তো মরলি, দুখ পেলি। কি বল্ কুটুমরা ?

খুব খুশী হয়ে তারা বলেছিল, হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তুমি কুটুম ভারী কুটুম, তুমি কুটুম হিয়ার কুটুম।

একটা পূর্ণযৌবনা মেয়ে, সে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরেছিল।

ওদের মাতব্বর বলেছিল, উ তুর কাছে গেল। তু উকে পেলি। তুকে দিলম। তুকে আমরা নিলম।

মেয়েটা দলুর হাত ধরে টেনে বলেছিল, চল্ আমার ঘরকে।

—বস্। তাহলে আমার গুরুর আর একটি কথা বলি। তুদের গুরুর কথা মানলাম। আমাদের গুরুর কথা শোন্। গুরু বলেছে, নিয়ম মানবি। সুখে থাকবি। কখনও গলা ঠেঁসে খাবি না পরের পেয়ে, খেলে পরে মরবি। আর তিন পাত্তরের বেশি মদ খাবি না কুটুম বাড়িতে পেথম দিন। কি ? খারাপ কথা ?

—না না, ভাল কথা।

দলুরা সেখানে সারাটা দিন রইল। ইতিমধ্যে ওদিকের দলটা ওদিকটা সমস্তটা ঘুরে প্রায় অপরাহ্ন বেলায় এখানে এসে পৌঁছেছিল।

সারাদিন ঘুরে তারা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। শিকার তারাও করেছে কয়েকটা ময়ূর, সজারু, কতকগুলো পাখি, দুটো হরিণ। একটা হরিণ তারা ছাড়িয়ে আগুন করে ঝলসে খেয়েছে তবে ওদের দুজন জখম হয়েছে। একজন মরেছে। একটা পাহাড়ে নাকি ভিমরুলের গুহা আছে। আগে যারা যাচ্ছিল তারাই ওই গুহার মুখে এসে হঠাৎ ভিমরুলের সামনে পড়ে। দেখতে দেখতে ভন ভন শব্দ করে ঝাঁক বেঁধে তাদের তাড়া করে। তাদের কজন তাড়াতাড়ি করে ছুটতে গিয়ে শেষে পথ না পেয়ে পাহাড়ের পাথরের উপর থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে। তারা হাত পা ভেঙে বেঁচেছে। একজনকে ভিমরুলেরা ছেঁকে ধরে বিঁধে মেরে ফেলেছে। পিছনের দল থমকে গিয়ে পিছিয়ে যায়। তারপর শুকনো ডাল যোগাড় করে আগুন জ্বেলে সেই জ্বলন্ত ডাল মাথার উপর ঘুরিয়ে অনেক ঘুরে পাহাড়টা পার হয়েছে।

বুনোদের মাতব্বর বললে, বাবা, উগুলান মায়ের বাহন বটেক। আগে আরও ছিল, ই পাহাড়ে ছিল। তা সি সন্ন্যাসী মাকে বলে বনে আগুন লাগায়ে মন্তর পড়ে যজ্ঞ করলেক। তখুন ই পাহাড় থেকে ভিমরুলরা পালাল। মায়ের আদেশ রইল—ই পাহাড় ভিমরুলের রইল। ওরা তুদের বিপদ-আপদে সহায় হবেক। বিন্ধ্যাচলে মায়ের সৈন্য আছে—ভ্রমর। এখানে ভিমরুল।

দলু সারা দু প্রহরটি সেই যুবতীর সঙ্গে কাটিয়েছিল তার ঘরে। মেয়েটা বলেছিল, তুমি একটা বীর বটেক। বাবা রে, গায়ে কত বল তুমার! তেমনি কেমন রঙ বটেক গোরাপারা! চোখ দুটো বড় বড় বটেক! তুমি খুব সোন্দর!

দলুর বয়স তখন দু-কুড়ি সবে পার হয়েছে। সে তখন ভরা জোয়ান। তার নিজের রূপের এবং শক্তির অহংকার ছিল। তার ভাল লেগেছিল যুবতীর স্তব প্রশংসা। তার শখের গোঁফে তা দিয়ে বলেছিল, ই দুটো?

—হুঁ। খুব খুব খুব ভাল। আমাদের মরদগুলোর মোচ ইতিটুকুন টুকুন—ছাই।

দলু স্ফীত হয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ হয় নি। সে জেনে নিয়েছিল এখানকার সবকিছু এবং জানতে পেরেছিল যে, এই এদের আত্মরক্ষার কৌশল। এখানে তাদের মত দু-চার দল কখনও কখনও এসেছে; এখানে থেকেছে। মদ আর নারীর সঙ্গে তাদের পা এখানকার

মাটিতে পুঁতে দেয়। কিন্তু দশ-বারো দিনেই তাদের জ্বর শুরু হয়। জ্বর প্রবল, তার সঙ্গে রক্ত দাস্ত। তিন দিন-চার দিনের বেশি কেউ বাঁচে না। এদের সর্দারই ওদের ওঝা। সে-ই জানে শুধু ওই জ্বরের ওষুধ। সত্যিই জানে। তাদের নিজেদের মধ্যে জ্বর হলেই শুধু সে-ই শিকড় দেয়। কিন্তু যারা আসে তাদের অন্য শিকড় দিয়ে থাকে। তারা মরে।

এখানকার জ্বর নিয়ে যারা ফিরে যায় তারা সেই জ্বর নিজের গ্রামে ছড়ায়। সেই জন্য ছত্রিশ জাতের জঙ্গলে কেউ আসে না। এখানে ঢোকবার পথকে লোকে বলে যমতুয়ার। ওই যে নদীটা— যে মুখটায় বেরিয়ে ঝোরা হয়ে ঝরে ঝরে পড়ে বয়ে যাচ্ছে, ওইটারই নাম যমতুয়ার। কখনও কখনও তু-একটা মানুষ মিশে থেকে গিয়েছে। তাদের মেয়ে এদের দিয়েছে। ওদের মেয়ে ওরা কুটুম এলেই দিয়ে খুশী করে।

মদের ঝোঁক কেটে আসছিল দলুর। দলু পাইকদের সর্দার, তার বুদ্ধি অনেক। সে নিজেদের মধ্যে দলে দলে প্যাঁচ করেছে। এক রাজার হয়ে অন্য রাজার সঙ্গে লড়াই করতেও বুদ্ধি নিয়ে খেলতে হয়েছে।

রাজারা সোজা নয়, তারা খুব বাঁকা মানুষ। লড়াই জেতার পর কত বার যে রাজার হয়ে তারা লড়েছে, তাদের সঙ্গেই সময়ে আচমকা লড়াই দিয়ে লুটেপুটে পালাতে হয়েছে। নইলে সময় পেলে ওই রাজাই তাদের মেরে ফেলত। বুদ্ধি তার আছে।

সে অনেক ভেবে সেদিনের মত তার কাছে বিদায় নিয়েছিল। বলেছিল, কাল আসব। আজ যাই কুটুম। আজ আচমকা এসেছি। কাল জিনিসপত্র নিয়ে আসব।

তারা দিয়েছিল এক হাঁড়ি মধু।

দলু চেয়েছিল, নুন, নুন দিতে পার ?

তারা তাও দিয়েছিল। বলেছিল, নুন আছে—যত লিবে। উই নিচে জবজবে একটা ঠাঁইয়ে ফুটে ফুটে উঠে সাদা হয়ে।

আস্তানায় ফিরে এসে সারা রাত্রি অনেক চিন্তা করে পরামর্শ করেছিল ভৈরবের সঙ্গে। ভৈরবকে বলেছিল, ভৈরব, এই ঠাঁইটার মতন ভাল বসতের জায়গা মিলছে না। ওই বারো পাহাড়। ইটার সঙ্গে উটা যেখানে যেখানে মিলেছে সেখানে ঘাঁটি বসালে—

আর নদী মায়ের দু মুখ, একটা উ-মাথায় ঢুকার মুখ আর ই-মাথায় বেরুবার মুখ আগলে দিলে যমও ঢুকতে লারবে। তার উপরে আছে ওই জ্বরের বিষ। জ্বর ধরলে দশ দিনে হাজার জনা খতম করবেক। ই জাগা ছাড়া হবে নাই। শুধু জানতে হবেক ওই জ্বরের ওষুধের শিকড় গাছ, আর সাপের বিষের শিকড় গাছ। সাপের ওস্তাদ আমাদের আছে। কিন্তুক জ্বরের বিষের ওষুধটা—ওটা আদায় করতে হবেক।

ভৈরব বলেছিল, সি কি করে আদায় করবেক? ওই একটি লোক জানে। সেই সদ্দার। সে তো দিবে নাই সিংজী!

—দিবে রে দিবে। সে ঠিক বার করে লিব আমি। হেসেছিল দলু।

—মেরে? যাতনা দিয়ে দিয়ে?

—সে শেষে। আগে শুলুকে।

—সিটা কি রকম?

—কটা খুব চালাকচতুর ছুঁড়ি চাই। চতুর হ' চাই, চটকদার হ' চাই। বেটাছেলেকে খেলাতে পারা চাই। যে সব মেয়ে আমরা ইখান উখান থেকে লুটে ছিনিয়ে এনেছি—তাদের ভিতর থেকে বেছে আন।

—হুঁ, বুঝলাম। বলেছ ঠিক।

দলু বলেছিল, ইদিকে আমি রইলাম। যে মেয়েটা আমাকে ধরেছে সিটা ওই সদ্দারের ছিল। সিটা আমাকে কাল খুব ভুলাতে চাইলে। গোঁফে তা দিয়ে দলু বললে, তা সিটাই ভুলল আমার কাছে। আমিও দেখব, সি জানে কি না। আমার সঙ্গে দশটা মরদ যাবেক। আর পাঁচটা ছুঁড়ি। দে দেখি দেখে। ঠিক সাত দিন বাদে আমি খবর দিব। না পেলে তু জানবি বিপদ। তখুনি তু যাবি দল নিয়ে। একেবারে শালাদিকে সব শেষ করে দিবি। সাত দিন তু রইলি। আমি রুক্মিণীর বাবা, তু তার কাকা। রুক্মিণী আর অর্জুন ইদের ভার তখন তুর।

—তাই হবেক সদ্দার।

—তু পিতিজ্ঞে কর্। আমি যদি মরি তবে তোর জান থাকতে উদের দুখ হবে নাই। তিন সত্যি কর্।

—করলাম। করলাম। করলাম।

আমিও বললাম, সদ্দারী তখুন তোর। রুক্মিণী তোর বিটী, অর্জুন তোর

লাতি। বেইমানি করলে তোর দুটো বেটা আছে, দু বেটার মাথায় বাজ পড়বে।

—পড়বে। পড়বে। পড়বে। শুধু তাই নয়—বেইমানি করলে আমার কুঠ হবে। হল তো?

—সাবাস, সাবাস! তু আমার মায়ের পেটের ভাইয়ের বাড়া। এখুন দেখে দে পাঁচটা ছুঁড়ি, দশটা মরদ। আর একটা কথা ভৈরব—কি বল।

ওই ঝোরার ধারে উঁচা শাল গাছটোর ডগায় একটো সাদা কাপড় বেঁধে দে। কুনো বেপদ হলে, রুক্মিণী অর্জুনের কুনো রোগ হলে উটা নামায়ে লিবি, লাল কাপড় বেঁধে দিবি। হোক্।

—হোক্।

দশটা মরদ—সেরা মরদ আর চালাক মরদ বেছে দিল ভৈরব। আর পাঁচটা লয়, ছটা মেয়ে এনেছিল। সব কটিই যুবতী এবং চঞ্চলা, না, তারও বেশি তারা—চপলা। এরা সব ওদের হরণ করে আনা মেয়ে বা হরণ করা মেয়ের মেয়ে। ওদের মধ্যে এরা দাসীর মত থাকে। ওদের ভোগ্যা।

দলু বলেছিল, সব শুনেছিস গ—ছুঁড়িরা?

তারা মুখ নামিয়ে মুচকে মুচকে হেসেছিল।

দলু বলেছিল, শুন্ শুন্, লাজের কথা লয়। তুদের হতে হবে মেনকা রম্ভা। অপ্সরী হতে হবেক। অসুর ভুলাতে হবেক। হাঁ! আর এই ছোকরা বেটারা! উদের মেয়েদের সঙ্গে মাততে পারবি তো?

তারা খুক খুক শব্দ করে হেসেছিল।

দলু বলেছিল, হুঁ—শুধু মাতলে হবেক নাই। মাতাতে হবেক।

মেয়েদের মধ্যে সেরা মেয়ে পঙ্খি—তাকে নিয়ে দলু ছত্রিশ জাতিয়াদের সর্দারকে দিয়ে বলেছিল—এই লে। ইটোকে তোকে দিলম। তু আমাকে ঝুমরীকে দিলি, ইকে আমি তোকে দিলম।

তিন

বুদ্ধির খেলায় দলুর জিত হয়েছিল। তিন দিন পরই দলু পেট ধরে পড়েছিল, পেটে যাতনা হচ্ছে। চার দিনের দিন পঙ্খিকে, যাকে দলু

ছত্রিশ জাতিয়ার সর্দারকে দিয়েছিল, সেই পঞ্চিও একটা ইশারা দিয়েছিল। তারপর সেই যুবতী ঝুমরীকে বলেছিল, ঝুমরী, আমাকে বাঁচা, আমি কখুনও পালাব নাই।

ওদিকে পঞ্চিও পেটের যাতনার ভান করে পড়ে ছিল এবং সর্দারকে বলেছিল, সর্দার, আমাকে বাঁচাও। সর্দার তাকে শিকড় দিয়েছিল খেতে। পঞ্চি তাকে দেওয়া সেই শিকড়টা চতুরালি করে খুঁটে বেঁধেছিল। এদিকে ঝুমরী দলুকে দেওয়া শেকড়টা দেখে, সেটা খেতে দেয় নি, বলেছিল, আমি ঠিক শিকড় আনছি, ইটা খেয়ো না। তারপর আর দেরি হয় নি গাছটা জানতে। দলুর গোটা অসুখটাই নকল। সে ঝুমরীর দেওয়া শিকড়টা খাবার ভান করেছিল: খায় নি। অবসরমত গোপনে পঞ্চির সংগ্রহ করা জড়ির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বুঝেছিল—হ্যাঁ, এই আসল জড়ি।

ইতিমধ্যে পাঁচ দিনের দিন সত্যিই একটা জোয়ানের জ্বর হয়েছিল। সেদিন ছত্রিশ জেতে সর্দার ওষুধ দিলে সেটা দেখে দলু বলেছিল, সর্দার, ঠিক জড়ি দাও। জাল দিয়ো না।

সর্দার বলেছিল, জাল লয়। ঠিক বটেক।

—না। লয়। এই দেখ আমার কাছে আসল জড়ি আছে।

চমকে উঠেছিল সর্দার, উ তুমি কুথা পেলে ?

দলু সোজা উত্তর না দিয়ে বলেছিল, কুটুম বলেছ, কুটুম হয়ে রইলাম। কিছু কইলাম না। এখুন বেইমানি করলে তোমার ই জাগা আমি চষে দিব, ধ্বসে দিব। তোমাদের সব লোককে কেটে' ফেলাব। হাঁ।

ছত্রিশ জাতিয়া সর্দার এবার বোবা হয়ে গিয়েছিল। এদিকে দলু তার এক জোয়ানকে পাঠিয়েছিল ভৈরবের কাছে। যেন বিশ পঁচিশ বাছাই মরদ তুরন্ত এসে হাজির হয়ে যায় একেবারে তৈয়ার হয়ে।

তাই এসেছিল। এবং ছত্রিশ জাতিয়া গড়ের গুপ্ত অস্ত্র মরণ-জ্বরের ওষুধের জায়গাটিতে ওদের সর্দারকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, চেনাও ওষুধ। শোন কথা। ওষুধ যদি চেনাও, তবে তুমি থাকলে, আমি থাকলাম। মিতা বলব। আমার লোকেরা থাকবে, তোমরাও থাকবে। মুখের কুটুম সত্যি কুটুম হবে। তা লইলে তুমাদের বেটাছেলেদিগে মায়ের থানে লিয়ে গিয়ে কাটব। মেয়েগুলাকে লুটে

লিব। চলে যাব ইখান থেকে। বাস্, দেখ। তবে গাছ আমি চিনেছি। পঞ্চি দিয়েছে জড়ি, ঝুমরী সেও এনে দিয়েছে জড়ি। আমি গন্ধ দেখলম এক, চেখে দেখলম এক। ছাপি আমার কাছে নাই।

সর্দার বোকা হয়ে গিয়েছিল এবং সত্যিই সব দেখিয়েছিল। কিন্তু লোকটা খাঁটি লোক ছিল। দলু তার নামে মাথা নামায়। সে যা করত তার ধরম পালন করত। কি করবে? ওইটাই ছিল এদের নিয়ম। কে করেছিল কে জানে! হয়তো সেই সন্ন্যাসী, নয়তো এরাই।

এদের বুদ্ধিমত এই মরণজ্বরে জর্জর জায়গাটির রাজত্ব বজায় করবার এ ছাড়া অস্ত্রও তাদের ছিল না। গুপ্ত নিয়ম। নিয়ম ছিল— বুদ্ধিতার ভান করে জায়গা দেবে। তারপর জ্বর ধরলে আসল ওষুধ দেবে না; যা-তা জড়ি দেবে। তা হলে তারা জ্বরে সব মরবে—নয় তো প্রাণের ভয়ে পালাবে। এ সর্দার সেই নিয়ম পালন করতে চেয়েছিল। কিন্তু দলুর বুদ্ধির কাছে হার মেনে ওষুধ চেনাতে বাধ্য হয়েছিল। নিয়ম ভেঙে সে আর বাঁচে নি। মরেছিল ইচ্ছে করে। সেদিন সে খুব মদ খেয়ে ফুর্তি করেছিল। কিন্তু পঞ্চিকে নিয়ে নয়, ঝুমরীকে নিয়ে। তবে পঞ্চি দলু সবাই ছিল। সে মদ খেয়ে দলুকে বলেছিল, আজ কিন্তু আমরা নাচব—সারারাত নাচব।

দলু বুঝতে পারে নি। বলছিল, বেশ তো।

সে আর ঝুমরী নাচ আরম্ভ করেছিল। সে মাদল বাজাচ্ছিল, ঝুমরী নাচছিল। মধ্যরাত্রি তখন। দূরে উঠেছিল বাঘের ডাক। বাঘের ডাক দূরে দূরে রোজই ওঠে। এখানে মরদরা পাহারা দেয়, টিন বাজায়, আগুন জ্বালে। বাঘেরও খাদ্যের অভাব হয় না। জানোয়ার আছে। হরিণ, বুনো বরা। হরিণ উপরের দিকে অনেক। কেবল বড় পাহাড়টায় নেই। ছত্রিশ জাতিয়ারা তাড়িয়েছে। নইলে ওদের টানে বাঘ আসবে।

বাঘের ডাক শুনে সর্দার মাদল থামিয়েছিল। ঝুমরীও থেমেছিল। সর্দার এসে ঝুমরীর হাত ধরে বলেছিল, চল।

দলু ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি এবং তার তখন ঘুমও এসেছে। তার ঘুম ভাঙিয়েছিল পঞ্চি।

—সদ্দার!

—কি ?

—উরা চলে গেল। ঝুমরী আর সদ্দার।

—কোথাকে ?

—বনে বনে ছুটে চলে গেল।

দূরে তখন বাঘ ডাকছে। দলু বলেছিল, সেকি !

উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। ডেকেছিল, সদ্দার ! সদ্দার। ঝুমরী !

ছত্রিশ জাতিয়ার একজন এসে বলেছিল, ডাকিস না উদের। উরা বনে গেল। ডাক এসেছে।

—কার ?

—মায়ের। মায়ের বাঘ ডাকছেক, শুনছিস না ?

—কি বলছিস ?

—ঠিক বুলছি। উ তো গেল বাঘের প্যাটে যাবে বলে। বাঘ আজ তাই লেগে তো আইছে। মা পাঠায়েছে।

—সেকি !

—হুঁ। তুকে সে ওষুধ দেখালে। ইখানকার যাদুটি গেল। উর অপরাধ হল, পাপ হল। সাধুবাবার, মাঠাকরুনের আদেশ বটেক কি—যি সদ্দার ই ফাঁস করবে তাকে পাপ লাগবে। কুঠ হবে। তবে বাঘ ডাকলে যদি তার প্যাটে যেতে পারে তবে পাপ খণ্ডাবে। উ চলে গেল। যেতে দে। আমরা তুর বশ মানলম।

পরদিন সকালে খুঁজে দেখছিল দলু, সর্দারের দেহের কিছু পায় নি, পেয়েছিল তার গলার মালা। বুনো ফলের কলো আর লাল বীজের মালাটা। আর কোমরের গাছের ছাল থেকে বের করা সুতোর ছোট্ট কাপড়খানা। ঝুমরী কিন্তু মরে নি। সে মরতে ভয় পেয়েই উঠে পড়েছিল একটা গাছে। দলু সর্দার তাকে নামিয়ে ফিরিয়ে এনেছিল। মেয়েটা কিন্তু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল—আমি লারলম গো, গাছে উঠে বাঁচলম।

দলু তাকে খুব সমাদর করে সান্ত্বনা দিয়েছিল।

* * *

তারপর দলু ছত্রিশ জাতিয়ার জঙ্গলে নিয়ে এসেছিল তার সমস্ত দল। খুব হিসেব করে সে এখানে বাস পত্তন করেছে। খুব হিসাব করে।

শুধু ভৈরবের সঙ্গে সে পরামর্শ করে নি। ঝুমরীর সঙ্গে আর পঞ্চির সঙ্গেই পরামর্শ করেছিল। ওই দুজনকেই সে নিজের উপপত্নী করেছিল। পঞ্চি লুট করে আনা মেয়ে, সে ভাল জাতের মেয়ে, বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। সে যখন ওষুধের শিকড়টা দেখেছে তখন তার স্বাদ জানে, গন্ধ জানে। খুঁজে বার করতে তার খুব দেরি হবে না। ঝুমরীর বুদ্ধি না থাক, সে ওষুধ চেনে। এ ওষুধের উপর পুরো অধিকার না থাকলে ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গল পাহাড়ের রাজত্ব থাকবে না।

এ ওষুধ অন্যে জানলে সে দল বাঁধবে। দল নিজের শক্তিতে। তার দলকে না পারলে বাইরে থেকে অন্য দল ডেকে আনবে।

দল বাঁধবে এই ভয়েই সে তার এক-শো পাইককে পাশাপাশি তিনটে পাহাড়ে বাস করিয়েছিল। নইলে ভৈরব বলেছিল, সর্দার, সব পাহাড়ে ছড়িয়ে কিছু কিছু করে বসাও।

দলু বলেছিল, না ভৈরব। মন না মতিভ্রম রে! উ হবে না। বেশি ছড়ায়ে বসালে পরে পাড়ায় পাড়ায় কোঁদলের মতন কোঁদল বাড়বে। কোঁদল থেকে ঝগড়া খুনোখুনি।

ভৈরব সেটা মেনেছিল।

দলু বলেছিল, দেখ্ যা করছি, সব ওই কুমর অর্জুন সিং-এর জন্যে। রাজা মাধব সিং-এর বেটার জন্যে। তার জন্যে এই ছত্রিশ গড়িয়া জঙ্গলকে গড় বানিয়ে তার হাতে দিয়ে যাব। আর বলে যাব, কুমর অর্জুন সিং, তুমি আমার লাতি বট। বিটীর বেটা বট, কিন্তু তুমি খাঁটি ছত্রি, রাজপুত। আমি তোমার দাদো, মায়ের বাপ। আমরা এক-কালের শোলাঙ্কী রাজপুত। অগ্নিদেবের বংশ। আপদ্ধর্মে আত্মরক্ষার জন্যে পৈতে হারিয়ে শুক্রী হয়েছি। আমরা আবার শুক্রীদের মধ্যে বারোভাইয়া, পৈতে ছেড়েছি কিন্তু ক্ষত্রিয় ধর্ম আমাদের অটুট রেখেছে; আমাদের বেটীরা দুবার শাদী করে না। বেটী আমার কিষণজীর ভজন করে, পূজন করে। আমার বেটী তোমার মা সাক্ষাৎ দেবী মহাসতী। মাধব সিং-এর রাধা হয় নি, সে শাদী করে তার রুক্মিণী নাম আর শোলাঙ্কী রাজপুতের ধরম রেখেছে। তোমার বাপের কাছে কথা দিয়েছিলাম তোমাকে বাঁচাব, তোমাকে রাজা করে বসিয়ে যাব। তা এই ছত্রিশ গড়িয়ার জঙ্গলকে গড় বানিয়ে তোমাকে রাজা করলাম। দিয়ে গেলাম এই পাইকদের। তুমি এদের রাজা, এদের দেবতা। এদের ভালবেসো। আর একটি কাম

করো রাজা, আমার ভাইয়া, এদের সঙ্গে চলে তুমি এদের জাতে তুলো। এদের বেটী ভাল লাগলে শাদী করো, রাখনী করো না।

ভৈরব অভিভূত হয়ে শুনছিল। সে বলেছিল, সর্দার, বাহা! বাহা! বললে তুমি। বাহা বাহা বাহা! ধরমের কথা। মানুষের মত কথা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক সর্দার। তামাম পাইক কুমর অর্জুন সিং-এর গোলাম। দাঁত দিয়ে তার পায়ের কাঁটা তুলবে। জান দিয়ে তার হুকুম তামিল করবে। কুমর অর্জুন সিং বড় ভারী রাজা হবে তুমি দেখো, মুল্লুক তার নামে কাঁপবে। কুমর বড় হতে হতে আমাদের একশো জোয়ানের ছেলেপিলেতে পাঁচশো হয়ে যাবে বিশ বছরে। আমি বলি চন্দনগড়ে যারা বেওয়া হল, মরদ যাদের মরল, তাদের সব সাঙা দিয়ে দাও। এক এক জোয়ান দুই তিন পরিবার। তাহলে পাঁচশো কেন, হাজার হয়ে যাবে। আর একটা কাজ কর।

—কি?

—এই বুনো মরদগুলোকে মেরে ফেল। এদের মেয়েগুলোকে দিয়ে দাও পাইকদের।

—না। ঘাড় নেড়ে দলু বলেছিল, না ভৈরব। সে বেধরম হবে, অধরম হবে। দেখ, মাধব সিংকে মারলে অধরম করে, আমাদের পাইকদের মারলে হাজার জনায় তিনশো জনাকে ঘিরে। সে অধরম, সে পাপ। ভগবানের খাতায় সে পাপ উঠে গেল। সে অধরমে আমরা দুনিয়াতে দুঃখ পেলাম, ভগবানকে দেখলাম—বললাম বিচার করো। মরণের পর তিনি বিচার করবেন। জরুর করবেন। সুচেত সিং মীর হবিব এদের মরণের পর বিচার জরুর হবে। চাঁদ সূরয এখনও উঠছে, দিন হচ্ছে রাত্রি হচ্ছে। বিচার হবে না? কুমর অর্জুন সিং বড় হবে, মস্ত বীর হবে। ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার হাতে ছুটবে টগাবগ টগাবগ। দুশমন দেখবে কি যম আসছে। সে তীর ছুঁড়বে, দুশমনের বুকে বাজবে বাজের মত। ওই মীর হবিব, ওই সুচেত সিং-এর খুন নিয়ে আসবে। রুক্মিণীর পায়ে ঢালবে, বলবে, লাও মা—দুশমনের খুন। বাপের খুন তারা নিয়েছিল, আমি আনলাম তাদের খুন। দুনিয়া ধন্যি ধন্যি করবে। উপরে দেবতা বলবে, সাধু সাধু। জিতা রহো। তেমনি বেইমানি করে এই মানুষ কটিকে অনেকজনা মিলে মেরে ভগবানের অভিশাপ আমি কুড়োতে পারব না। আমি ছত্রি রে। শোলাঙ্কী রাজপুত।

অগ্নিদেবের বংশ। তাছাড়া এখানে যে মাতাজী আছেন তিনি রুষ্ট হবেন। যে সাধু ওদের বসিয়ে গেছেন তাঁর আত্মা কোপ করবেন। খবরদার—খবরদার।
ভৈরব বার বার ঘাড় নেড়ে বলেছিল, ঠিক। ঠিক। বহুৎ বহুৎ ঠিক।
দলু বলেছিল, ওই ওষুধটার জন্যে সর্দারের সঙ্গে চাতুরি খেলে মনটা খচ্ খচ্ করছে। লোকটা নিজে গেল বাঘের পেটে। তবে—একটু ভেবে বলেছিল, না, আমার দোষ নাই ভৈরব। ও লোকটাই তো চাতুরি খেললে প্রথম। আমি তো নই। ভেবে দেখ, কুটুম বলে ডাকলে, মদ দিলে, পিঠা দিলে, বুনো বরার মাংস দিলে,—আমরা জাত মানলাম না, কুটুম্বিতে মেনে নিয়ে ভগবানকে ডেকে খেলাম। কিন্তু উর মতলব ছিল আমাদের জ্বর ধরিয়ে মেরে ফেলা। জাল ওষুধ দিলে বলেই আমি জাল ফেললাম পাল্টা। ঠিক কি না?
—হাজার বার ঠিক।
দলু বলেছিল, বাস্। তবে আর অধরম করব না। উদিকে মারব না। উরাও থাকুক আমাদের অধীন হয়ে। আমরাও থাকি। এখন এক কাজ কর—জলদি গাছ কেটে ফেলে সব আগে একখানা ঘর বানিয়ে দে কুমর অর্জুন সিং আর রুক্মিণীর জন্যে। তা'পরে সব চলে আয়। এসে ঝপাঝপ ঝুবড়ি বানিয়ে লে পেথম। তা'পর হবে ঘর বাড়ি। কি বল?
—ঠিক বলেছ।
দলু বলেছিল, তবে যে দিন আসবে সেইদিন ওই মা আর সাধুর স্থানে পূজা দিতে হবে, হাঁ। তারপর হবে বসত একে একে।
—ঠিক আছে, ঘর একখানা বানাতে কদিন? চার চার মিস্ত্রি আছে, পঞ্চাশ ষাট জোয়ান আছে, বুড়া আছে চল্লিশ, চৌদ্দ পনর ষোল বছরের ছেলে আছে পঞ্চাশ। শক্ত পোক্ত মেয়ে আছে, দু তিন শো আছে ছুঁড়িতে আধবুড়ীতে। সবাই খাটবেক। কদিন লাগবে?
পরদিন সকাল থেকে গাছ কাটা শুরু হয়েছিল। ছত্রিশ জাতিয়া বুনোরা থাকে ছোট ছোট ঝুবড়ির মধ্যে। তারা আয়োজন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

দলু ভৈরবকে বলেছিল, ভৈরব, এদের জন্যে কাপড় চাই রে। মেয়েগুলা আধল্যাংটা থাকলে চলবে না। ছোঁড়াগুলান জাহান্নামে

যাবে। বেটাছেলেগুলোকে কাপড় দে। নইলে আমাদের মেয়েরাই বা বেরাবে কি করে?

—কাপড় কোথা মিলবে?

—কাছেপিঠে হাট কোথা খোঁজ্।

—কিনবার টাকা কোথা?

—বেকুব বেহুদ্দা কুথাকার! কিনবি কি রে? কিনবি কি? আঁ? লুঠ! হাঁ। খাজনা আদায়! কুমর অর্জুন সিংয়ের লজরানা! আদায় শুরু করে দে।

চার

এ সব হল বিশ বছর আগেকার কথা। আজ বিশ বছর বাদ দলু সর্দার এখন পঁয়ষট্টি বছরের প্রৌঢ়। বালেশ্বর অঞ্চল থেকে সদ্য-ফেরত ভীম পাইকের ছেলে গণ্ডারের কাছে বর্গীদের নতুন সমাবেশের কথা শুনে ভাবছিল। খবর ওই গণ্ডার এনেছে। পথে সে শুনে এসেছে—বর্গীরা আবার আসছে। ভাবতে ভাবতে সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে একটা কারণে। কুমর অর্জুন আজ বিশ বছরের মরদ। বহুৎ আচ্ছা জিন্দা জোয়ান। এইবার তাকে একদিন সকলকে ডেকে ওই মায়ের মন্দিরের সামনে পাথরে বাঁধানো সর্দারীর বেদীর উপর আচ্ছা এক কাঠের চৌকি রেখে রাজা করে দেবে কি না। সমস্ত কথা বলে বলবে কি না যে, কুমর অর্জুন, তোমার বাপকে অধরম করে খুন করেছিল মীর হবিব। সে সাক্ষাৎ শয়তান। সে চলল আবার বাংলা মুলুকে তোমার গড়ের পাশ দিয়ে। তুমি পার তো শোধ নাও তোমার বাপের মৃত্যুর। এই মস্ত সুযোগ। ওদিক থেকে আসবে নবাব আলিবর্দী। তার সঙ্গে লড়তে হবে মীব হবিবকে। মীর হবিব বর্গী, এরা সামনাসামনি লড়ে না। এরা নবাব এলে পালায়, নবাব ফিরলে পিছু নেয়। ঠিক নেকড়ের দল। আবার নবাব ফেরে তো ওরাও ফের পালায়। যারা শক্তিমান তাদের সামনে শেয়াল, পিছনে অর্জুন সিং। এমন সুযোগ আর মিলবে না। আমরা সবাই তোমার পিছনে আছি। দলু সর্দার শুধু তোমার দাদো, তোমার বাপের শ্বশুর নয়, তার নোকরিও করেছে, নিমকও খেয়েছে। বিশ বছর ধরে এর জন্যে অনেক কষ্ট সয়ে

অনেক কৌশল করে সব আয়োজন করে রেখেছে। ছত্রিশ জাতিয়ার জঙ্গলগড় গড়ে তুলতে কি কম মেহনত করেছি ? কম তকলিফ সয়েছি ? লোকের জান গিয়েছে। জ্বরে আমাশয়ে কি কম মানুষ মরেছে! ওষুধ এখানে আছে। গাছের শিকড়, সে দলু জানে। সে ছাড়া আর এক শিখিয়ে রেখেছে তোমার মা রুক্মিণীকে। হঠাৎ যদি মরে সে— তবে! তবে সে বিলকুল বরবাদ হবে। ওষুধ থাকতেও ওষুধ খেয়েও মরেছে। এক এক বছর এমন হয়েছে যে এখান থেকে পালাবার জন্যে লোক পাগল হয়ে উঠেছে। এখানকার মাতাজীর পূজা দিয়েছি। বরার রক্ত দিয়েছি। নিজেরা বুক চিরে রক্ত দিয়েছি এক একবার। তবু মাতাজী প্রসন্ন হন নি। ফের পূজা দিয়েছি। তার[illegible] কমেছে।

দলু সর্দার অনেক বুদ্ধি ধরে। কুমর অর্জুন সিং সে লোকদের জোরজবর-দস্তি করে ধরে রাখে নি। তার বুদ্ধি আছে, সে এই বারো পাহাড়ের মাঝ বরাবর ক্ষতি করিয়েছে। কেটেকুটে পাহাড়ের গায়ে জমিন করে তাতে জোয়ার ভুট্টার চাষ করিয়ে প্রতিটি পাইককে জমি দিয়েছে। চাষ করো, খাও, ছোটখাটো হোক বেশ মজবুত মজবুত ঘর বানিয়ে দিয়েছে। মাটিতে পাথরের চাঁইয়ে দেওয়াল গেঁথে শালকাঠের চাল কাঠামো করে ঘাস দিয়ে ছাইয়ে খাসা ঘর হয়েছে। সর্দারদের ঘর বড়। তোমার ঘর সকলের থেকে বড়, সকলের থেকে ভাল। তোমার জন্যে রাজার ছেলের মত ঘরও বানাতে পারত, তা বানায় নি। বাইরের লোকের চোখ পড়বে। এখানেও বহুৎ লোকের হিংসা মনে হবে। বাইরের লোক জানে এরা সব ছত্রিশ জাতিয়া। তা জানুক। ছত্রিশ জাতিয়াদেরও সে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওরা আর সেই ন্যাংটা নেই। ওরাও এখন প্রায় পাইক হয়ে উঠেছে। এখানকার সাপকে জব্দ করেছে ওরা। প্রতি বছর সাপ মারিয়েছে দলু সর্দার। সাপের কামড়ে প্রথম প্রথম লোক কম মরে নি। লোক মরেছে, গরু মরেছে, ঘোড়া মরেছে। সাপ এখনও দশ বিশটা আছে, তবে লুকিয়ে থাকে। ওরাও মানুষকে ভয় করতে শিখেছে। বিশ বছরে বাঘের পেটে, ভালুকের আঁচড়ে, বুনো বরার দাঁতে তাও অনেক আদমী গিয়েছে। তাদেরও মেরেছে।

নদীর ধারে স্যাঁতসেঁতে জবজবে জমি এখন অনেক শুখা শুখা হয়েছে। নালা কেটে কেটে নদীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। সেখানে কিছু কিছু ধান হয়। লোহার বাগদী এনে কামারশাল করেছে। হাতিয়ার

শানায়, কানায়ও। লুটেপুটে হাতিয়ারও জড়ো করেছে অনেক। ছুতার তৈরি করেছে।

ছত্রিশ জাতিয়া গড়ের বারো পাহাড়ে, পাহাড়ে পাহাড়ে যেখানে যেখানে জোড়, সেখানে সেখানে মোটা মোটা কাঁটা গাছ, বড় বড় বট অশ্বত্থ গাছ লাগিয়ে তার আড়ালে মজবুত মজবুত ঘাঁটি বানিয়েছে। আর নদী মায়ী যেখানে ঢুকেছে, আর যেখানে ঝোরার মুখে ঝরে পড়ে চলে গিয়েছে, এই দুই মুখে দুই-দুই চার ঘাঁটি রেখেছে। সব জায়গায় আছে নাকাড়া। গাছের উপর মজবুত মাচান করা আছে। দেশে মুল্লুকে ঝঞ্ঝাট হলে মাচানে পাইকরা বসে যায়। পাহারা দেয়। বড় বড় পাথর জমা করা আছে। গড়িয়ে দিলে সিপাহী ঘোড়া গুঁড়িয়ে যাবে, হাতী পর্যন্ত খোঁড়া হয়ে যাবে। এখানকার চারিপাশে গাঁওয়ের লোকের সঙ্গে কোন ঝগড়া রাখে নাই। তাদের চুলেও হাত দেয় না। অনেক দূর দূর গিয়ে তারা গাঁও থেকে ধান আদায় করে আনে। দূর থেকে হাট লুট করে আনে, কাপড় মসলা তেল সরষা। সব জিনিস আনে। আয়না আনে, কাঁকুই আনে, দস্তার গহনাও আনে। টাকা আনে। কাছের হাটে ঠিক দাম দিয়ে কেনে। এখান থেকে দু কোশ দূর দিয়ে গিয়েছে বাদশাহী সড়ক। সেখানে যাত্রীদের উপর কোন হামলা করতে দেয় না। স্রেফ রাস্তা পাহারা দেয় বলে মানুষ পিছু এক পয়সা আদায় করে নেয়। তারা লুট করে অনেক দূরে। সে সবই অন্য জায়গার পাইকদের নামে যায়।

কুমর অর্জন সিং, তুমি বিশ বছরের হয়েছ। তোমার বাপের মত জোয়ান তুমি। গোঁফও তোমার বাপের মত। চোখ দুটোও তেমনি মোহনিয়া। রঙটা শ্যামলা হয়েছে সে তোমার মায়ের জন্যে। সাহসও তোমার খুব, বীরও তুমি বাপের মত। ভৈরবের সঙ্গে লাঠি ধরতে পার। আমার সঙ্গে তলোয়ার, তীরধনুকেও ওস্তাদ। সব থেকে তোমার হিম্মত সড়কিতে। গত দু বছরে দুটো বাঘ মেরেছ। একটা চিতা, একটা ডোরা। তুমি ডোরাকে এক সড়কিতে প্রায় এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করেছ। সাবাস! সাবাস! সাবাস! কিন্তু তুমি মাতাল হয়ে গেছ; বড় বেশি দারু খাও। দারু পেলে জলের মত ঢক ঢক করে খাও। নেশায় হুঁশ থাকে না। কখনও কখনও বেহেড হয়ে যাও। আর বড় রাগীদার। তোমার মা আমার বেটী। বেটী

বলে বলছি না, এখানকার সবাই বলে, তুমিও বলবে যে এ মেয়ে এ মা যেমন তেমন নয়—সাক্ষাৎ দেবী। খাঁটি রাজপুত রাজার রানী। তাকে আমি সুরতিয়াবাঈয়ের কাছে নাচ-গানা শিখিয়েছিলাম। সে এখন সেই তার কিষণজীর কাছে ভজন ছাড়া কোন গীত গায় না, কেশে সে তেল দেয় না। ব্রাহ্মণের বিধবার মত এক বেলা এক মুঠি খায়। বাঘের চামড়ায় শোয়। তার মুখে আজ বিশ বছরের মধ্যে, এক তুমি যখন ছোট ছিলে, যখন তুমি খলখল করে হাসতে তখন হাসি দেখেছি, আর হাসি দেখি নি। বেটীকে এখন দেখলে মনে হয় সে যেন মনে মনে কাঁদছে কাঁদছে কাঁদছে। তার আর বিরাম নেই। কেন? স্রেফ তোমার জন্যে। তুমি তার মনের মত হলে না অর্জুন সিং। তুমি লাঠি শিখলে, তলোয়ার শিখলে, সড়কি শিখলে, বীর হলে, কিন্তু রাজার ছেলের সহবৎ শিখলে না কেন?

তোমার মা আমার বেটী, নইলে তাকে প্রণাম করতাম। কেন জান? গোড়াতে আমি তোমাকে বলতাম কুমর অর্জুন। ভৈরবও বলত। তোমার মা বারণ করেছিল। বলেছিল, না বাপ, না। কখনও বলো না। বাচ্চা বয়স থেকে কুমর কুমর শুনে মগজ যদি খারাপ হয়ে যায় তবে বিপদ হবে। বাপ, তুমি সর্দার, তোমার নাতি—এতেই তো সবাই খাতির করবে। তাতেই হয়তো মগজ গরম হবে। তার উপর 'কুমর' বললে সে ওর পক্ষে বহুৎ খারাপ হবে। তা ছাড়া বাপ, ওকে যদি কুমর বল তবে ক্রমে ক্রমে একথাও তো বাইরে ছড়াবে। কে এখানকার অর্জুন সিং রাজার ছেলে কুমার সায়েব? তখন লোকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন্ রাজার ছেলে? কোথাকার কুমার? ছত্রিশ জাতিয়ার মধ্যে কুমার কি করে এল? কোথা থেকে এল? তখন? চন্দনগড়ের নাম যদি ছড়ায় তবে তো বিপদ হবে বাপ!

বুঝে দেখ অর্জুন, কত বুদ্ধি ধরে আমার বেটী। সে ঠিক বলেছিল। তা হলে তোমাকে বাঁচানো, এই জঙ্গলগড় তৈরি করা বিপদ হ'ত। আজ বিশ বছরের চন্দনগড়ে মাধব সিং-এর কথা লোকে ভুলে গেছে। জানে রুক্মিণীবাঈ কোথা মরে গেছে কি কোথায় চলে গেছে। আজ এখানকার লোকেরাও ঠিক জানে না। সে আমলের বুড়ো বুড়ী নাই। আমার বয়সী আছে ভৈরব আর গোবর্ধন, তাদের বউরা। তারাও চেপে আছে। অল্পস্বল্প মনে আছে সে আমলে বারো

থেকে বিশ তিরিশ বছরের যারা তাদের। কিন্তু সে অল্প। আমরা ওটার উপর জোর দিই নি বলে তারা আপনা-আপনি ভুলেছে। জোর দেয় না। কেউ মনে করিয়ে দিলে মনে পড়ে। তারা তোমাকে দলু সর্দারের নাতি, আমার পরের সর্দার বলেই জানে। তবে তোমারও গুণ আছে। তুমি বীর, তুমি খুব হাসতে পার, খুব দিলদরিয়া তুমি। খুব হৈ হৈ করতে পার, সব থেকে বড় গুণ সকলকে ভালবাস। আপন পর নাই। কিন্তু দোষ তোমার তা থেকেও অনেক বেশী। তুমি এমন মায়ের ছেলে, রাজা মাধব সিং-এর বেটা। খাঁটি ছত্রি হয়ে তুমি সহবৎ শিখলে না, ধীর হলে না। তোমার মা সুরতিয়াবাঈয়ের কাছে লেখা-পড়াও কিছু শিখেছিলে। তোমার মা তোমাকে লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিল, তুমি শিখলে না। তুমি মদ খাও। তুমি ওই ছত্রিশ জাতিয়াদের সঙ্গেও মদ খেয়ে হুল্লোড় কর। তাদের জোয়ানী বেটী-গুলোকে নিয়ে খেলা কর। পাইকদের বেটীদের সঙ্গে মেলামেশাও কর। কিন্তু পাইকদের বারণ করা আছে, তারা মেয়েগুলোকে শাসনে রাখে। কিন্তু ঝুমঝুমিকে নিয়ে তুমি মেতে আছ। তোমার মাকে পর্যন্ত মেনে নিতে হয়েছে তা। তবে ঝুমঝুমি তো ভাল মেয়ে।

ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড়ে এখানকার দেবীজির বারণ আছে জাত মানা। তবু অর্জুন সিং, তুমি কুমর, রাজা মাধব সিং-এর বেটা। তোমার একটা জাত আছে। জাত না মান, ইজ্জত আছে। ইজ্জত না থাকলে সব হওয়া যায় অর্জুন সিং—সে রাজা হয় না, কুমরও হয় না।

তবু ভাবছি অর্জুন সিং, তুমি যাই হও—মাতাল হও, মুরুখ হও, হাল্লাবাজ হও—এইবার তোমাকে সব বলে, ওই পাথরের বেদীর উপর কাঠের চৌকি পেতে তোমাকে বসিয়ে, তোমার হাতে তোমার বাপের তলোয়ারখানা দিয়ে বলব—এই নাও তোমার বাপের তলোয়ার। এই তোমাকে আমরা সবাই বললাম রাজা। তোমাকে বললাম সব বৃত্তান্ত। তোমার বিশ বছর বয়স হ'ল। এদিকে কিষণজীর খেলায় আবার লাগল গোলমাল। এবার তুমি যা হয় কর। মীর হবিব এই পথে আসবে শুনছি। চন্দনগড়ের সুচেত সিং-এর সঙ্গে তার দোস্তি টুটেছে। এবার দুশমন। এবার সে সুচেত সিং-এর দুশমন।

গতবার এই ক মাস আগে এই বৈশাখ মাসে একটা সুযোগ চলে গেছে। গতবার উড়িষ্যা দখল করে, মীর হবিব এই জঙ্গলের ধার

দিয়েই গিয়েছিল ; মেদিনীপুর দখল করে তাঁবু গেড়ে বসেছিল। চন্দন-গড়ের সুচেত সিং তখনও দোস্ত। চন্দনগড়ে খানাপিনা করে সেলামী নিয়ে তাকে খেলাত দিয়ে মেদিনীপুরে ছাউনি গেড়েছিল। কি সাবধানেই তখন রাখতে হয়েছিল তোমাকে এবং কি সাবধানেই ছিল ছত্রিশগড়ের তামাম পাইকেরা। তোমার তখন বেমার।
লোকে বাচ্চা ঘুম পাড়ায় অর্জুন সিং বর্গীর ছড়া বলে, "ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল, বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দোব কিসে।" ঠিক সেই রকম করেই ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড়ে পাইকরা ঘুমের ভান করে পড়েছিল। তবু তুমি দুরন্ত দুর্দান্ত, তোমার কয়েকটা দুরন্ত সঙ্গী নিয়ে বেরিয়ে পালিয়েছিলে। তখনও তোমার বেমার হয়নি। পথের ধারে জঙ্গলের উঁচু গাছে চড়ে বর্গীদের যাওয়া দেখতে গিয়েছিলে। তোমার মায়ের পুণ্যবল আর তোমার নসীব। তোমার একটা ফাঁড়া ছিল সেটাই তোমাকে বাঁচালে। ওই গাছে কিসে তোমাকে কামড়ালে, তার জ্বালাতে তুমি গাছ থেকে নেমে নদীর জলে পড়লে, হুঁশ হারালে। সঙ্গীরা তোমাকে নিয়ে এল, তখন সর্বাঙ্গ তোমার ফুলেছে। আর তোমার সঙ্গে ছিল ঝুমঝুমি। দু মাস ভুগে প্রাণে বাঁচলে। দলু সর্দারের বুদ্ধি আর ধরম যিনি তাঁর মহিমা, অর্জুন সিং। তোমাকে চিকিৎসা করে বাঁচালে ওই ছত্রিশ জাতিয়ারা। আর ওই মেয়েটা ঝুমঝুমি। ওদের যে সাপের ওস্তাদ সে-ই করলে চিকিৎসা। আর সেবা করেছে ছত্রিশ জাতিয়ার মেয়েটা ওই ঝুমঝুমি। তোমার পেয়ারী। সে ওই সাপের ওস্তাদেরই বেটী। ওই যে কালো নাগিনের মত ছিপছিপে লম্বা বেটীটা, যার চোখ দুটো লম্বা ছুরির মত, নাকটা একটু ছোট, মনে হয় সূচলো নাকের ডগাটাকে কনি দিয়ে কেউ একটু টিপে মেজে দিয়েছে। তাতে বাহার খুলেছে খুব। ঠোঁট দুটো পাতলা, কপালটা ছোট, চুল একরাশ, কিন্তু করকরে কোঁকড়ানো। হাসলে গালে টোল পড়ে ; কোমরখানা এতটুকু—যাকে নিয়ে তোমার পাগলামির শেষ নেই। নামটাও—ঝুমঝুমি। বহুৎ মিঠা। মেয়েটা ছেলেবেলা ভাল নাচত, চব্বিশ ঘণ্টাই প্রায় নাচত বলে দলু সর্দারই হাট থেকে গোটা দশেক ঘুঙুর এনে দিয়েছিল ; তাই গেঁথে পরে ঝুমঝুম্ করে নাচত। নামই হয়ে গিয়েছিল ঝুমঝুমি। হায় হায় হায়! তখন কি দলু জানত যে ওই কালুটে রোগা মেয়েটা বড় হয়ে এমন হবে

যে অর্জুন সিং-এর মন ভুলাবে। এমন খুবসুরতি হবে। এমন দুরন্ত হবে যে অর্জুনের সঙ্গে পাল্লা দেবে। তুমি বন্শী বাজাও ভাল, ছোকরী নাচে ভাল। বনের ভিতর গিয়ে তুমি বন্শী বাজাও আর মেয়েটা বেহায়ার মত নাচে তা দলু শুনেছে। তুমি শিকারে যাও, ও গাঁওয়ের ধারে বসে থাকে, গাছে চড়ে, কখনও ফিরবে কোন পথে ফিরবে তার জন্যে।

ভাইয়া, তোমাকে চুপি চুপি বলতে পারি, দলু মনে মনে তোমার তারিফ করে। রুচির তারিফ করে। দলু যদি জোওয়ান হ'ত তোমার মত তবে তোমার সঙ্গে ওই ছোকরীর মালিকানা নিয়ে লড়াই হয়ে যেত। জোয়ানী বয়স তোমার—এ হবে। কিন্তু তোমার মায়ের যে মুখ ভার। আর বাড়াবাড়িটা বড় বেশি করছ। দলু সর্দার খানিকটা তামাক খরসান ঠোঁটে টিপে নিয়ে পিচ ফেলে ভাল করে নড়েচড়ে বসল। ভীম বাগ্দীর ছেলে গণ্ডারের আনা বালেশ্বরের খবর শুনে সে গণ্ডারকে পাঠিয়েছে রুক্মিণীকে খবর দিতে। রুক্মিণী সকালে স্নান করে কিষণজীর সেবায় লাগে। তাকে শয়ান থেকে ওঠানো, মুখ ধোওয়ানো, বেশ করানো, বাল্যভোগ দেওয়া, কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি করা। অনেক কাজ তার। অহল্যা বুড়ী হয়েছে, সে তাকে সাহায্য করে। অম্বিকে নেই, সে মরেছে। বাগ্দীদের দুই বিধবা আছে, দুই কুমারী আছে, তারা কিষণজীর মন্দির উঠান ঝাঁট দেয়। তাদের নিয়েই দিন কাটে রুক্মিণীর। ছেলের নাম বড় করে না। বলে—ভাগ্য! আমি কি করব!

ফুরসত তার কম, খুব কম। তাই গণ্ডারকে বলেছি দাঁড়িয়ে থাকবি, ফুরসত পেলেই বলবি, বহুৎ জরুরী কাম, তোমার বাপ বসে আছে। কথা না হলেই নয়। এবং এসে তাকে খবর দেবে। সে যাবে রুক্মিণীর কাছে।

পাঁচ

খরসান ঠোঁটে টিপেও বেশ জমল না দলুর। সে ডাকলে, ঝুমরী! ঝুমরী আজও আছে। বুড়ী হয়েছে। সে-ই তার সেবা করে। সে বেরিয়ে এল। ঝুমরীর পরনে এখন মোটা তাঁতের শাড়ি। আঁচলটা খুব বাহারে। হাতে মোটা কাঁসার কাঁকনী। গলায় মোটা পুঁতির মালা, রূপদস্তার হার। হাজার হলেও সে সর্দারের দাসী।

—কি ?

—মদ দে।

ঝুমরী বিনা বাক্যব্যয়ে মদ এনে দিল। একটা ঠোঙায় এনে দিল খানিকটা ময়ূরের মাংস।

খেয়ে সে বসে আপন মনেই ঘাড় নাড়তে লাগল। অর্থাৎ নিজের মনের সঙ্গেই কথা বলছিল।

ঝুমরী বললে, উ কি হছেক ? অঁ ?

—কি হছেক ?

—আপন মনে ঘাড় লাড়ছ ?

—ঘাড় লাড়ছি, ভাবছি তুকে কাটব ওই মায়ের থানে।

—ক্যানে, বুড়া বয়সে ছুকরীর শখ হয়েছে নাকি ? বুড়ীকে কেট্যা পথ সাফ করবে ?

—হুঁ। তুর মাথা।

—কি করবেক ? খাবেক ?

—তুর বুড়া মাথা খেয়ে কি হবেক ? কি সুখ মিলবেক ? তার চেয়ে ওই ঝুমঝুমির মাথাটা এনে দিতে পারিস ?

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ঝুমরী। ঝুমঝুমির সঙ্গে অর্জুনের ভালবাসার কথা ছত্রিশ জাতিয়ার জঙ্গলে মানুষ জানে, জন্তু জানে, পাখিরা জানে, গাছেরাও জানে। বুড়ো দলু তার দাদো। কিন্তু এখানে এই মুল্লুকে তো এসব ব্যাপারে দাদো নাই নাতি নাই, দাদা নাই ভাই নাই। হয়তো বাপ বেটাও নাই। ঝুমরী দলুর জন্যে সব পারে। কিন্তু এ যে নাতি —যে-সে নয়। এ যে অর্জুন। ঝুমঝুমি যেমন সবার মনে দোলা দেয়, অর্জুন তেমনি—না, তার চেয়েও বেশি দোলা দেয় সবার বুকে। আর সে তো যে-সে নয়—সে অর্জুন। ঝুমঝুমির মাথা যে খাবে তার কলিজা সে ছিঁড়ে নিয়ে চটকাবে, খাবে।

হঠাৎ দলু বললে, শোন। ইখানে আয়।

ভয়ে ভয়ে সে এগিয়ে এসে বললে, কি ?

—মেয়েটাকে—

গলা শুকিয়ে যাচ্ছে দলুর। ঝুমরীও কাঠ হয়ে গেছে। তবুও দলু বললে ফিস ফিস করে, মেরে ফেলতে পারিস ?

ঝুমরীর মুখটা শুধু হাঁ হয়ে গেল।

দলু বললে, ওরে, অর্জুনের নেশা না ছুটলে যে চলবে না রে !

ঝুমরী বললে, একটা কথা বলব, রাগ করবে নাই তুমি ?

—না।

—তা হলে তুমার অর্জুন বাঁচবেক নাই। আর তার আগে তুমাকে আমাকে মেরে ফেলায়ে বুকে চড়ে নাচবেক। তারপরে নিজে মরবেক।

—হুঁ। তা সত্যি। ঘাড় নাড়লে দলু।

—তবে ? [illegible] নেশা ছুটায়ে বা কি হবেক ? তুটিতে উরা কেমন নেচে গেয়ে বেড়ায় [illegible] দ্যাকন

— [illegible] ভেবে দেখ [illegible] তুকে আজ রেতে সব বলব। সব [illegible]

গণ্ডার এসে দাঁড়াল—সর্দার—

—হয়েছে রুক্মিণীর ?

—হাঁ, তুমার তরে বসে রইছে।

—চল্ ঝুমরী।

—আঁ !

—মুখটা হাঁ করবি তো জিভটো ধরে টেনে ছিঁড়ে লিব। বুঝলি ?

—বুঝলাম, মুখ আমার হাঁ হবেক নাই।

—আচ্ছা।

রুক্মিণী বসে ছিল তার অপেক্ষায় : দলুর জন্যে একটা কাঠের পিঁড়ি পেতে রেখেছিল। পাইকদের ঘরে পিঁড়ি আছে। তবে ব্যবহার নেই। রুক্মিণী রানী ছিল, সে বাপকে পিঁড়ি পেতে দিয়েছিল। সে পিঁড়ি ব্যবহার করত। রুক্মিণী বললে, বস বাপ, জরুরী খবর কিছু নাকি ? তোমার গণ্ডারের যে তাগিদ ! গণ্ডারের মত ঠায় দাঁড়িয়ে, নড়ে নি।

গণ্ডারের দেহের আকারের জন্য আর ধৈর্যের জন্য নাম গণ্ডার। আসল নামটা হারিয়ে গেছে।

রুক্মিণী একটু হাসলে, কিন্তু দলু হাসলে না। বললে, হ্যাঁ মা, খবর জরুরী আর জোর। জবর বল জবরও বটেক।

—কি ?

গণ্ডারকে বললে দলু, বোল্ রে—তুহি বোল্।

গণ্ডার স্বল্পভাষী। সে বললে, বর্গীরা বালেশ্বরে ফের জমছে।

—সব বোল না রে উজবুক।

—তুমি বল।

—আমি বলব? সে রুক্মিণীর দিকে তাকিয়ে বললে, চার মাহিনা হয় নাই নবাব আলিবর্দী বর্গীদের কটক ছাড়া করে দিলেক, সে জান। বদমাশ বর্গী আর মীর হবিব যখন মেদনীপুরে ছাউনি ফেলে তখন সুচেত সিং অনেক টাকা দিয়েছিল, তাও জান। কিন্তু বর্গীরা যখন নবাবের ভয়ে পালায়, নবাব যখন মেদিনীপুরের ওপারে এসেছে—কাঁসাই পার হচ্ছে, তখন সুচেত দেখলেক বিপদ। নবাব তাকে পাকড়াবে বর্গীর দোস্ত বলে, আর তার সঙ্গে জুটল লুটের লোভ। বর্গী যখন চন্দনগড় পাশে রেখে পালাইছে তখন সুচেত সিং বর্গীর পিছন দিকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লুটে নিলেক। শুনেছি, রসদ আর খানার অনেক কিছু পেয়েছিল।

রুক্মিণী বললে, সেও আমি জানি বাপ। তখন অর্জুন রোগে প'ড়ে। আমি কিষণজীর দোরে ধর্না দিয়েছি তবু এসব আমার কানে এসেছিল।

—মা! আমি তোমাকে তো এসব শোনাই না। কেন না তুমি দুখ পাবে। দুখ পাবে অর্জুনের লেগে। আমারই কি কম দুখ হয়েছিল মা! তখন একটা কত্ত বড় সুবিস্তা মিলেছিল। অঃ! সেদিন যদি অর্জুনকে নিয়ে দলবল জুটে ওই শিয়ালের মত ছুটে পালানো ওদের পথ রুখে ওই নেকড়ে ওই মীর হবিবটার গর্দান নিয়ে মুণ্ডুটা বর্শায় গেঁথে নবাব আলিবর্দীর কাছে হাজির হতে পারতাম আর তোমাকে সঙ্গে নিয়ে নবাবকে দেখিয়ে তোমার দুখ শুনাতাম, তা হলে সব শোধবোধ হয়ে যেত মা। নবাব আলিবর্দী যেমুন বীর তেমুনি আদমী সাচ্চা। ঔরতের লালস্ নাই। জীবনভোর এক বেগম; তার তিন বেটী। বেটীর দরদ সে বুঝত মা। তুমি যদি বলতে সুচেত সিং-এর বেইমানির কথা, দুমুখো সাপের কামের কথা, তাহলে ঠিক বিশ্বাস করত নবাব।

রুক্মিণী অতি বিষণ্ণ করুণ হেসে, নিজ কপালে হাত দিয়ে বললে, আমার ললাট!

—হাঁ মা, ললাট। তা কি বলব!

—বল বাপ, আজ কি বলছ বল।

—বলছি মা। সবটা সমঝে নিতে হবে মা। তাই বলছি, নবাব কটক পর্যন্ত গিয়ে দখল করলে কটক, সে জান।

—হাঁ বাপ।

—মীর হবিব কটক পার হয়ে যে জঙ্গল সেই জঙ্গল পার হয়ে হটল। কেল্লাতে রেখে গিয়েছিল সৈয়দ নূর, ধরম দাস আর সরন্দাজ খাঁকে। তারা যখন কেল্লা নবাবের হাতে দেয় তখন নবাবের সঙ্গে তকরার করেছিল। সরন্দাজ খাঁ পাঠান। নবাব সঙ্গে সঙ্গে তার গর্দান নিয়েছিল। সুচেত সিং নিয়েছিল তার গর্দান, সে ছিল নবাবের কাছেই।

—বকশিশ খেলাত মিলে থাকবে সুচেত সিং-এর। হাসলে রুক্মিণী। অথচ শুনেছি পাঠান সর্দারের সঙ্গে সুচেত সিং-এর বহুৎ দহরম-মহরম ছিল।

—হাঁ মা, তা ছিল। আবার রাগও ছিল ভিতরে ভিতরে। সরন্দাজ খাঁ সুচেত সিং-এর মুর্শিদাবাদ থেকে আনা এক বাঈকে চেয়েছিল। নিয়েও গিয়েছিল।

—এ খবর নতুন বাপ, জানতাম না।

—হাঁ। এখন নবাব এক কোথাকার কে আবদুস শোভানকে ফটকের নাজিম করে ফিরল মুর্শিদাবাদ: মীর হবিব নেকড়েও সঙ্গে সঙ্গে ফিরল—আর শোভানকে হারিয়ে কটক দখল করলে। বেওকুফ বদমাশ শোভান বনে এখন ডাকাইতি করছে তা জান। মুর্শিদাবাদ যেতে পারছে না নবাবের ভয়ে।

—হাঁ। এ খবর জানি।

—তবে তো তুমি সবই জান মা।

—সব জানি বাপ। কিন্তু কি করব জেনে? ওই মাতাল বুদ্ধিহীন একটা ছত্রিশ জাতিয়ার মেয়ে নিয়ে পাগল ছেলে, তাকে যে বলতে সরম লাগে আমার—তুই রাজার বেটা। তোর বাপকে এমন করে কেটেছে, তুই শোধ নিয়ে আয়। উল্টো ফল হবে বাপ। হয়তো এমন কথা বলবে যা শুনে আমার তখুনি মরা ছাড়া পথ থাকবে না। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল তার বুক থেকে।

—কেন মা? কি বলেছে অর্জুন?

একটু চুপ করে রুক্মিণী বললে, একদিন ওকে ডেকে বললাম, তুই এমন করে মদ খাস, ওই ঝুমঝুমিকে নিয়ে বনে বনে ঘুরিস, তুই সর্দারের নাতি, তোর সরম হয় না? সে বললে, তা কেন হবেক? উতে দোষটা কি? বড় হয়েছি—মদ খাব, ছুকরী নিয়ে আমোদ করব তো কিসের সরম? সবাই তো করে। দাদো মদ খায়। দাদোর ঘরে ঝুমরী আছে।

দলু মাথা হেঁট করে বললে, হাঁ বেটী, তা তো উ বলতে পারে।

রুক্মিণী বললে, এখনও শোন বাপ, কথা তো শেষ হয় নাই আমার। তুই যা রে গণ্ডার এখান থেকে। তখন আমি বললাম, তোর দাদো সর্দার। তার বেশি তো নয়। তুই যদি তার বেশি হ'স? সে হেসে বললে, কি? রাজার বেটা? হুঁ—শুনেছি – তোমরা গুজগুজ করে বল। তা রাজার দাসীর বেটা কি রাজপুত্তুর হয়? নবাবদের বাঁদী থাকে, রাজাদের দাসী থাকে—এমন বেটাও কত থাকে।

দলুর সারা শরীর শক্ত হয়ে উঠল। সে হিংস্রভাবে বললে—মা!

রুক্মিণী বললে, কার উপর রাগ করছ বাবা, একটা জানোয়ার জন্মেছে আমার পেটে। আমি বললাম, বস্ তুই, সব শোন্ তাহলে; কিন্তু জন্তুটা বললে, কি শুনব? শুনে কি করব? বাবা মরে গিয়েছে, তোকে ফেলে দিয়ে গিয়েছে রাস্তায়। আমি পথে হয়েছি গাছতলায়; আমি সব জানি। কি শুনব? আমি চললাম, ঝুমঝুমি বলে আমার লেগে বসে আছে। আমি রাগ করে বললাম, তোর ঝুমঝুমিকে আমি বাবাকে বলে কেটে ফেলব। সে বাপ এক লহমায় যে কি হয়ে গেল তোমাকে কি বলব, দাঁতে দাঁত টিপে বললে, কি বললি? তা হলে—। আমি ভয় পাই নি বাপ। আমার মাথায় খুন চেপেছিল। সামনে গিয়ে বললাম, কি করবি তা হলে? নে—মার্ আমাকে। মার্। মেরে ফেল। কি বলব বাপ—আঁ-আঁ চিৎকার করে সে ওই শালগাছটার মোটা ডালটাকে টেনে মড়মড় করে ভেঙে আছড়ে ফেলে বললে, এই লে। আমি অবাক হলাম বাপ। এ যে দানো একটা। রাগও হ'ল। বললাম, ওরে, তুই তবে মর, তুই মর, তুই মরলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব। বলেই আমি কিষণজীর পায়ে পড়ে বললাম, বল কি করব? বল? পড়েই ছিলাম। কিছুক্ষণ পর ঝুমঝুমি এসে ডাকলে, মা গো, মায়ী! আমি জবাব দিই নি। সে কাঁদতে কাঁদতে বললে, ওগো মায়ী, তুমার পায়ে পড়ি গো, শীগ্রি এস গো। দেখ গো তুমার অর্জুন কি করছেক গো। আর আমি থাকতে পারলাম না বাপ। বেরিয়ে এলাম। দেখলাম ঝুমঝুমির দুই চোখে জলের ধারা বইছে। বললাম, কি হ'ল? সে বললে, দেখগে মায়ী সে কি করছে। এস! গেলাম তার সাথে, গিয়ে দেখলাম বনের ভিতর ধুলোয় পড়ে কাঁদছে,

মধ্যে মধ্যে বুক চাপড়াচ্ছে আর বলছে, মরে যাই আমি মরে যাই ঠাকুর, আমাকে মার, আমাকে তুমি মার। মা বলছে—মর্ মর্। অনেক বুঝিয়ে উঠিয়ে নিয়ে এলাম। মনে মনে ঠিক করেছি বাপ এবার তোমাদের নিয়ে আমিই লড়াই করব দুশমনের সঙ্গে। মরব লড়াইয়ে। ও থাকবে এইখানে। আর যারা থাকতে চায় থাকবে এই ছত্রিশ জাতিয়াদের সঙ্গে জাত হারিয়ে জন্ম হারিয়ে কুল হারিয়ে বংশপরিচয় হারিয়ে।

দলু মাথা হেঁট করে রইল। কি বলবে ভেবে পেল না।

রুক্মিণী বললে, আমাকে রানী করে তোমরা লড়তে পারবে না বাপ?

—খুব পারব মা। খুব পারব। সেই ভাল হবে মা. সেই ভাল হবে।

—তা হলে তাই হবে। তুমি ডাক সকল পাইক মাতব্বরকে।

—ডাকব মা, আজই ডাকব।

—আজ নয় বাপ, আর পাঁচটা দিন সবুর কর। পাঁচদিন পর সেই তারিখ হবে বাপ—যে তারিখে আমার রাজাকে দুশমনেরা কেটেছিল।

—ঠিক আছে মা, তাই হবে। তবে আমি সব তৈয়ার রাখতে বলি। কি বল?

—তা বল। কিন্তু গণ্ডার যে বললে খবর এনেছে, জরুরী জবর খবর। এ পর্যন্ত যা বললে তা তো পুরনো।

—হাঁ হাঁ হাঁ। তুমি আমার বেটী কিন্তু তুমি সত্যিই রানীর বুদ্ধি ধর। এমন বালেশ্বরে মীর হবিব আবার এসে হাজির হয়েছে। নবাব মুর্শিদাবাদে। বুড়ো হয়েছে নবাব। তিয়াত্তর বছর বয়স হয়ে গেল। সেখানে গিয়ে বেমারীতে পড়েছে। উঠেছে, তবে খুব কাহিল। মীর হবিব এ মওকা ছাড়ে নি, একদম হাজির হয়েছে বালেশ্বরে। বর্গীপল্টন নিয়ে এসেছে মোহন সিং। আর এসেছে মুস্তাফা খাঁ. পাঠানের ছেলে মূর্তাজা খাঁ। সরন্দাজ খাঁর ছেলে এসেছে। তারা এবার সব থেকে আগে পড়বে চন্দনগড়ের উপর। এর চেয়ে বড় মওকা আর কি হবে বেটী?

রুক্মিণীর চোখ জ্বলে উঠল। বললে, ঠিক আছে বাপ, সব তুমি তৈয়ার কর। বল, বর্গী আসছে ফের। আমাদের তৈয়ার হতে হবে। শুধু বলবে না যে আমি তোমাদের সঙ্গে যাব রানী হয়ে। কথাটা বাইরে বেরুলে বিপদ হবে।

দলু বেরিয়ে এল। গণ্ডার অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার অপেক্ষায়। পথে অহল্যার সঙ্গে দেখা হ'ল। অহল্যা আপন মনে বকতে বকতে আসছে উদিক থেকে। 'মা ছেলে বলে দেখবেক নাই। দাদো কিছু বলবেক নাই। এত বড় ছেল্যা হ'ল, ঝুমঝুমি মেয়েটাকে নজরে লেগেছে তার, নিয়ে নিয়ে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াইছে। তাই তাকে রাখনী করে রেখে দে ঘরে। ছেল্যাটা ঘরে থাকুক—তা না ; ই এক আচ্ছা কাণ্ড বটেক !'

দলু চিন্তিত মনেই চলেছিল। অহল্যা তাকে দেখে বললে, ছোঁড়াটা চলে গেল।

—চলে গেল ? ছোঁড়াটা ? কে ? অর্জুন ?

—তা না তো কে ? কার এত বুকের পাটা হবেক বল্ ? আপন খুশিতে কাম করবে ?

—কোথাকে গেল ?

—ওই গেল সেই শঙ্করীপুর। কাল মহাষ্টমীতে মেলাই পাঁঠা কাটবেক, তার পরেতে বীরাষ্টমীতে সব খেল হবে—লাঠি, কুস্তি। ওই, ওই তো রয়েছে তোমার সঙ্গে তার এক চেলা। ওই যে শালা গণ্ডারে। উ যে কুস্তি লড়বেক। উও তো যাবেক। বলেছে, তোমরা এগোও, আমি যেছি। সদ্দারকে খবরটা দিয়েই আমি ছুটব। পঁচিশ-তিরিশটা ছোঁড়া গেল তার সাঁতে, আর সেই ঝুমঝুমিকে নিয়ে সাত-আটটা ছুঁড়ি।

—কখন গেল ?

—তা যমদুয়ার পারাইলো। পথে পড়েছে এতক্ষণ।

দলু বললে, এই গণ্ডারে !

—আঁ !

—তু বললি নাই আমাকে ? হারামজাদা ?

—অর্জুন সদ্দার যে বললেক, কাউকে বলতে হবে নাই। আমার সাঁতে যাবি, ডরকা কিসের ? সি ফিরে এসে বলব, যা বলবার আমি বলব। বললে পরে সাত ফেচাঙ তুলবেক।

—ওরে শালা, ছোট্। ছোট্ বলছি। গিয়ে ফিরায়ে লিয়ে আয়। বলবি, সদ্দারের হুকুম যে তাকে আর ঢুকতে দিব নাই ছত্রিশ জাতিয়ার গড়ে। সে অর্জুনকেও না। যা শালা, যা।

গণ্ডার ছুটল সঙ্গে সঙ্গে।

অহল্যা বললে, তা যাক ক্যানে গিয়েছে। পূজো বলে কথা, তার ওপর ছেলে-ছোকরা বয়েস—

—অহল্যা, অহল্যা, তোর মুখটা ভেঙে দোব। চুপ করবি?

বলেই দলু হন হন করে গিয়ে তাদের সেই বড় নাকাড়াতে ঘা মারতে লাগল। ডুম—ডুম—ডুম ডুম ডুম ডুম।

সারা বারো পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিটা প্রতিহত হয়ে একটা ধ্বনি বারোটা হয়ে বেজে উঠল।

প্রতিটি পাইক বাড়ি থেকে মেয়েরা উঠোনে নেমে তাকালে এই দিকে। পাইকরা যে যা করছিল, ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়ল।

ভৈরব হন হন করে সর্বাগ্রে ছুটে এসে দলুর কাছে দাঁড়াল।

—সর্দার!

—ভৈরব, তু যারে, তু যা। গণ্ডারের কথা তো সি মানবেক নাই, তু যা। ফিরায়ে আন্ ঘাড়ে ধরে, তাকে ফিরায়ে আন্। সি দত্যিটা গেল শঙ্করীপুরে অষ্টুমীর রাতে খেল জিততে। তু যা, শঙ্করীপুরের জমিদার এখন চন্দনগড়ের তাঁবে। সেখানে চন্দনগড়ের মরদরা আছে। তু যা।

—কি বাপ? গোলমাল নাকাড়া শুনে বেরিয়ে এসেছিল রুক্মিণী। সে জিজ্ঞাসা করলে, কি বাপ?

—অর্জুন। মা, অর্জুন চলে গেল শঙ্করীপুর অষ্টুমীর রাতের খেল জিততে।

রুক্মিণী বললে, যাক বাবা, যাক। তার অদৃষ্ট তাকে যেখানে নিয়ে যায় যাক। তার অদৃষ্টে যা থাকে থাক। সে যাক! তোমাকে যা বললাম তুমি তাই কর। সব সাজতে বল। না হয়—আমি এবার চিতা জ্বালিয়ে তার উপর চড়ে বসব। চলে যাব আমার রাজার কাছে। তার চোখ দুটো যেন জ্বলছিল।

ছয়

প্রতিবাদ করতে সাহস করলে না, শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে গেল দলু সর্দার। সেই ভাল। সেই ভাল। অর্জুন সিং, কুমর সাহেব, তোমার নসীব তোমার হাতে। আপসোস! এমন মাতাজীকে তুমি চিনলে না। নিজের পরিচয় তুমি জানলে না। তোমার নসীব—আর

কিষণজীর খেল। তাঁর ইচ্ছা—তাঁর ইচ্ছা যেদিন হবে—সেদিন তুমি জানবে নিজেকে। কিন্তু তাঁর জন্যে দলু সর্দার আর অপেক্ষা করবে না। করবার তার উপায় নেই। মাতাজী তার বেটী রুক্মিণী—রানী মাতাজীর হুকুম হয়ে গিয়েছে। তার থমথমে মুখ দেখে ভয় করছে দলুর।

* * *

এতকাল পরে, অর্জুনকে না নিয়েই লড়াইয়ের উদ্যোগ করতে দলুর মনে হচ্ছে অর্জুনের কথা। রাজা মাধব সিং-এর ছেলে। সে হয়ে গেল মূর্খ, গোঁয়ার, বুদ্ধিহীন। হায় রে হায়!

দলু বেশ জানে—গণ্ডার গিয়েও অর্জুনকে ফেরাতে পারবে না। সে ফিরবে না, ফিরবার ছেলে সে নয়।

সে কারুর হুকুমে আমোদ ছেড়ে ফিরবে না। বাল্যকাল থেকে সে সবল স্বাস্থ্যবান। একবার তার ওই জ্বর আমাশয় হয়েছিল। দলুর উদ্বেগের সীমা ছিল না। রুক্মিণী মাথার শিয়রে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। দলু ওষুধ দিয়েছিল, মাত্রা ছাড়িয়ে বেশিই দিয়েছিল। অসুখ সারতে দেরি হয় নি। কিন্তু তখন থেকেই তার মেজাজের উগ্রতা বেড়ে প্রায় তাকে পাগলই করে তুলেছিল। তার উপর দলুরই সমাদর। সমাদরের সীমা-পরিসীমা ছিল না। দলু মদ খেত, সেও বলত আমি খাব। দলু তাই দিত। পনর-ষোল বছর থেকে সে মাতাল। পাখি শিকার করত বাল্যকালে। চোদ্দ বছর বয়সে হরিণ মেরেছে, বরা মেরেছে। ষোল বছরে প্রথম মারে চিতা বাঘ। তারপর ডোরা বাঘ মেরেছে। বনে বনে উল্লাস এবং দুর্দান্তপনা করে বেড়িয়েছে ইচ্ছামত। তার নিজের দল একটা গড়ে নিয়েছে সে। গড়তে হয় নি, আপনি গড়েছে। গণ্ডারের বয়স প্রায় তিরিশ। ওদিকে তিরিশ, নিচের দিকে ষোল পর্যন্ত নিয়ে পঁচিশ জোয়ানের এক দল। সে জোয়ানেরা শহরের ষণ্ডা জোয়ান নয়, গ্রামের নওজোয়ান নয়, বনের বুনো জোয়ান। সকলেরই প্রায় এক-একটি তরুণী প্রিয়া আছে। তাদের মধ্যে ছত্রিশ জাতিয়াদের বেটী আছে, পাইকদের লুঠ করে আনা নানান শ্রেণীর মেয়েদের গর্ভজাত মেয়েরা। পাইকদের নিজেদের মেয়েরা বন্যা হলেও বন্ধন আছে। নিয়মকানুন আছে। কড়া কানুন। কঠিন শাস্তি হয়। পুরুষেরা নিজেরা যা করুক, মেয়ের অনাচার সহ্য করে না। বুনো মানুষ, লুণ্ঠক; ডাকাত বললে ডাকাতও বটে। আসল পেশা পাইকগিরি অর্থাৎ

যুদ্ধবাজী। তারা নির্মম প্রহার করে অনাচারের ক্ষেত্রে। আঙুল দিয়ে দেখায় রুক্মিণীকে। বলে, দেখ্। রুক্মিণীকে মেয়েরা সত্যিই ভক্তি করে। শ্রদ্ধা করে। তবে গোপন অনাচার সব সমাজেই আছে, তা গোপনেই চলে। পুরুষদের এই সব লুটে আনা মেয়েদের ও ছত্রিশ জাতিয়াদের মেয়েদের সঙ্গে উল্লাস রঙ্গরস প্রেম ব্যভিচার নিয়ে বাদপ্রতিবাদ করে না। দেশে ছত্রি রাজা থেকে বড় জোতদার, তালুকদার, সর্দার—ব্রাহ্মণ কায়স্থ থেকে সব শ্রেণী ও সমাজের মধ্যেই ওটার রেওয়াজ রয়েছে। লোকে কুকুর বিড়াল পোষে, ঘোড়া রাখে একটার জায়গায় দুটো তিনটে, বাজপাখি পোষে, ময়না পোষে; এও তাই প্রায়; সুতরাং তরুণ অর্জুনের দলের ছোকরা ও জোয়ানদের তরুণী প্রিয়া প্রকাশ্যেই ছিল। কিছুদিন পর ঘরেই নিয়ে আসবে। আবার বিয়েও করবে। এ মেয়েটাও প্রতিবাদ করবে না, পালাবে না; সমান হাসবে, ঘরের কাজকর্ম করবে; বাড়ির বউকে খাতিরও করবে, আবার কখনও তার সঙ্গে কলহও করবে। কিন্তু প্রথম প্রথম এরা শুধু লীলাসঙ্গিনী। কৈশোর থেকে খেলা করতে করতে যৌবন শুরু হলেই জোড় বেঁধে বনে পালায়। নাচে, গায়, গল্প করে, গাছের উপর চড়ে—এ ওকে ধরতে যায়, ও তাকে ধরতে যায়। মধুর চাক ভেঙে খায়। মদ খায়। খরগোশ পাখি শিকার করে পুড়িয়ে খায়। সারা দিনই হয়তো কেটে যায়। সন্ধ্যাতে ফেরে। কোথাও মেলাখেলা হলে তখন জোড় বেঁধে যায়। পাঁচটি দশটি জোড়ে দল বাঁধে। একসঙ্গে মেলা দেখে; প্রিয়ার মনের মত পুঁতির মালা, পায়ের ঘুঙুর, কাঁসার কাকনী, রূপদস্তার চুড়ি, রঙীন গামছা কিনে দেয়। অর্জুনের মত তাদের শাড়ি কিনে দেবার ক্ষমতা নেই। অর্জুন ঝুমঝুমিকে দুবার দুখানা শাড়ি কিনে দিয়েছে। তাঁতের মোটা শাড়ি। শুধু শাড়ি নয়, শাড়ির সঙ্গে উপরের অঙ্গে পরবার আঁচলা পর্যন্ত। ঝুমঝুমি কপালে একটা রূপোর টিকলি পরে। তার কপালটি ছোট, কালো কপালের উপর সাদা রূপোর চাঁদ ঝিক্‌মিক্ করে। অর্জুনের সঙ্গে কার সঙ্গ? সে দলু সর্দারের নাতি; ছোট সর্দার, হবু সর্দার। দলুর কাছে সে টাকা আদায় করে, তার অহল্যা দিদি দেয়। তা ছাড়া সে ধার করে। ভৈরব গোবর্ধন স্বরূপ ভূপাল চার সর্দার দলু সর্দারের পরেই, তারাও তাকে ধার দেয়। অর্জুন অবশ্য শোধ করে, দাদোর কাছে নিয়ে দেয়। তার নিজের রোজগারও আছে। সে মধুর চাক এনে মধু জমা করে, ময়ূর মেরে পালক পেখম সংগ্রহ করে, সজারুর কাঁটা জড়ো করে। তারপর

দেয় ছত্রিশ জাতিয়াদের, তারা হাটে নিয়ে গিয়ে বেচে এনে টাকা দেয়। তারা নেয় সিকি, অর্জুন নেয় বারো আনা। অন্য সকলেও এসব করে। কিন্তু বনের যে এলাকাটা অর্জুনের সেটাই সবার চেয়ে বড়। তাকে সর্দারি মাসুল দিতে হয় না। অন্যদের নিজের বন নেই। রাজার বনে তারা এ সব সংগ্রহ করে, তার সিকি দিয়ে আসতে হয় সর্দারকে। অর্জুনের নিজের এলাকা আছে, তার থেকেও সর্দারের সিকি দেবার নিয়মও বটে, কিন্তু অর্জুন সে দেয় না। প্রথম প্রথম দিয়ে একদিন বলেছিল, নেহি দেঙ্গা।

দলু বলেছিল, কি বিপদ! সর্দারি তো আমার নয় হে কত্তা। ই তো সরকারী তবিল। আমি নাড়িচাড়ি, এর সিকি আমার, কিন্তু বারো আনার মালিক তোমার মা।

অর্জুন বলেছিল, সে সব আমি নাহি জান্‌তা হ্যায়। নেহি মানতা হ্যায়। দাদোও জানি না, মাও জানি না, সদ্দারিও জানি না। নেহি দেঙ্গা। জোর করেঙ্গা তো এসো কার জোর বেশি দেখি।

মা বলেছিল, আমার হুকুমে সকলে মিলে তোকে ধরেবেঁধে সাজা দেবে।

—তাহলে হামি চলে যাঙ্গা। নেহি থাকেঙ্গা এখানে। চলে যাঙ্গা ঝুমঝুমিকে নিয়ে।

দলু হেসে বলেছিল, আচ্ছা আচ্ছা। তু যদি আমার সঙ্গে পাঞ্জাতে জিততে পারিস তবে তোকে লাগবে না। আয়। কার জোর বেশি দেখি বললি তু, তা দেখি আয়।

—এসো।

তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়েছিল সে। কিন্তু অর্জুনের মা লড়তে দেয় নি। রুক্মিণী বলেছিল, না। এমন জোরে বলেছিল যে দলু এবং অর্জুন দুজনেই চমকে উঠেছিল।

দলু বলেছিল, মা!

রুক্মিণী বলেছিল, না।

অর্জুন বলেছিল, তবে হাম চলে যাঙ্গা। আমার টাকা চাই। ঝুমঝুমিকে কাপড় দোব গয়না দোব। দাদোর কাছে কত হাত পাতব? নেহি পারেঙ্গা। আমি মরদ। আমার সরম নাই!

দলু বলেছিল, আমি দোব।

—নেহি। নেহি লেঙ্গা।

অহল্যা বলেছিল, ওরে ধর্মের ষাঁড়, আমি দোব।

—না। না। না।

—ওরে, আমার ভাল ভাল শাড়ি আছে—

—পুরনো ঝুটা এঁটো। নেহি মাংতা। হাম কিনে দেঙ্গা।

রুক্মিণী বলেছিল, বাপ, আমার হুকুম, ওই বদমাশ বেতমিজকে ধরে এই গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে দাও।

—অ্যা-ও। বলে জন্তুর মত চিৎকার করে উঠেছিল অর্জুন। একগাছা লাঠি ধরে সে লড়াইয়ের জন্য তৈয়ার হয়ে খাড়া হয়ে গিয়েছিল।

মা চিৎকার করেছিল, আমার হুকুম কি তামিল হবে না বাপ!

সেই মুহূর্তে ঘটেছিল একটি বিচিত্র ঘটনা। ঝুমঝুমি দাঁড়িয়েছিল গাছের আড়ালে। ছিপছিপে পাতলা কালো মেয়ে। পরনে হাঁটু পর্যন্ত খাটো গামছার মত একখানা কাপড়, বুকে একখানা রঙীন গামছা, হাতে শাঁখার চুড়ি দুগাছা কালো নিটল হাতে ঝলমল করছিল। মাথায় একরাশ করকরে কোঁকড়া চুল একফালি ন্যাকড়া দিয়ে একটা খোঁপার মত বাঁধা। নাকে একটা রূপদস্তার কাঠি। সে গাছের আড়াল থেকে ছুটে এসে দাঁড়িয়েছিল অর্জুনের রুদ্রমূর্তির সামনে—আমাকে আগে মার তুমি, আমাকে আগে মার।

অর্জুন থমকে দাঁড়িয়েছিল। সে এক মুহূর্তের জন্যে, তারপর ক্রুদ্ধ গর্জনে বলেছিল, সরে যা।

—না।

—তবে তু মর্।

সে লাঠি তুলেছিল।

কিন্তু তাতেও ঝুমঝুমি সরে নি। বলেছিল, মার মার্। মরে যাই। মার্।

অর্জুন স্থির হয়ে গিয়েছিল। ঝুমঝুমি তখনও বলছিল, মার্ মার্।

অর্জুন লাঠি ধরেই দাঁড়িয়েছিল। রুক্মিণী আবার বলেছিল, লাঠি ফেল্ অর্জুন। তুই ওই ছত্রিশ জাতিয়ার মেয়েটার চেয়েও বর্বর।

অর্জুন লাঠিটা ফেলে দিয়েছিল। তারপর ঝুমঝুমির হাত ধরে বলেছিল, চল্, ইখান থেকে চলে যাব তুকে লিয়ে।

—না। ঝুমঝুমি তার হাত ছাড়িয়ে হাত জোড় করে রুক্মিণীকে বলেছিল, মা।

রুক্মিণী মন্দিরে ঢুকে দোর বন্ধ করেছিল। অর্জুন হন হন করে চলে গিয়েছিল বনের দিকে। দলু চমকে উঠেছিল—অর্জুন!

—আমি যেছি সদ্দার, ফিরায়ে আনছি উকে। ডেকো নাই, রাগ না পড়লে তো উ ফিরবে নাই। বলেছিল ঝুমঝুমি এবং সেও ছুটেছিল। বহু কষ্টে বুঝিয়ে ঝুমঝুমি যখন তাকে ফিরিয়ে এনেছিল তখন দলু সর্দার পাইক সর্দারদের নিয়ে বৈঠকে বসেছে। বেলা তখন অপরাহ্ন। সকলের মাঝখানে মুখ নীচু করে বসে আছে রুক্মিণী। ঝুমঝুমির সঙ্গে অর্জুন এসে দাঁড়াল। চুপ করে দাঁড়াল। ঝুমঝুমি বললে, যাও যাও।

—না। ইরা সবাই থাকতে সি পারব না আমি। না।

সকলে আশ্চর্য হয়েছিল। কী বলছে অর্জুন!

ঝুমঝুমি বলেছিল দলুকে, সর্দার!

—কি?

—যেতে বল। ইদেরকে যেতে বল।

—ক্যানে?

সে কথা ঝুমঝুমমিকে বলতে হয়নি, বলেছিল অর্জুন নিজে।—ক্যানে? আমি আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলব, সে কথা উরা শুনবেক ক্যানে? শুনবার কে? সদ্দার! ভারী বুদ্ধি সদ্দারের। আমি পায়ে পড়ব। সবারই সামনে পড়তে হবেক নাকি হে?

সকলে উঠে চলে গিয়েছিল সেই মুহূর্তেই। দলুও যাচ্ছিল। কিন্তু অর্জুন বলেছিল, বুড়া, তু থাক। তু দাদো। তু যাবি কোথা? বস্।

বলেই সে এসে মায়ের পা দুটো চেপে ধরেছিল, মা!

ওই একটি কথাই বেরিয়েছিল। তারপর হো হো করে কান্নায় প্রায় ভেঙে পড়েছিল। অনেক কষ্টে শেষে বলেছিল, আমার নরক হবেক। আমার নরক হবেক।

এরপর মা আর থাকতে পারে নি। তাঁর চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়েছিল। সে নিঃশব্দে তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল।

—মা!

মা নির্বাক, পাথরের মত। অশ্রুর ধারা দুটি বারো পাহাড়ে ঝর্নার ধারার মত ঝরছিল।

—মা গো! মা!

—অর্জুন!

—আমার পাপ হ'ল মা। মাফ কর মা।

—করেছি অর্জুন।

দলু তার হাত ধরেছিল এবার—উঠ হে বাবু সাহেব, রাজাবাহাদুর উঠ।

অর্জুন উঠে দাদোর গলা জড়িয়ে ধরেছিল—তা লারব। দাদো, তোর চুমো খেছি দাদো, দাদো রে—

দলু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, চল হে পঞ্চায়েতের কাছে। তোমাকে বনের লেগে বছরে জননীকে আশ্বিন কিস্তি চোত কিস্তি দু কিস্তিতে দু সিক্কা লাগবেক। বাস্। চল এখুন। পঞ্চায়েতে গিয়া বল, দোষটা তুমার হইছিল।

—হঁ। তা হইছিল। তা চল। বলব।

তারা দুজনে গিয়েছিল, কিন্তু ঝুমঝুমি ছিল রুক্মিণীর কাছে। হাত জোড় করে সে বলেছিল, মায়ী !

রুক্মিণী তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ঝুমঝুমি বলেছিল, মায়ী !

—কি বলছিস, বল্।

—মায়ী, তুমি উকে বুঝায়ো মা, বুকে জড়ায়ে রেখো। তা লইলে তো বাঁচবে না উ। পাহাড় থিকে ঝাঁপ খাবে। লইলে নিজের বুকে ছুরি বসাবেক। তুমি উকে বাঁচায়ো।

—কেন ঝুমঝুমি ? ও যে মাপ চেয়ে গেল, কাঁদল।

—আরও কাঁদবে মায়ী, পাগল হবেক। আমি মলে—

—ঝুমঝুমি !

—তুমি কথা দাও মা। আমি নিশ্চিন্তি মরব।

—ঝুমঝুমি ! না।

—আমার লেগে উ এমুন হইছে মা। তবে উ পাগল বটেক। আমার লেগে বেশি পাগল হ'ল। আমি মরব রেতে। সাপের বিষ আছে বাবার শামুকের খোলায়। খেলেই মরে যাব। তুমি উকে—

—না না না। ঝুমঝুমি, না। ওরে না।

রুক্মিণী উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। ঝুমঝুমি অনুভব করেছিল, রুক্মিণী থর থর করে কাঁপছে।

ঝুমঝুমি বলেছিল, মায়ী !

—না ঝুমঝুমি, তুই মরিস নে খবরদার রে, খবরদার ওকে তোকে দিলাম রে। ও তোর। তুই শুধু—

—কি মায়ী ?

—ওকে মদ ছাড়া। মানুষ কর্।

—সে কি আমি পারি মায়ী, তুমি পার না ?

—পারতেই হবে তোকে। ওরে, তোরা জানিস না, ও আমার পেটের ছেলে হলেও ও রাজার ছেলে।

—মায়ী!

নিজেই চমকে উঠেছিল রুক্মিণী। এ কাকে সে কী বলছে! পরক্ষণেই বলেছিল, কিন্তু খবরদার ঝুমঝুমি, এ কথা কাকেও বলবি না। কাকেও না, ওকেও না। খবরদার, তা হলে তোর মুখ দেখব না।

—বলব না মায়ী।

রুক্মিণী সেদিন ওকে নিজের পুরনো কাপড় যা তোলা ছিল, তাই পরিয়ে নিজে কেশসজ্জা করে দিয়ে মাথায় নিজের ছেলেবয়সের রূপোর টিকলি পরিয়ে দিয়েছিল। তারপর অহল্যাকে ডেকে বলেছিল, পিসী, দেখ তো।

পিসী ঝুমঝুমিকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সবিস্ময়ে বলেছিল, ঝুমঝুমি! অর্থাৎ এ কি সত্যই ঝুমঝুমি! রুক্মিণী সন্ধ্যার সূর্যের আলোতে ঝুমঝুমির চিবুক ধরে মুখখানি তুলে ধরেছিল। সেও মুগ্ধ হয়ে বলেছিল, হ্যাঁ।

—ই যি কালো রাধা লো রুক্মিণী।

—তাই বটে।

সত্যই অপরূপা লাগছিল কালো মেয়েটিকে। সুনিপুণ প্রসাধনে তার বন্য বর্বর রূপ পাল্টে গিয়ে দ্রুপদ রাজার স্বয়ম্বর সভার কৃষ্ণবর্ণা কৃষ্ণার মত লাগছিল।

রুক্মিণীর পিসী অহল্যা তাড়াতাড়ি রুক্মিণীর ঘরের ভিতর থেকে আয়নাখানা এনে ঝুমঝুমির সামনে ধরে বলেছিল, নিজে দেখ্ লো একবার। ছত্রিশ জাতিয়া বেদেনী মোহিনী হয়ে গিয়েছিস।

অবাক হয়ে নিজেকে নিজে দেখছিল ঝুমঝুমি।

রুক্মিণী বলেছিল, আয় এবার। ঝুমঝুমির হাত ধরে সে তাকে কিষণজীর মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, শোন্। এই ঠাকুরকে সাক্ষী করে তোকে আমার বেটার সেবা করবার জন্যে নিলাম। তার সেবা করবি। বল্, ঠাকুরের সামনে বল্।

অবাকের উপর অবাক হয়েছিল ঝুমঝুমি। তাদের কত জনের কত পাইকদের সঙ্গে প্রেম হয়, একদিন তারা মেয়েদের নিয়ে যায় নিজেদের ঘরে; কই, ঠাকুরের সামনে এমন করে বলতে হয় না, এমন করে সাজিয়ে দেয় না, সাজাতে পায় না। কিন্তু এ কি হ'ল তার! মাথার

ভিতর ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। কেমন ভয় লাগছে, বুকের ভিতরটায় যেন গুরু গুরু করে মেঘ ডাকছে।

—বল্‌—

—তার সেবা করব।

—বল্‌, তাকে ছাড়া অন্য পুরুষকে ভজব না। বল্‌।

—কখুনও না। কখুনও ভজব না মা। তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি।

বল্‌, তার মদ খাওয়া কমিয়ে তাকে মানুষ করবি। সে রাজার ছেলে, তাকে তাই করে দিবি?

ঝুমঝুমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, রাজার ছেলে কেমন সি তো জানি না মায়ী।

—বেশ, আমি যেমন মা, তেমনি মায়ের ছেলে করে দিবি।

—করব মা।

রুক্মিণী তারপর পিসীকে বলেছিল, পিসী, বাপকে ডাকতে বল্‌; ঝুমরীকে আর সর্দারদের।

সর্দাররাও এসে এই কালো মেয়েটির আশ্চর্য রূপ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। অর্জুন ছুটে এসেছিল ঝুমঝুমির কাছে। রুক্মিণী বলেছিল, এই উজবুক, থাম্‌।

অর্জুন অন্যদিন হলে থামত কি না সে ভগবান জানেন, কিন্তু সেদিন থেমেছিল। শুধু বলেছিল, তু সাজালি মা? তু?

—বর্বর কোথাকার, তুমি বলতে হয়।

—আমার লাজ লাগে।

অহল্যা বলেছিল, ঝুমঝুমির হাত ধরতে ছুটে আসতে লাজ লাগে না বেহায়া?

—হুঁ। আজ লাগছে।

সকলে হো হো করে হেসে উঠেছিল। অর্জুন আরও লজ্জা পেয়েছিল। রুক্মিণী বলেছিল, বাপ!

—মা!

—তোমাকে, সর্দারদিকে সাক্ষী রেখে ঝুমঝুমিকে আজ থেকে অর্জুনের দাসী করে দিলাম। শুধু তোমরা নও, কিষণজী সাক্ষী রইলেন। আজ থেকে দিনরাত্রি ও অর্জুনের ঘরে থাকবে। অর্জুনকে বলতে হবে, কখনও সে ঝুমঝুমিকে ছাড়বে না বিনা দোষে। তার অপমান করবে

না, অন্য মরদকে তার গা ছুঁতে দেবে না। বল্ অর্জুন, কিষণজীর সামনে বল্। আয়, বল্।
অর্জুন অবাক হয়েই বলে গিয়েছিল বাক্যগুলি। সেও এমন করে কথা কখনও বলে নি।

*   *   *   *

সেদিন থেকে ঝুমঝুমি ও অর্জুন একসঙ্গে থাকে। ঝুমঝুমি তার রাখনী। কিন্তু অন্যদের রাখনীর মত নয়। একটু আলাদা। এবং সেবাও তার আশ্চর্য। এই মাস কয়েক আগে বর্গীরা যখন মেদিনীপুরে ঢোকে তখন গাছে চড়ে লুকিয়ে দেখতে গিয়ে কিসের কামড় খেয়ে যাতনার জ্বালায় অস্থির হয়ে সে নদীর জলে ঝাঁপ খেয়েছিল। ঝুমঝুমি তার সঙ্গে ছিল। ঝুমঝুমিকে নিয়ে সে মাস কয়েক বলতে গেলে প্রমত্ত জীবন যাপন করেছে। দিনরাত্রি বনে বনে ঘুরেছে। সে বাঁশী বাজিয়েছে, ঝুমঝুমি নেচেছে। সে মদ আরও বেশি খেয়েছে, ঝুমঝুমিকেও খাইয়েছে। ঝুমঝুমি যে কথা রুক্মিণীকে দিয়েছিল তা সে রাখতে পারে নি। তার সাধ্য ছিল না। হয়তো এতে তার সাধও ছিল। তার ছত্রিশ জাতিয়া বেদিয়া জীবনের এমনিই ছিল ছেলেবেলা থেকে সাধ। সে-সাধের বিরুদ্ধে সে যেতে পারে নি। রুক্মিণীর সাময়িক স্নেহ সব মুছে গিয়ে ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল। নিজেকেই দোষ দিয়েছিল সে। তার এমন প্রত্যাশা করাই ভুল হয়েছিল। মেয়েটা যে ছত্রিশ জাতিয়া বেদেনী। কিন্তু সেবার ক্ষেত্রে ঝুমঝুমি তার কথা রেখেছিল। সে যে কী কষ্টে তাকে বাড়ি এনেছিল সে কেউ কল্পনা করতে পারে না। এমন দশাসই জোয়ান অর্জুন, তাকে ওই কৃশাঙ্গী মেয়েটা কেমন করে বয়ে আনলে ঘরে। তারপর সর্বাঙ্গ ফুলে উঠল অর্জুনের। ঝুমঝুমির বাপ বেদে। সাপের ওস্তাদ, বিষের ওঝা চিকিৎসক। সে করলে চিকিৎসা। রুক্মিণী মাথার শিয়রে বসে থাকত। আর এই মেয়েটা নিদ্রা নেই আহার নেই সেবা করেছে। অর্জুনের শরীরে চাকা চাকা মত হয়েছিল। দুর্গন্ধ রস গড়াত। মেয়েটা শিমুলতুলো ভিজিয়ে মুছত। ময়ূরের পালকে ওষুধ ভিজিয়ে লাগাত ক্ষতে।
মীর হবিব বর্গী নিয়ে এলেন, নবাবের তাড়ায় শেয়ালের মত পালালে। অর্জুন গাছে চড়ে বর্গী দেখতে গিয়ে কিসের কামড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল দুমাস। রুক্মিণী তখন কিষণজীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলত, তুমি ওকে নিলে না কেন? ওকে যদি নিতে, ও যদি মরত তা হলে

যে বর্গীদের ওই পালানোর সময়েই রুক্মিণী যেমন পারত মীর হবিবের রক্ত নিতে জান নিতে চেষ্টা করে মরত। এমন কথা দলু মন্দিরের বাইরে বসে শুনত আর চোখের জল ফেলত।

অর্জুন সেরে উঠে আবার যে অর্জুন সেই অর্জুন হয়ে উঠল।

রুক্মিণী একদিন বলেছিল, এতেও তোর শিক্ষা হ'ল না?

হেসে অর্জুন বলেছিল, শিক্ষা? কিসের শিক্ষা? একদিন ভাত খেয়ে জ্বর হয়েছে বলে ভাত খাবে না লোকে? ভাত তো বার মাস খায় লোকে। হুঁঃ! যত সব!

রুক্মিণী আর কিছু বলে নি।

মাস দেড়েক আগে একবার ক্ষেপেছিল মনসার মেলা যাবে। সনকা মায়ের মন্দিরে মেলা।

যেতে দেয় নি রুক্মিণী।

এবার অষ্টমীর খেলা। বিজয়া দশমীর মাতনে সেই জন্যে কাউকে না বলে তার দল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তার সাঙ্গোপাঙ্গ চেলা-চামুণ্ডের দল শুধু তার মোহগ্রস্তই নয়, তাদের স্বাস্থ্য আছে, শক্তি আছে, উল্লাসের তৃষ্ণা আছে; সাহস আছে দুর্দান্ত। তারাও বেরিয়ে গিয়েছে তাদের নবীন বয়সের সঙ্গী নবীন সর্দারের সঙ্গে। তার উপর সঙ্গে আছে আপন আপন সঙ্গিনী, তারাও প্রমত্তা। তারা ফিরবে না, দলু জানে।

সাত

শঙ্করীপুরের মা শঙ্করী সাক্ষাৎ শঙ্করী। সাক্ষাৎ দুর্গা চণ্ডী চামুণ্ডা। প্রশস্ত বাঁধানো চত্বরের মধ্যে পাথরের গাঁথনি। দেওয়ালের উপর ছাদ, একতলা ঘর, তার মধ্যে মা চণ্ডীর আটন। আগে ছিলেন গাছতলায়। গাছটা মরে গেছে কিন্তু শুকনো গুঁড়িটা এখনও আছে, তারই কোলে শিলামূর্তি। শিলার সর্বাঙ্গ সিন্দুর লেপা, শুধু সোনার বা পিতলের দুটো গোল চোখ ঝক্‌ঝক্ করে।

বহুকাল থেকে এখানে আশ্বিনের পূজার সময় পূজা হয়; পূজা অষ্টমী নবমী দু'দিন। তারপর দশমীর দিন ও অঞ্চলের লোক ঝেঁটিয়ে এসে জড়ো হয়, ভদ্রলোকে মাকে প্রণাম করে। হাতে অপরাজিতার লতা

বাঁধে। কোলাকুলি করে। আর পাইক চুয়াড়রা এসে মদ খেয়ে গান করে, নাচে। সে এক হুল্লোড়।

অষ্টমীর দিন রাত্রে বলি হয় অষ্টমীর ক্ষণে। সেদিন পূজোর পর সব বড় বড় ওস্তাদ খেলোয়াড় আসে। লাঠিতে তলোয়ারে সড়কিতে তীরধনুকে শঙ্করী মায়ের সিঁদুর লাগায়। আর একটা খেলা হয়। সে খেলার বিচার করে শঙ্করীপুরের ছত্রি নায়ক। খেলা দুভাগে হয়। একটাতে খেলে শুধু ছত্রিরা, অন্যটাতে অন্য সকলে।

শঙ্করীপুরের অষ্টমীর দিন খেলায় যারা সকলকে হারায় তারা শির প্রসাদ পায় এবং তারাই হয় এ বছরের জন্য সেরা জোয়ান। বহুদিন থেকে অর্জুনের সাধ, তারা একবার গিয়ে এই প্রসাদ জিতে আনে। শির প্রসাদ হ'ল এক-একটা পাঁঠার মুণ্ডু, ওরা বলে 'মুড়ি'। অষ্টমীতে বলি হয় পঞ্চাশ-ষাট। তার মুণ্ডুগুলো সারি সারি সাজানো থাকে মন্দিরের মেঝেতে। প্রতি মুণ্ডুর উপর জ্বালা থাকে এক-একটি মাটির প্রদীপ। খেলা শেষ হলে লাঠি তলোয়ার সড়কি তীরধনুক আর কুস্তির সেরা খেলোয়াড়কে এক-একটা করে মুড়ি প্রসাদ দেন পুরোহিত। ছত্রিরা আলাদা পায়, পাইকেরা আলাদা পায়।

*　　　*　　　*

এ অঞ্চলের মধ্যে চন্দনগড়ের খেলোয়াড় ছত্রি এবং পাইক দুয়েদেরই খুব নামডাক। তারাই বলতে গেলে প্রতি বছরই শির প্রসাদ লুটে নিয়ে যায়। দু-চারটে মুড়ি অন্যেরা পায়। এলাকাটাও বলতে গেলে চন্দনগড়ের এলাকা। চন্দনগড়ের রাজা সুচেত সিং-এর পড়তাও খুব, প্রতাপও খুব। সুচেত সিং আগে বর্গীদের দোস্ত ছিল। উড়িষ্যার কাছে এই অঞ্চলটায় বর্গীদের প্রতাপই বেশি। নবাবের রাজত্ব মাসে দশ দিন থাকে, বিশ দিন থাকে না। কাজেই সুচেত সিং-এর প্রতাপ বড়, বাড়ন্তও খুব। এখানকার ছত্রি নায়ক চন্দনগড়ের অধীন নয়, সে শঙ্করী মায়ের দেবোত্তরের সেবায়েত। তার উপর হাত কেউ দেয় না। এলাকাটিও ছোট। শঙ্করীপুর মৌজাই এলাকা। গ্রামে বাসিন্দাও বেশি নয়। ঘর পঞ্চাশেক। পূজক ব্রাহ্মণ আছে কয়েক ঘর, ছত্রি ঘর বিশেক। বাকি সব কয়েক ঘর সদ্‌গোপ আর বাগ্দী চুয়াড়। আর ঘর চারেক বাদ্যকর। সদ্‌গোপেরাও দেবতার কাজ করে জমি ভোগ করে। দেবতার কাজেই জমি সব বেঁটে দেওয়া আছে। কেউ ফুল যোগায়, কেউ বেলপাতা, কেউ আতপ, কেউ গুড় চিনি, কেউ

পাঁঠা, নিত্য বলি আছে। কেউ পাঁঠা বলি করে, কেউ ধরে, কেউ পাঁঠা বাঁধবার দড়ি দেয়। কেউ খর্পরের জন্য মাটির খুরি দেয়, কেউ ঘট। কেউ মন্দির ঝাঁট দেয়। কেউ বহুদূর থেকে ভারে বয়ে গঙ্গাজল আনে। এমনি ব্যবস্থা। গ্রামে ধনী কেউ নেই। তার উপর জাগ্রত দেবস্থান। ছত্রিরাও এখানকার রাজায় রাজায় যুদ্ধে দাঙ্গায় কারুর পক্ষ নেয় না। এখানকার ছত্রিদের খেতাবই হ'ল—মায়ের দেওয়ান। কিন্তু অধীন কারুর না হলেও যে রাজার যখন বাড়বাড়ন্ত হয় তখনই তার প্রতাপের প্রভাব এসে পড়ে। চন্দনগড়ের প্রভাব এখানে অনেক দিনের। সুচেত সিং-এরও আগের আমলের। তাদের পূজো বছরে অনেকবার আসে। এবং তাদের পূজাই দেওয়ানদের পূজোর পর প্রথম। রাজা সেনাপতি সিপাহীরা সব দল বেঁধে আসে। রানীরাও আসেন ডুলি করে। তখন কাপড়ের ঘের পড়ে। অন্য কেউ মন্দিরে ঢুকতেও পায় না। তারপর খেলা আরম্ভ হয়। মহাষ্টমীর রাত্রে—এ খেলা বীরের খেলা। তলোয়ার খেলা, সড়কি লাঠির খেলা, ধনুর্বাণের খেলা,—নামেই খেলা—আসলে সে যুদ্ধ। জখম প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে—মধ্যে মধ্যে খুনও হয়ে যায়। আঘাত তো খেলার আঘাত নয়। যুদ্ধের আঘাত। বিশেষ করে তলোয়ার খেলায় মধ্যে মধ্যে তলোয়ার আমূল বসে যায় বুকে কিংবা আঘাতে হাত মুণ্ডু দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

চারি দিকে মশাল জ্বলে, রাত্রির অন্ধকার উপরে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে, চারি পাশে স্তব্ধ জনতা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে, মধ্যে-মধ্যে আপন অজ্ঞাতসারেই মুখভঙ্গি করে হাত পা নিয়ে আস্ফালন করে। খেলা শেষ হলেই অর্থাৎ একজন পরাজিত হলেই ধ্বনি ওঠে, রাত্রে আকাশের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়ে শূন্যলোকে। একজন ধরাশায়ী হতেই আর একজন লাফ দিয়ে পড়ে, বিজয়ীকে যুদ্ধে আহ্বান করে বলে, এস।

মন্দিরের দাওয়ায় বসে থাকে বিচারকমণ্ডলী, তাদের পাশে থাকে অস্ত্রধারী সিপাহী। একালে তাদের হাতে বন্দুকও থাকে। এই প্রতিযোগিতায় যুদ্ধের নিয়ম কেউ লঙ্ঘন করলে তারা এগিয়ে এসে মাঝখানে দাঁড়ায়। প্রয়োজন হলে বন্দুকও ব্যবহার করে। এদের অধিকাংশেরাই চন্দনগড়ের। এখানকার ছত্রি রাজা মা চণ্ডিকার দেওয়ান সাহেব নামে প্রধান বিচারক হলেও চন্দনপুরের রাজা সুচেত

সিংই সর্বোচ্চ আদালত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এবার চন্দনপুরের কেউই আসে নি। রাজা না, সেনাপতি না, কোন সিপাহীও না। এমন কি, সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্য থেকে যে সব জোয়ানেরা এসে খেলায় বেশী মাতে তারাও না। এমন কি এখানকার ছত্রি রাজা মায়ের দেওয়ান তিনিও হাজির নেই। মহাষ্টমীর রাত্রেও এবার মা চণ্ডীর স্থানটায় যেন জমজমাট নেই। স্থানীয় লোকেরা আছে কিন্তু সে হৈ-হৈ জমজমা গমগমা যেন ছাই ঢাকা পড়া আগুনের স্তূপের মত মনে হচ্ছে।

অর্জুনের দল এসে জয়ধ্বনি দিয়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণে ঢুকল—জয়, মা চণ্ডীর জয়!

তাদের দেখে লোকজনেরা চকিত হয়ে একবার তাকালে মাত্র। কিন্তু তারপর আপন কথায় মত্ত হয়ে গেল।

কথা আর কিছু নয়। 'বর্গী'। তাই 'বর্গী' শব্দটাই কানে আসছে বার বার। অর্জুনেরা প্রণাম করে উঠে একটা ফাঁকা দেখে জায়গায় আসর পেতে বসল। অর্জুন বললে, ধুৎ তেরি। বর্গী—বর্গী—আর বর্গী। বর্গী কত দূরে ঠিক নাই, সব ভয়ে মরে গেল আগে থেকে। শালা! লোক কই রে? লড়ব কার সঙ্গে?

গণ্ডার বললে, বললাম তোমাকে, ছোট সদ্দার ফিরে চল। বড় সদ্দার বারণ করেছে, মা বারণ করেছে, আমি নিজে বর্গীর খবর নিয়ে আইছি সেই বালেশ্বরের ধার থেকেন—তা তুমি শুনলা না। বললা—ভাগ্ শালা। বালেশ্বরের আগে বর্গী, তা তারা কি উড়ে আসবেক না কি? বর্গী এলে লড়াই হবে—সি যখন হবেক তখন হবেক। এখন আমোদ হবে নাই? মহাষ্টমী বন্ধ থাকবেক? শালারা মায়ের ওপর ভরসা করতে লারিস তো পুজোতে কাজ কি?

অর্জুন বললে—সি তো এখনও বলছি রে। মায়ের পূজা করবি। —মা আজ পাঁঠা খেলে ভোগ খেলে, ঘরে এল, আজও বর্গীকে ভয়? ধুরো শালাদের পূজো! আর ধুরো শালারা অবিশ্বাসী! ভাগ।

ওদিকে চাক আর ঢোলে কাঠি পড়ল।

প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে।

অর্জুন বললে, মদ দে রে ঝুমঝুমি। লে রে, সব তৈরি হয়ে লে। চল্, এ 'কয়ো' কেটে আমোদ তাই হোক। ইবারে 'কয়ো' কেটেই আমোদ হোক।—অর্থাৎ কাক কেটেই আমোদ হোক।

বলে উঠে তাদের ধ্বনি দিয়ে উঠল—আবা-আবা-আবা-আবা জয়, মা চণ্ডী কি জয়।

*   *   *

সত্যি এবার খেলাটা জমলই না। ছত্রিদের আসরে যারা খেললে তাদের খেলা দেখে অর্জুন হেসেই সারা হয়েছিল।—এই ছত্রিদের খেলা। ধু-রো! এক বুড়ো ছত্রি হরিহর সিং তলোয়ার সড়কি খেললে বটে। ভাল খেলা।

ছত্রিদের আসরে সে খেলে নি। সে পাইক বাগ্দীদের আসরে খেলেছিল। কিন্তু একটা কাণ্ড হয়েছিল। বুড়ো পুরোহিত; পাকা চুল, পাকা দাড়ি গোঁফ, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। হাতে তামার তাগায় রুদ্রাক্ষ। আচ্ছা মানুষ। তিনি এখানকার লোক নন; অনেক দূর থেকে আসেন এই পুজোর সময় আর কার্তিকের অমাবস্যায় কালীপুজোর সময়। খেলার আসরে নামবার আগে মাকে পুরোহিতকে প্রণাম করে আশীর্বাদী নিয়ে আসরে নামে—এই নিয়ম। সেই নিয়ম বশে মালসাঁট মেরে লাঠি হাতে অর্জুন গিয়ে প্রণাম করে হাত পেতে দাঁড়াতেই তিনি যেন চমকে উঠেছিলেন। চমকের সুরেই বলেছিলেন, তুমি!

—আজ্ঞে আমি খেলব।

—তুমি এদের সঙ্গে খেলবে কেন? তুমি ছত্রিদের সঙ্গে—তুমি ছত্রি নও?

—আজ্ঞে না।

—নও?

—না।

—বাগ্দী?

—না। আজ্ঞে উ সব খবর আমি রাখি না। দেন, ফুল দেন, খেলি গা।

তিনি তার হাতে ফুল দিয়েছিলেন। লাঠি, তলোয়ার, সড়কি তিনটেতে সে জিতেছিল। তীর ধনুকে একটুর জন্যে হয় নি। তাও দুজনের সমান হয়েছিল। কুস্তিতে গণ্ডার জিতেছিল। শিব প্রসাদ নেবার সময় পুরোহিত আবার তাকে বেশ করে দেখেছিলেন মশালের আলোয়। দেখে বলেছিলেন, তোমার নাম কি?

—অর্জুন।

—অর্জুন কি ?

—সিং।

—তবে বললে যে ছত্রি নও ?

—না, আমি ছত্রি নই। উ মশায়, আমি জানি না।

—জান না ? বাবার নাম—

—সে সব জানি না, বাবা মরে গিয়েছে আমার জনমের ক মাস আগে। তা সি সব কথা আমাকে কেউ বলে না। আমি জানি না।

—এটি ? এটি কে তোমার ?

অর্জুনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল ঝুমঝুমি।

—উটো আমারই বটেক।

—বউ ?

—তা বটে বইকি।

—হুঁ।

বলে তিনি তাকে চারটি পাঁঠার মুড়ি দিয়ে বলেছিলেন, দাঁড়াও।

মন্দিরের ভিতর থেকে দুগাছি অপরাজিতার মালা এনে একগাছি দিয়েছিলেন অর্জুনকে, অন্যগাছি ঝুমঝুমিকে। আরও বলেছিলেন, তুমি যেয়ো না। সব হয়ে গেলে আমার সঙ্গে দেখা করো। নির্জনে।

—আজ্ঞে মদ খাব গা যি।

—মদ আমি দেব। মায়ের প্রসাদী মদ। বস।

সব হয়ে গেলে মন্দিরপ্রাঙ্গণে পুরোহিত অর্জুন আর ঝুমঝুমিকে ডেকে প্রসাদী মদ এবং মাংস প্রসাদ তাদের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, খাও।

অর্জুন খানিকটা খেয়ে তাকিয়েছিল ঝুমঝুমির দিকে। ঝুমঝুমি লজ্জা পেয়েছিল, সলজ্জভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে বলেছিল, না।

অর্জুন হেসে বলেছিল, আপনাকে লাজ করছেক।

ঠাকুর বিচিত্র একটু স্নেহের হাসি হেসে বলেছিলেন, খাও মা, মায়ের প্রসাদ। খাও। তুমি তো নায়িকা মা। সাক্ষাৎ নায়িকা। তুমি খাবে না তো খাবে কে ? তবে মা, কখনও কদাচারের জন্যে খেয়ো না। যখনই খাবে, মা খাও—বলে মনে মনে ডেকে খাবে। না হলে নিজেও ধ্বংস হবে, একেও ধ্বংস করবে।

দুজনেই ওরা থর থর করে কেঁপে উঠল। অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়েছিল ঠাকুরের।

ঝুমঝুমি বলে উঠেছিল একটু পর, বাবাঠাকুর।

—আগে খাও। প্রসাদ নাও।

ঝুমঝুমি মদের পাত্র শেষ করে কপালে ঠেকাল। ঠাকুর বলেছিল, এই তো।

অর্জুনের অস্বস্তি লাগছিল। সে বললে, এইবারে আমরা যাই বাবা? সঙ্গীরা সব বসে রইছে।

—তুমি বড় অস্থির। নিজের কাছ থেকে ছুটে পালানো যায় না। স্থির হয়ে দাঁড়াও। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। সত্যি বলবে?

ভয় পেয়েছিল অর্জুন। অন্ধকারের মূলে যে ভয় আছে সেই ভয়। সে সভয়ে বলেছিল, আজ্ঞে?

—তোমার মা বেঁচে আছে? রুক্মিণী?

চমকে উঠেছিল অর্জুন। আজ্ঞে! তাকে জান আপুনি?

—আগে বল, বেঁচে আছে?

—আছে।

—সে—না, শুক্লীরা সাঙা করে না। সে কি নিয়ে আছে? কি করে?

—দিন রাত্রির কিষণজী আছে তার, তাই নিয়ে থাকে।

—দলু বেঁচে আছে?

—আছে।

—তবে তুমি কেন বললে, তুমি ছত্রি নও? কেন মিথ্যে বললে দেবতার কাছে?

—আজ্ঞে আমি জানি না। কেউ আমাকে বলে নাই। মা বলে মাতাল, পেটের কলঙ্ক—

—তুমি ছত্রি। তুমি রাজপুত। তুমি রাজার ছেলে।

চমকে উঠেছিল অর্জুন। তার দেহের মধ্যে রক্ত যেন সন সন করে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছিল। কান দুটো গরম হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল। তার ইচ্ছা হয়েছিল সে চিৎকার করে ওঠে। উঠেওছিল। চাপা চিৎকারে সবিস্ময়ে সভয়ে প্রশ্ন করেছিল, ঠা-কু-র

—চুপ কর। বুঝতে পারছি তুমি জান না, তুমি—

—বাবাঠাকুর! ঝুমঝুমি হাত জোড় করে সভয়ে বলেছিল, বাবা, ওর মা দেবতা, তিনি বলতে বারণ করেছে বাবা! উকে বল নাই। বাবা গো!

—থাক তা হলে, সে-ই বলবে। তবে শোন অর্জুন, আমি তোমার মায়ের গুরু। আমার বাবা ছিলেন তোমার বাবার গুরু। যার জন্যে তোমাকে ডেকেছি।
বলে, তিনি আবার ঘরের মধ্যে গিয়ে একগাছা পৈতে ওই মায়ের অঙ্গের সিঁদুরে রাঙিয়ে এনে বলেছিলেন, মাথা পাত।
—কি ?
—উপবীত। তুমি ছত্রি, তোমার উপবীত হয় নি—
—না।
—অর্জুন !
—না। আমার মা তো রাজার রাখনী ছিল—
—অ্যা—ই ! গর্জে উঠেছিলেন ঠাকুর। তারপর বলেছিলেন, আমি নিজে তোমার মায়ের বিবাহ দিয়েছি। ও কথা উচ্চারণ করো না। মহাপাপ হবে।
এবার এগিয়ে এসেছিল অর্জুন। এসেও থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ও ?
আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল ঝুমঝুমিকে।
—ও তোমার সঙ্গে থাকবে। চিরদিন থাকবে। ও লক্ষ্মীবতী নায়িকা। ও অপরাজিতা। তারপর ঝুমঝুমির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, কি নাম মা তোমার ?
—ঝুমঝুমি।
—তোমার নাম আমি দিলাম অপরাজিতা। কখনও এর অপমান করো না।
অর্জুন গলা পেতেছিল। ঠাকুর সেই রাঙা উপবীত তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তুমি ছত্রি। তোমার বিবরণ তোমার মায়ের কাছে শুনবে। বলবে, তোমার গুরু শঙ্কর ভট্টাচার্য বলতে বলেছেন।
অর্জুন পৈতেটা পরে কেমন হয়ে গিয়েছিল। নেড়ে দেখেছিল। দেহ মন কেমন যেন জ্বরোত্তাপে হয়ে উঠেছিল উত্তপ্ত, জর্জর। ঝুমঝুমি জিজ্ঞাসা করেছিল, ঠাকুর !
—ওকে কি নিয়ম পালতে হবে ? খাওয়া ছোঁওয়া—
—কিছু না। আমি বুঝতে পারছি, যে অবস্থায় আছে তাতে মানা চলে না। মানতে হবে এই কটি নিয়ম। ছত্রি কখনও ভয়ে

মাথা হেঁট করে না। ধর্ম ইজ্জত সব থেকে বড়। ধর্ম হ'ল দেবতাকে প্রণাম করা, বিগ্রহ গো-ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা, বিপন্নকে রক্ষা করা, কারুর উপর অত্যাচার না করা। ইজ্জত মর্যাদা হ'ল ধর্মের আভরণ। দেশের স্বাধীনতা নিজের স্বাধীনতা হ'ল মর্যাদা। নিজের স্ত্রীর সতীত্ব হ'ল মর্যাদা। শুধু স্ত্রী নয়, নারী জাতি হ'ল মর্যাদা। তাকে রক্ষা করবে প্রাণ দিয়ে।

অর্জুন ঠাকুরের পায়ে হাত দিতে গিয়ে থমকে গিয়েছিল। ঠাকুর বলেছিলেন, নাও, পায়ের ধুলো নাও।

—আমি? ঝুমঝুমি বলেছিল।

—নাও মা। তুমি নায়িকা। মহা পবিত্র তুমি।

ওরা প্রণাম করে চলে আসছিল। ঠাকুর বলেছিলেন, আর একটু দাঁড়াও।

—ঠাকুর!

—তোমাদের সৌভাগ্য—দুর্গা সিং নেই। চন্দনগড়ের কেউ আসে নি। এলে তোমাকে চিনতে বাকি থাকত না। তোমার রঙ ছাড়া মুখ চোখ নাক আকার অবয়ব সব তোমার বাবার মত। তোমরা বোধ হয় দলুকে রুক্মিণীকে লুকিয়ে এসেছ?

—হ্যাঁ বাবা। উ কিছুতে মানলেক নাই।

—মানবে না। হয়তো কালচক্র টানছে। তা তোমরা চলে যাবে?

যেন নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলেন।

অর্জুন বলেছিল, না বাবাঠাকুর। দশমীর নাচন না নেচে যাব না।

—হ্যাঁ। দশমীর আশীর্বাদ নিয়ে গেলেই ভাল হয়। তা শোন, এক কাজ কর। তোমরা একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাক। সাবধানে থাকবে। কারুর সঙ্গে ঝগড়া করো না। বুঝলে? না মানলে বিপদ হবে। বুঝেছ, বিপদ হবে। কোথায় আছ?

—কোথায় আবার? গাছতলায়।

—আরো একটু সরে গিয়ে বনের ভিতর থাকো। অমান্য করো না, বিপদ হবে। আর দশমীর দিন যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করবে। সঙ্গীদের কাউকে কিছু বলবে না। কোন কথা না। তুমি ছাত্র, তাও না। বুঝেছ? ঘরে ফিরে সর্বাগ্রে বলবে মাকে।

মায়ের কাছে নিজের কথা শুনবে। তারপর সকলকে বলবে। মা অপরাজিতা, ও চঞ্চল, তুমি মনে রেখো। ও ভুলে গেলে তুমি এসো।

*　　　*　　　*

বিজয়ার দিন সন্ধ্যাবেলা

প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করে তারাও নেচেছে বলিদানের পর ওই দঙ্গলের সঙ্গে। সন্ধ্যায় ফিরে এল আস্তানায়। চণ্ডীতলা থেকে প্রায় আধ ক্রোশ দূরে ঘন বনের মধ্যে একটা ছোট ঝরনার ধারে তারা আড্ডা গেড়েছিল কদিন। জায়গাটায় গাছপালা একটু কম। সেইখানটা তারা কোদাল দিয়ে চেঁছেছুলে, গোবরজল দিয়ে নিকিয়ে নিয়ে বেশ ঝরঝরে করে নিয়েছিল। একদিকে রান্নার জায়গা। এখানে এসে চণ্ডীতলার মেলায় হাঁড়ি মালসা কপটে খুরি-গেলাস কিনে রান্নাবান্না করেছে। শুধু ভাত আর মাংস। নবমীর দিন অষ্টমীর রাত্রে পাওয়া পাঁঠার মুড়ির মাংস খেয়েছে। তার উপর বনে ঢুকে একটা ছোট হরিণ মেরে এনেছিল। সেটাতেই চলেছে নবমীর রাত্রি, দশমীর দিনের বেলা রাত্রির জন্যও রান্না করা মাংস হাঁড়ির গলায় দড়ি বেঁধে গাছের ডালে ঢুলিয়ে রেখে দিয়েছে। আজ সন্ধ্যাবেলায় খাওয়া-দাওয়া করে রওনা হবে রাত্রে। চণ্ডীতলার মা চণ্ডীর মূর্তি শিলামূর্তি। এখানে বিসর্জন নেই। ক্রোশখানেক দূরে মাটির প্রতিমায় পূজো হয়, এক মাহিষ্য জোতদারের ঘরে—ইচ্ছে সেই বিসর্জন দেখে রাত্রি দুপুর নাগাদ রওনা হবে তাদের বারো পাহাড়ী জঙ্গলগড়ের দিকে। পৌঁছে যাবে ভোর-ভোর।

অর্জুনের স্ফূর্তি খুব। সে এবারকার আসরের শির খেলোয়াড়। এ দুদিন যখনই গিয়েছে চণ্ডীতলায় তখনই লোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছে—এই। এই। এই এবারকার শির খেলোয়াড়। বুকের উপর তার লাল পৈতে। পৈতেটা দেখে সঙ্গীরা বিস্মিত হয়েছে। প্রশ্ন করেছে। কিন্তু সে ঠাকুর মশায়ের বারণ মেনেছে, বলেছে শির খেলোয়াড়কে পৈতে দেয়।

স্ফূর্তিতে তার ইচ্ছে হ'ত ডাক ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে শূন্যে মালকবাজী দেয়। কিংবা মাটির উপর বাঁ হাতটায় ভর দিয়ে দেয় মালকবাজী। মায়ের পুষ্প এবং রঙীন গামছা সে মাথায় বেঁধেই রেখেছে কদিন।

দেখুক, লোকে দেখুক। বাড়ি গিয়ে মাকে দাদাকে দেখিয়ে তবে খুলবে—তার আগে নয়।

অর্জুন বললে, লে, পাড়, হাঁড়ি পাড়। আর পাতা লে হাতে হাতে। মাংস আর মদ খেয়ে লে। তারপর চল্ মাইতি বাড়িতে ড্যাং ড্যাং ড্যাং সো—ড্যানাক-ড্যানাক বাজতে লেগে গেয়েছে। চল্। শিগগির শিগগির সব সেরে লে।

গণ্ডার শুধু একপাশে মনমরা হয়ে বসে আছে।

অর্জুন বললে, কি রে গণ্ডারে, তোর হ'ল কি ভ্যালা বল দিকি?

ভ্যাম ক্যানে রে শালা?

গণ্ডার এবার একটু নড়ে বসে বললে, তোমরা যাও ছোট সদ্দার। আমি যাব নাই।

—যাবি নাই? ক্যানে রে? কার পিরীতে পড়লি রে মানিক? বল, দেখায়ে দে। শালা—আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কাঁধে তুলে তু দে ছুট। আমরা পিছাতে থেকে রুখব। তার জন্যে মন খারাবি ক্যানে রে গাড়োল!

গণ্ডার এবার হাত মুখ নেড়ে বলে উঠল, পিরীত! তুমি বাবা ছোট সদ্দার, তোমার সাত খুন মাপ। তুমি যা খুশি করতে পার হে। তোমার সঙ্গে আমাদের সঙ্গ? পিরীত? বলে ভয়ে প্যাটের পিলাটা উপর বাগে মাথায় উঠছেক! তোমাদের কিছু হবেক নাই। বিপদ আমার। বড় সদ্দারের শাহী কিল, ভাদর মাসের তাল পিঠে পড়বেক আমার। হাঁা, বলে কিলায়ে কাঁঠাল পাকায়ে দিবেক! বুঝেছ? আমি যাব নাই।

হো হো করে হেসে উঠল অর্জুন।

একজন প্রশ্ন করলে, যাবি না তো করবি কি?

—গলায় দড়ি দিব হে। লইলে চলে যাব যি দিকে দু চোখ যায়।

অর্জুন তখনও হাসছিল। গণ্ডার বললে, তোমার পায়ে ধরি ছোট সদ্দার, এমন করে হেসো নাই বাপু। আমার বলে—

বেচারা কেঁদে ফেললে এবার হাউ হাউ করে।

এবার অর্জুন গম্ভীর হয়ে গেল। উঠে এসে হাত ধরে বললে, থাম গণ্ডার। আমি তুকে বাত দিছি হে—তুর কিল আমি পিঠ পেতে লিব। আর সদ্দারে সঙ্গে বুঝাপড়া করে লিব। না হয় তুদিকে নিয়ে

ষ.—৭

চলেই যাব শালার জাগা ছেড়ে। নতুন গড় করব। মাকালীর দিব্যি, মা চণ্ডীর দিব্যি, কিষণজীর দিব্যি!

গণ্ডার মুহূর্তে হেসে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে, ছোট সদ্দার, এই লেগেই তো তোমাকে এত ভালবাসি হে। তুমার লেগে জানটাও দিতে পারি।

অর্জুন বললে, লে, হাঁ কর্। আমি নিজে মদ ঢালব তুর মুখে। কোঁৎ কোঁৎ করে গেল। লে।

খানিকটা মদ তার মুখে ঢেলে দিয়ে সে বসল, বললে, লে, ইবারে মাংস আন। দে গো—সব মাংস দে। ওই ছুঁড়িগুলান কুনো কম্মের লয় হে! এই ঝুমঝুমি! এই!

চারিদিক তাকিয়ে দেখলে অর্জুন। কই! ঝুমঝুমি কই!

—আরে! ঝুমঝুমি কুথা গেল হে?

মেয়েগুলি হাসতে লাগল।

—মরণ! হাঁসছিস ক্যানে?

একটা মেয়ে বললে, সি চণ্ডীতলা গেইছে কবচ আনতে। বুললে ঠাকুর বুলেছে তাকে কবচ দিবেক। বশীকরণ কবচ।

খিলখিল করে হেসে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মেয়েরাও। মুহূর্তে অর্জুনের মনে পড়ে গেল ঠাকুরের কথা।

'দশমীর দিন যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করো! সঙ্গীদের কাউকে কিছু বলবে না। ভুলো না।'

আট

শঙ্করীতলায় তখন অনেক লোকের ভিড়। অধীর স্বভাব অর্জুনের, সে খুব দ্রুতই চলেছিল মন্দিরের দিকে। নানান জনের নানা টুকরো কথা মিলে কলরব উঠেছে। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। আকাশ নির্মেঘ। দশমীর চাঁদ পূর্ব দিকের আকাশে বড় তালগাছ-গুলোর মাথায় বিকেল থেকেই দেখা যাচ্ছিল। এখন আলোর দীপ্তিতে ঝলমল করছে। শঙ্করীতলা ফাঁকা জায়গা, জ্যোৎস্নায় বেশ দেখা যাচ্চে সব। এক জায়গায় সাঁওতাল মেয়েরা নাচছে। সাঁওতালেরা বাঁশী মাদল বাজাচ্ছিল। সে একবার থমকে না দাঁড়িয়ে পারলে না। বাবাঠাকুরের কাছে যাবার তাগিদ মনে থাকতেও দাঁড়াল। পিছন থেকে দু-তিন

জনে ভিড়ের মাথায় উপর ঝুঁকে পড়ল। খুব মদ খেয়েছে, গন্ধ পাচ্ছিল অর্জুন! একজন বললে, মেয়েগুলো বেশ রে! কালো হলে কি হবে—বাহারে কালো!

হাসি পেল অর্জুনের। ছোঁড়া নয়, আধবয়সী। চাঁদের আলোয় ঝুঁকে-পড়া মাথায় চুল দেখে বোঝা যায় চুল আধপাকা আধকাঁচা! কিন্তু রস আছে। রসিক বটে।

অন্য একজন বললে, দূর, উকি বাহার কালো। একটা কালো ছিপছিপে ছত্রিশ জাতিয়ার মেয়ে এসেছে দেখেছিস। শালা কোঁকড়া চুল। বাঁশের পাতার মত লম্বা চোখ, ছুরির মতন নাক, শালা দেখলে মাথা ঘুরে যায়।

মাথার ভিতরটা চন করে উঠল অর্জুনের প্রথম জন বললে, দেখেছি। হাঁ হাঁ। গেল কোথা বল্ দেখি?

—সন্ধ্যের সময় তাদের দল বোধ হয় চলে গেল! বনের ধারে দেখেছি।

—শালা—তবে যাবে। হয়ে গেল।

—মানে?

—মানে, বনের ভেতর শোভান সাহেবের দল রয়েছে।

—আবদুস শোভান? কটকের?

—হাঁ।

—কি করে জানলি?

রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল অর্জুন। লোকটি উত্তর দিলে, ওই বনেই তো আমাদের রত্না বাগ্দীরা কজনা মিলে রাহাজানি করে। তারা শোভানের দলের ভয়ে পালিয়ে এসেছেক। তারা বলেছিল শোভানদের আজ একটা বড় লুট আছে। কি চন্দনপুরের একটা ব্যাপার। ও মেয়ে বলছিস বনে ঢুকল—যাবে! তবে জানি না, শোভানের তাক চন্দনগড়ের উপর। যদি জানাজানি না করে!

অর্জুন আর দাঁড়াল না। এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়াল। দেখলে ঝুমঝুমি হাঁটু গেড়ে বসে অঞ্জলি পেতে আশীর্বাদী কিংবা মাদুলী নিচ্ছে। ঠাকুর তাকে দেখে বললেন, এসেছ? বড় চঞ্চল তুমি। বস, ঠিক সময়ে এসেছ। অপরাজিতা অঞ্জলি পেতেছে, ওর অঞ্জলি তুমি নিজের হাত জোড় করে ধর।

ঠাকুর মনে মনে আশীর্বাদ করে ঝুমঝুমির হাতে দুটি তামার কবচ

দিলেন। একটি চৌকো তক্তির মত, অন্যটি মাদুলী। বললেন, এই তক্তি তুমি গলায় কিংবা হাতে পরো। আর মা, তুমি এটি গলায় পরো। ধর্মকে মেনে চলো। মা তোমাদের বিজয় দেবেন। কিন্তু তোমরা কি রাত্রেই যাবে বনের পথে? না গেলেও বিপদ আছে। খবর পেলাম চন্দনগড়ের সুচেত সিং এখানে আসছেন দশমীর প্রসাদ নিতে। এসে পড়লেন বলে। দশমী তিথি একপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত। তার আগেই আসবেন সুচেত সিং। তার আর দেরি নেই। তোমাকে দেখলে—

চুপ করে গেলেন ঠাকুর। বললেন, বিপদ হবে তোমার। দাঁড়াও। বলে, তিনি চোখ বুজলেন। যেন ধ্যান। প্রায় মাথার উপর মন্দিরের বারান্দায় যড়দলের মাথা থেকে একটা টিকটিকি টক্ টক্ শব্দ করে উঠল। ঠাকুর চোখ মেলে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন। তখনও শব্দটা হচ্ছে। তিনি এবার আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, মাথার উপর থেকে বলছে। যাও, চলে যাও। রাত্রেই চলে যাও। তোমরা জোয়ান বীর, তুমি ক্ষত্রি। শুধু মেয়েরা আছে সঙ্গে—

অর্জুন বললে, উদের হাতেও সড়কির মত হালকা খোঁচা আছে বাবা। আর বাঘনখীও আছে। দেখা ক্যানে রে ঝুমঝুমি।

ঝুমঝুমি নিজের পেট-আঁচল থেকে টুপ করে বের করলে বাঘনখ। এবং একটু হাসলে।

—ঠিক আছে, চলে যাও। জ্যোৎস্না কুড়ি দণ্ডের ওপর। প্রায় প্রহর রাত্রি পর্যন্ত। চলে যাও। মায়ের আদেশ হয়েছে, চলে যাও। কোন ভয় নেই। তিনি একটা শ্লোক বললেন।

দূরে মনে হ'ল কোলাহল উঠছে। একটা কলরব ভেসে আসছে। ঠাকুর বললেন, বোধ হয় এসে পড়ল। চলে যাও। হাঁ, তোমার মাকে বলো চন্দনগড়ের খুব বিপদ। গতবার সুচেত সিং নবাবের পক্ষ নিয়ে কটকে সরন্দাজ খাঁর গর্দান নিয়েছিল। এক নাচনেওয়ালী নিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া ছিল তার। এবার সরন্দাজ খাঁর ছেলে বর্গীদের সঙ্গে জুটে দাবি করেছে চন্দনগড়ের দুই মেয়ে পাঠাতে হবে। মাধব সিংএর বিধবা মেয়ে, আর সুচেত সিং-এর নিজের মেয়ে। না দিলে চন্দনগড় তারা রাখবে না। বলো, তোমার মাকে বলো। আজ রাত্রের মধ্যে খবরটা মাকে দিলে ভাল হয়। কাল একাদশী, সাইতের

দিন। বলো, সব জেনে যা সংকল্প নেবার কালই যেন নেয়। বড় শুভদিন। আগের কালে এই দিনে রাজারা বিজয়া সেরে দেশ জয়ে বের হ'ত।

মাধব সিং, চন্দনগড়, সুচেত সিং নামটা বহুবার সে শুনেছে। দাদো মা এই নাম নিয়ে গুজগুজ ফুসফুস করে। তাকে দেখলেই থেমে যায়। ভৈরব গোবর্ধনও করে। সে কোনদিন জিজ্ঞাসা কাউকে করে নি, আজ মনের মধ্যে নাম কটা ঘুরতে লাগল। মাধব সিং তার বাবা এটা সে জানে আর কিছু সে জানে না। সে ডান হাতে বুকের তক্তি, পৈতেটা নাড়ছিল অন্যমনস্কভাবে। ঝুমঝুমি তার সঙ্গে প্রায় ছুটে চলেছে। অর্জুনের পদক্ষেপ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর এবং দ্রুত হয়ে উঠেছে আপনা থেকে। একটা কিছু যেন আজ তার চারিপাশে তাকে ঘিরে থম থম করছে, ফিসফিস করছে। পথে শোভানের দল আছে। আবদুস শোভান। কটকের নাজিমী হারিয়ে নবাবের কাছে ভয়ে লজ্জায় ফিরতে পারে নি। বনে ডাকাত হয়েছে। আস্তানা তার উড়িষ্যায়। সে হঠাৎ চন্দনগড়ের বিপদের খবর পেয়ে বোধ হয় এ বনে ঢুকছে, সুযোগমত হানা দেবে। শোভানের দল সিপাহীর দল। শোনা যায় প্রায় পঞ্চাশ জন নবাবী সিপাহী তার সঙ্গে জুটে রয়েছে। ভারি বদমাশ। সব থেকে বড় লোভ তার ঔরতের উপর। তারপর টাকা।

—ঝুমঝুমি।

—হুঁ? দাঁড়ালা ক্যানে গ?

—বনে ডাকাত আছে।

—ডাকাত তো থাকেই গ। আমরাও তো করি। হাট লুটে নিয়ে আসি। গাঁ লুটি।

—না। এরা বড় ডাকাত। শোভানের দল।

—অ! তা হলি? কি করবেক?

—ভয় লাগছেক তুর?

—ভয়? না। তোহার সঙ্গে রইছি। বাঘনখী রইছে। ভয় ক্যানে করবেক!

—ওরা যদি ধরে তুদের?

—উদের কথা আমি কি করে বলব?

—তুর কথা?

—মরে যাব। অত্যন্ত সহজ স্বরে বললে ঝুমঝুমি।

—বাস্, চল্।

বনের মুখেই পথে গণ্ডার দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে, আজ যাবেক নাই নাকি? বাবা, সি তুক করছিলা ঠাকুরের কাছে!

—চল্, চল্। বলব সব। বিপদ বটেক!

—বিপদ! সদ্দারের লোক আইছে?

—উঁহু। বনে বিপদ।

—বাঘ?

—না। শোভান ডাকাতের দল।

চমকে উঠল গণ্ডার—শোভানের দল!

—হাঁ।

—তবে না হয় আজ রেতে যেঁয়ে কাজ নাই হে ছোট সদ্দার। থাকা যাক। সদ্দারের কিল চড় বকুনি সি তো আছেই। কিল ধমাধম পড়ে সই, কিল ধমাধম পড়ে, সি পড়বেকই। না হয় দু কিল বেশি পড়বেক। কি ঝুমঝুমি?

—উকে যেতেই হবেক। ঠাকুর বলেছে, রাতে যেঁয়েই মাকে একটো কথা বলতে হবেক।

—তাহলে?

—তাহলে তুরা না হয় থাক, উকে আমাতে চলে যাই।

—তুরা যাবি, তুদেব ভয় নাই? বেশ বাঁকা স্বরেই গণ্ডার জিজ্ঞাসা করলে।

অর্জুন চুপ করে পথ হাঁটছিল। তার মনে কে যেন একটা বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। সে বোঝার মধ্যে আছে তার নতুন পরিচয়, সে ছত্রি। সে রাজার ছেলে। তার মা বামুন ছত্রি ঘরের সতীর মত সতী। তার মা তার বাবার—না, কথাটা তার জিভে আর আসছে না। তার মাকে তার বাবা, রাজা মাধব সিং, মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছিল। তার সঙ্গে আরও কটা রহস্যময় নামের ভার চন্দনগড়ের বিপদ তার মাকে আজই বলতে হবে। রাজা মাধব সিং। তার বিধবা মেয়েকে দাবি করেছে পাঠানে নিকা করবে। সে তার বোন। সে মাধব সিং-এর ছেলে। সুচেত সিং এর কুমারী মেয়েকে চেয়েছে শাদি করবে। সে ছত্রি। মেয়ের সতীত্ব ইজ্জত তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচাতে হয়। মাকে খবর দিলে সে আসবে চন্দনগড়ে। ঠিক করে ফেলেছে সে। চন্দনগড় লুঠ করে নেবে বর্গীতে।

হয়তো দখল করে নেবে পাঠানে। সে যাবে। ভাবতে ভাবতে চলছিল সে। ঝুমঝুমি কথা বলছিল গণ্ডারের সঙ্গে। এবার গণ্ডারে তাকে যেন একটা ঝাপটা দিয়ে গেল। সে বললে, ভয় রইছে বইকি গণ্ডার। কিন্তু। করব কি! ছত্রিকে ভয় করতে নাই।

—হাঁ রে গণ্ডার। ঠাকুর আমার সব জানে। উ আমার মায়ের গুরু বটেক, দেখেই চিনে ফেলাইছে। বললে, তুমি ছত্রি বটে। তোমার মাকে তোমার বাবা মন্তর পড়ে বিয়ে করেছিল। আবার বাবা আমার রাজা ছিল। সিদিন মা শঙ্করীর গলা থেকেন পৈতে নিয়ে আমাকে পরায়ে দিয়ে বললে, তুমি ছত্রি। তুমি রাজার বেটাও বট। ই কদিন ই সব কথা তুদিকে বলতে বারণ ছিল বলে বলি নাই। আজ না বললে নয় রে। তা ছত্রি হয়ে, রাজার বেটা হয়ে, ভয় কি করে করি বল্?

—ছোট সদ্দার! দাঁড়াও।

—ক্যানে?

—তোমাকে পেনাম করি হে। দণ্ডবৎ করি। না জেনে কত কি পাপ করলাম বল দেখি নি। হায় হায় গ কিষণজী! হে বাবা ভগবান!

—দূর! সে সব অজান্তি। উতে পাপ নাই। তা ছাড়া বুঝলি কিনা, ঠাকুর বলেছে আচার-আচরণ বাছবিচার আমার নাই। শুধু ছত্রি ধরম মানলেই হবে। এই দেখ তক্তি একটা দিলেক কি, ই যতক্ষণ থাকবেক যমে কিছু করতে লারবেক। ঝুমঝুমিকেও একটা মাদুলী দিয়েছে।....দেখা ক্যানে গ! আর উকে কি বললে জানিস! ঝুমঝুমি বললে, না, সি ক্যান বলবে তুমি?

—ক্যানে বলব না আমি—অঁঃ?

—বড় বেহায়া হে তুমি!

—সি তো বটে। তুকে তো কাঁধে নিয়ে নাচি, নাচতে পারি। শুন্ গণ্ডার, বললেক ঠাকুর ঝুমঝুমি নায়িকে মেরে বটে। নায়িকে বুঝিস তো? হ্যাঁ, মায়ের সব ডাকিনী যোগিনী থাকে তেমনি নায়িকে থাকে। উ আমার শক্তি বটেক। বুললে, উর অপমান করলে ভাল হবেক নাই।

গণ্ডার বললে, এই দেখ।

—কি?

—ঝুমঝুমি কাঁদছেক।

—ঝুমঝুমি। না, অপরাজিতে। উর নাম দিলে ঠাকুর অপরাজিতে।

গণ্ডার বললে, ওরে বানাস রে! হেই বাবা!

হঠাৎ তিনজনেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। গণ্ডার অবাক হয়ে ভাবছিল। ঝুমঝুমি কাঁদছিল পরম সুখে। কাঁদছিল আর চোখ মুছছিল। অর্জুন ভাবছিল তক্তিতে হাত দিয়ে, এই তক্তি এ দেবতার প্রসাদ। এর বল তার দেহে তার মনে তার হাতের হাতিয়ারে ছড়িয়ে পড়বে নিশ্চয়। তখন কিসের ভয়! পঞ্চাশ জনের সামনে জয় মা শঙ্করী, জয় কিষণজী বলে তলোয়ার ধরে দাঁড়াবে। চোখ থেকে বেরুবে আগুন, অস্ত্রের ধারে জ্বলবে আগুন, তার হাঁকে বেজে উঠবে বাজের ডাক। শত্রু থমকে যাবে। তারা থর থর করে কাঁপবে। অনায়াসে সে জয় কালী বলে কেটে ফেলবে। তখন সবাই হাত জোড় করবে।

*

সবশুদ্ধ ওরা ছিল একত্রিশ জন। পঁচিশ জন পুরুষ ছ জন মেয়ে। কেউ থাকল না। মেয়ে পুরুষ সবাই কাপড়চোপড় সেঁটে লড়াই দাঙ্গার সময় যেমন পরে তেমনি করে পরে নিলে। মেয়েরা কাছা দিয়ে কাপড় পরে বুকের কাপড় সেঁটে টেনে পাক দিয়ে কোমরে জড়িয়ে গিঁট দিলে। সে প্রায় গায়ে আর একদফা চামড়ার মত হয়ে গেল। চুলগুলো মাথার উপরে রাখলে ঝুঁটি করে। তার উপর কাপড় বা গামছা দিয়ে পাগড়ি করলে। পুরুষেরা মালসাঁট দিয়ে কাপড় পরে নিলে। অন্য কাপড় দিয়ে মাথায় পাগড়ি করলে। গামছাখানা কষে বাঁধলে কোমরে।

মেয়েরা বাঁ হাতে বালনদী পরলে, কোমরে একটু পিছন দিকে হালকা মাঝারি আকারের বগিদা গুঁজলে। লম্বা বড় গাছে উঠে ডাল কাটবার সময় যেমন করে গুঁজে নেয় তেমনিভাবে। ডান হাতে রইল ওদের লাঠির মত হালকা সড়কিগুলো।

পুরুষেরা হাতিয়ার ভাগ করলে। গণ্ডারের সর্দারিতে দশ জন নিলে লাঠি। মাথায় তার লোহার বোলো পরানো—যার ঘা লাগলে মাথা ফেটে যাবে। দেহের যেখানে লাগুক, হাড় ভাঙবেই। তা ছাড়া কোমরে গুঁজলে বড় বগিদা—যার এক কোপে দুটো পাঁঠা একসঙ্গে কাটা যায়। আর পিঠে বাঁধলে সড়কি। আট জন নিলে

তার ধনুক বগিদা, চার জন নিলে সড়কি তলোয়ার বগিদা। তার নায়ক নিজে অর্জুন। দু জন শুধুমাত্র কপনি পরে কোমরে ছোট বগিদা গুঁজলে। একজন বাড়তি লাঠি তীর ধনুক নিয়ে চলল। ওরা থাকতে আজ কেউ চায় নি।

গণ্ডারই সব বলেছিল ওদের। অর্জুন থম হয়ে বসেছিল। সে থমথমে হয়ে গেছে। পাশে বসেছিল গায়ে গা দিয়ে ঝুমঝুমি। তাকে মধ্যে মধ্যে অর্জুন বলেছিল, মদ দে।

ঝুমঝুমি দিচ্ছিল অল্প অল্প করে। সে একবার বললে, কম করে দিছিস ক্যানে ?

—কম করে খাও। মাতাল হলে তো চলবেক নাই। ভাব। ভেবে দেখ।

—হুঁ, ঠিক বলেছিস। বেশি চাইলে তু দিস না।

গণ্ডার বলছিল, যা সে শুনেছিল অর্জুনের মুখে। সে ঝুমঝুমিকে বলেছিল, দেখা ঝুমঝুমি ছোট সদ্দারের পৈতেটো আর তক্তিটো। দেখা তো—

ঝুমঝুমি দেখিয়েছিল। গণ্ডার বলেছিল, ইবার তুর কবচটো দেখা। ওই দেখ্। ঠাকুর উকে কি বলেছে জানিস, বলেছে উ ছত্রিশ জাতিয়ার ঘরে জন্মালে কি হবেক, উ হ'ল নায়িকে কন্যে। মায়ের ডাকিনী-যোগিনী তারাই মত্তে আসে নায়িকে হয়ে। উ ছোট সদ্দারের শক্তি বটেক। উকে অপমান করলে সদ্দারের ভাল হবে নাই। উর ঝুমঝুমি নাম বদলে নাম দিয়েছে অপরাজিতে। ছোট সদ্দার ছত্রি, ছোট সদ্দার রাজার ছেলে।

সকলে হাঁ করে শুনছিল। সভয়ে দেখছিল। সভয়ে দেখছিল পৈতে-পরা গম্ভীর অর্জুন সিংকে। অর্জুন সিংকে সিংহ উপাধিধারী বলে তাদের কোনদিন মনে হয় নি। তার গড়ন, তার চেহারা, তার গায়ের বর্ণ তাদের থেকে পৃথক বটে। কিন্তু সে কখনও তাদের থেকে পৃথক ছিল না। সর্দারের নাতি সে ছোট সর্দার। তার আলাদা বন আছে, তার পয়সা তাদের থেকে বেশি, এও তাদের কখনও পীড়া দেয় নি। তারা যতক্ষণ থাকত ততক্ষণ যার যা দরকার হয়েছে দিয়েছে। সে তাদের সঙ্গে খেলা করেছে, তাদের সঙ্গে হেসেছে, তাদের সঙ্গে নেচেছে। গেয়েছে। শিকার করেছে একসঙ্গে, এক পাতায় খেয়েছে পর্যন্ত। বললে বলেছে, দূরো, জাত কি রে ? উ মা মানে মানুক। আমি মানি

না। একসঙ্গে না খেলে আমোদ হয়? এক সমান হয়? লে, খা। আর জাত থাকলে সে মারেক কে রে? তার নামটি কি বটেক? ভাগ্। বনে তাদের এঁটো পাত্রেই মদ খেয়েছে। সে চিরদিন উল্লাসময়। হা হা হাসি আর উঁচু গলায় করা সব দুঃখ বিমর্ষতাকে মুছে দিয়ে মুহূর্তে হল্লা উঠিয়েছে। আজ সেই অর্জুন থম থম করছে। কথা বলছে, না। ভাবছে তার মাথায় কি যেন একটা চেপেছে।

গণ্ডার সব বলে বলেছিল, সিং বলছে, তুরা সব রাতটোর মতন এখানে থাক। দিনে দিনে কাল যাবি। উ চলে যা'বে রেতে রেতে ঝুমঝুমিকে নিয়ে ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলে মাকে খবর দিতে। রেতেই খবরটি দিতে হবেক। ঠাকুরের হুকুম বটেক। কাল একাদশীর রাত। কালকেই মাকে যা হয় করতে হবেক। কাল শুভদিন।

রতন পাইক বললে, তাই হয় নাকি নি! আমরা থাকবকটা ক্যানে?

—আমরাও যাব। হা-রে-রে-রে করতে করতে চলে যাব। বাঘ ছামুতে এলে শালার জান লিব। ডাকাত এলে তাকে অ্যাই মারব লাঠি!

বলে, লাফিয়ে উঠে নিজের লাঠি দিয়ে আঘাত করেছিল একটা গাছের গুঁড়িতে। রাত্রির বন। আঘাতের ঠুই শব্দটা বিচিত্রভাবে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে গিয়ে অনেক—অনেক দূরে গিয়ে তবে যেন মিলিয়ে গিয়েছিল।

সকলে বলে উঠেছিল, হাঁ তো কি! সবাই যাব আমরা। মেয়েগুলান না হয়—

একটা মেয়ে বলেছিল, মর্ খালভরা! মেয়েগুলান থাকবেক পড়ে? ক্যানে রে মুখপোড়া! আর একজন বলেছিল, আমরা কি খোঁড়া নাকি? না, তুর কাঁধে চড়ে যাব বলেছি? মরণ! আমরা সবাই যাব। যদি সাতে সাতে চলতে না পারি তো ফেলে চসে যাস্।

এতক্ষণে কথা বলেছিল অর্জুন। বলেছিল, হাঁ। গেলে সবাই যাবেক। তাই চল্। একসাতে অনেক খেল হ'ল রে ভাই, আজকের খেলাটাও হোকও।

—সাবাস, সাবাস, সাবাস! একসঙ্গে বলে উঠেছিল সকলে।

—একটি কথা কিন্তু—

—বল।

—পা ছুটবেক, চোখ দেখবেক, ইশারা লিবেক কিন্তু কথা লয়। বন-

রাতের বন। বাঘ শিকার মনে রাখতে হবেক। শালা বাঘ রইছে বনে। আবতুস শোভান।

সবাই কথা বলে উঠল একসঙ্গে, কিন্তু চাপা গলায়, ঠিক বলেছ। চাপা গলার তুটি কথা আশ্চর্য রকমের ভারি এবং ভয়ঙ্কর মনে হ'ল ওদের কাছেই। তার সঙ্গে মিলল মৃত্থু বাতাসে আন্দোলিত বনের পাতার খস খস শব্দ।

অর্জুন বললে, মদ খেয়ে লে। কিন্তুক বেশি নয়। বাকি ফেলে দে। মদ খেয়ে মাতাল হলে হবেক না। তার পরেতে—

অনেক ভেবে রণনিপুণ সেনাপতির মত বনের জোয়ানেরা নিজেদের ছোট বাহিনীকে সাজালে।

শুধুমাত্র কৌপীন পরে কোমরে ছোট ধারালো বগিদা গুঁজলে ঘোঁতন আর ছিদাম। পাতলা ছিপছিপে যোল-সতের বছরের তুই কিশোর। তারা গাছে চড়ে বাঁদরের মত। ঘন গাছ যেখানে সেখানে তারা মাটিতে নামে না, গাছের ডালে ডালে চলে যায় স্বচ্ছন্দে।

ঝুমঝুমি বললে, সর্বাঙ্গে নিমের তেল মাখ্‌। তার সঙ্গে আমার ঝুলিতে রইছে শেকড় পাতা। বিছে পোকা-মাকড়ের ওষুদ। বেটে মিশায়ে লে তেলের সঙ্গে। গন্ধ উঠবেক। সে গন্ধে পোকামাকড় পালাবে বিশ হাত। তবে ভাই, ইয়ের পরে গায়ের ছাল উঠে যাবেক একপুক মরামাসের মত। ঘা হবে নাই, ভয় নাই। সাপও ঘেঁষবে নাই।

—বহুৎ আচ্ছা। ছাল উঠলে শালা ফরসা হবেক রঙ। লে রে, মাখ্‌। ছিদাম আর ঘোঁতন আগে আগে চলবে। বড় গাছে চড়বে। চড়ে বনের চারিদিক দেখে বলবে কোথাও আছে কি না। আগুন কিংবা মশাল। কান পেতে শুনবে, আওয়াজ শুনবে। বলবে। ততক্ষণে ছিদাম আরও কতকটা এগিয়ে অন্য গাছে চড়ে দেখবে। স্থির হ'ল নিরাপদ দেখলে লক্ষ্মীপেঁচার প্রহর ঘোষণার মত ডাক ডাকবে। বিপদ দেখলে ডাকবে কালপেঁচার ডাক।

নিচে চলবে তেইশ জোয়ান আর ছ জন মেয়ে। আট জন তীর ধনুকধারী প্রথম, তারপর লাঠিয়াল দশ জন। তারপর তিন জন তলোয়ারধারী; তারপর নিজে অর্জুন, তার পাশে ঝুমঝুমি। তার পিছনে পাঁচ জন মেয়ে, তাদের কোমরে পিছন দিকে গোঁজা বগিদা, বাঁ হাতে বাঘনখী। ডান হাতে সড়কির মত হালকা বল্লম। তার পিছনে

বাকি লাঠির বোঝা মাথায় গণ্ডারের মতই বলশালী হাঁদা। আলো নয়। মশাল আছে। সে লাঠির বোঝার সঙ্গে রইল। বোঝার সঙ্গে আরও রইল মেলায়-কেনা জিনিস।

দেবীপক্ষের দশমীর রাত্রি। রওনা হতে ওদের এক প্রহর হয়ে গেল। চাঁদ পূর্বদিকে আকাশের মাঝখান পার হয়ে খানিক উপরে উঠেছে। আকাশ নীল। একেবারে ঝকঝক করছে। তারা উঠেছে। তলোয়ার-ধারী কালপুরুষ সামনে, চাঁদের ওপারে খানিকটা পশ্চিম দিকে। তা বাঁয়ে রেখে তাদের যেতে হবে দক্ষিণ মুখে। তারপর পশ্চিম মুখে। পথ নেই। মানুষ বড় চলে না এদিকে। এই তো ক্রোশ খানেক ক্রোশ দেড়েক পাশে সড়ক চলে গিয়েছে পুরী পর্যন্ত। ঘাটাল চন্দ্রকোণা হয়ে বীণপুরকে ডাইনে রেখে দক্ষিণ মুখে ঘুরে ঝাড়গ্রাম হয়ে চলে গিয়েছে। সুবর্ণরেখা পার হয়ে নয়াগ্রাম হয়ে সেই দাঁতনের রাস্তায় মিশেছে। মাঝে মাঝে ছোট সড়ক বেরিয়ে এদিক ওদিক গিয়েছে। যাত্রীরা এই পথে চলে। নবাবী ফৌজ, বর্গী ফৌজও এই পথেই চলে। মধ্যে-মাঝে এ ওর চোখে ধুলো দিতে বনে ঢোকে বটে, কিন্তু সে আগে থেকেই বোঝা যায়। এবং তারাও যেমন তেমন পথ একটা রাখে কাছাকাছি। এটা ছত্রিশ জাতিয়াদের নিজস্ব পথ। এ পথের ইশারা ওরাই জানে। কোথাও গাছে, কোথাও পাথরে, কোথাও ঝোপে নিশানা দেওয়া আছে। দিনে তো দেখা যায়ই— রাত্রেও তাদের হুঁশিয়ার চোখে অনেক কিছু পড়ে। অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষের রাত্রেও পড়ে, সাদা ধবধবে খড়িমাটির মোটা চাঁই। ওগুলো এক রশি দু রশি অন্তর রাখা আছে। আজকের রাত্রি অন্ধকার রাত্রি অন্ধকার নয়। আকাশে চাঁদ। বনের ভিতরটা গাছের মাথার ঢাকা সত্ত্বেও আবছা আভা ফুটেছে। গাছের ডাল পাতার ফাঁক দিয়ে লম্বা লম্বা ফালির মত জ্যোৎস্না এসে মাটিতে পড়েছে। গাছের গুঁড়িতে পড়েছে চুনের দাগের মত।

উদ্যোগ করতে প্রথম প্রহরের শেয়াল ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল অর্জুন, জয় মা! জয় কিষণজী! চল। শিয়াল যা-তা নয়, শিয়াল শিবা। শিবার ডাক। ইশারা। চল। ওরা একত্রিশ জন চলেছে। একত্রিশ জনের পায়ের শব্দ উঠছে শুধু। আর বনে পাতা নড়ার শব্দ। আর মধ্যে-মধ্যে একটু আগে বনের গাছ থেকে লক্ষ্মী-পেঁচার ডাক—কুক্ কুক্ কুক্। কুক্ কুক্ কুক্। ওরা গাছতলা পৌঁছুতে

পৌঁছুতে ঝুপ করে গাছ থেকে নেমে পড়ছে হয় ঘোঁতন, নয় ছিদাম। কেউ জিজ্ঞাসা করছে, কি রে ?

সে বলছে, কোথা পাবা ? উসব গুল।

ওরা চলেছে আবার। আবার সামনে কোন গাছ থেকে শব্দ উঠেছে— কুক্ কুক্ কুক্।

কিছুক্ষণের মধ্যেই থমথমে নীরবতা কেটে গেল। দুটো চারটে ফিসফিসানি কথা, হাসি, গাছের পাতার খসখসানির সঙ্গে মিশতে লাগল।

বনের মধ্যে জন্তুরা ইশারা দিচ্ছে। ঝিঁঝিঁরা গানের জাল বুনছে মধ্যে-মধ্যে খেঁকশিয়াল খ্যা-খ্যা-খ্যা-খ্যা শব্দে ডেকে উঠছে। রাত্রিচর পাখি ডাকছে—যেন হাসছে। কখনও পাশের জঙ্গল নাড়া দিয়ে শেয়াল বা খরগোশ কি সজারু ছুটে পালাচ্ছে।

মানুষ থাকলে এরা সাড়া দেয় না। এক ঝিঁঝিঁ ছাড়া সবাই চুপ করে থাকে। একটা মেয়ে, নাম আতুরী। সে ফিসফিস করে বললে, আং! মিছে মদগুলান ফেলে দিলে লো! টুকচা হলে কেমুন হ'ত!

অর্জুন বললে মৃদু স্বরে, কাল তোকে মদের জালাতে ডুবায়ে দিব রে।

আবার চলল তারা কতক্ষণ চলেছে ঠিক নেই। তবে অনেকক্ষণ মনে হচ্ছে। অনেকক্ষণ, কিন্তু পথের নিশানায় তো বেশি মনে হচ্ছে না। পাঁচ ক্রোশ পথ, এখনও দু ক্রোশ আসে নি। দু ক্রোশের মাথায় একটা সড়ক চলে গেছে পূব-পশ্চিমে চন্দনগড় থেকে বেরিয়ে পুরীর বড় সড়কের সঙ্গে মিশে, আবার একটা ফ্যাঁকড়া চলে গিয়েছে বনের ভিতর দিয়ে। গিধনী পাশে পড়ে থাকবে, বীণপুর আর এক পাশে। তারপর দুটো ফ্যাঁকড়া। একটা গিয়েছে পশ্চিমে ধলভূম মানভূম। অন্যটা উত্তর মুখে বাঁকুড়া। সে সড়ক এখনও পার হয় নি তারা। তবে এলো বলে ; আর দেরি নেই।

হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দের তীর যেন সকলের কানের পাশ দিয়ে সর্বাঙ্গ শিউরে দিয়ে ছুটে চলে গেল—ক্যা—ক্যা—ক্যা।

কালপেঁচার ডাক। দলটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সকলের হাতিয়ার ধরা হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠল। একটা মেয়ে বলে উঠল, বাবা টেঃ! চাপা গলায় শব্দ হ'ল, চু—প!

আর পায়ের শব্দ উঠছে না। বনে পাতার খসখসান শব্দ উঠছে শুধু। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। জন্তুর শব্দ ? কই ?

দ্রুত এগিয়ে যেতে যেতে অর্জুন বললে, মেয়েরা গাছে চড়ে যা।

—হাঁ। আর সব তৈয়ার থাক্।

সে গিয়ে গাছের তলায় দাঁড়াল। পেঁচাটা এখনও ডাকছে।

একি! মানুষের সাড়া?

সড়ক দিয়ে পথ চলছে রাহীর দল। বেহারার বুলি শোনা যাচ্ছে। একি! আলো? ও। মশাল ফুঁ দিয়ে জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছে। কিন্তু? যাদের সঙ্গে বেহারা পাল্কি বা ডুলি আছে তারা মশাল নিভিয়ে দিচ্ছে কেন? মধ্যে-মধ্যে জ্বালছে।

ঝুপ করে নামল ছিদাম।

—কি?

—জনা বিশ লোক। ডুলি সঙ্গে রয়েছে দু-তিনখানা না ক খানা বোললাম। মশাল জ্বেলেই নিভিয়ে দিলেক। আরও একটো আলো সদ্দার ওই বাঁকটোর মোড়ে। বুয়েছ, আমি গাছে উঠেছি, ইদিক থেকে একটো লোক ছ্যাবাজীর মতন সাঁ করে চলে গেল। আমি উপরে উঠে দেখলাম বাঁকের মোড়ে আলোর ছটা। দেখছি, এমন সময় দপ্ করে নিবে গেল; তবে জ্যোস্না রয়েছে তো! লোক আছে। বেশ জনা কতক।

—ওঠ, আবার গাছে ওঠ। দেখ।

ছিদাম মুহূর্তে একটি ছোট লাফ দিয়ে একটি ডাল ধরে তুলে উপরে উঠে গেল।

সেই মুহূর্তে ওই বাঁকটায় একটা পৈশাচিক চিৎকারে রাত্রি চমকে উঠল।

—সদ্দার ডাকাত! ডুলির দলটাকে মারছে।

মনের উত্তেজনায় ছুটে বন থেকে বেরিয়ে এসে সড়কের উপর দাঁড়াল। রশি দেড়েক দূরে চিৎকার উঠছে। হা-হা-হা চিৎকার। উল্লাসের পৈশাচিক চিৎকার।

দপ-দপ করে মশাল জ্বলে উঠছে। আগুনওয়ালা মশালে ফুঁ দিয়ে জ্বালছে মশাল, ডাকাতেরা। শিকার পেয়েছে তারা।

কে তার অঙ্গস্পর্শ করলে? কে? ঝুমঝুমি!

ঝুমঝুমি বললে, ভিতরে ঢোক। দেখতে পাবে।

—না, তু গাছে ওঠ্ গিয়ে। যা। আমাকে ডুলি বাঁচাতে হবেক।

—তা হলে আমি তুমার সাতে থাকব।

—ঝুমঝুমি! কথা সে বলছে, কিন্তু তাকিয়ে আছে সে ওই দিকে।

মশালের লাল আলোয় সব দেখতে পাচ্ছে। তিনটে ডুলি। সঙ্গে জন আষ্টেক পাহারার লোক। আট জনকে চল্লিশ জন আক্রমণ করেছে। বন্দুকের শব্দ উঠল। পাহারাদারদের হাতের বন্দুক গর্জে উঠল। ওদিকে পড়ল জন কয়েক ডাকাত। তারপর বাকি ডাকাতেরা ছুটে এল চিৎকার করে। লাঠিতে তলোয়ারে চলছে লড়াই। কেহারারা পালাচ্ছে।

চিৎকার উঠল একস্মাৎ। নারীকণ্ঠের চিৎকার।

চমকে উঠল অর্জুন—ভগবান! রক্ষা কর—ভগবান!

একটা লোক ঘোড়ায় চড়ে বন থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসছে। কজনে ডুলির ভিতর থেকে মেয়েদের টেনে বার করছে। অর্জুনের বুকের ভিতরটায় কি যেন তাকে ঠেলছে। সে ঝুমঝুমির হাত ধরে টেনে বনের ভিতর ঢুকে বলল, তৈয়ার হো যা রে। তৈয়ার। তীর ধনুক। ওরে, তীর ধনুক। সবাই নে। চল্, বনে বনে ছুটে চল্। দু ভাগ হয়ে। এক ভাগ এদিক, এক ভাগ ওদিক। মশাল জ্বলছে। চাঁদের আলো রয়েছে। গাছের আড়াল থেকে প্রথমে তীর, তারপর হাতিয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবেক। গণ্ডার, পেথমেই আমি আর রামু দু পাশ থেকে ঘোড়াগুলাকে লিব।

বুঝলি? ওই—ওই সদ্দার! ওই শোভান! হুঁশিয়ার! যা যা যা। দু ভাগ। বাঘের মতন চুপি চুপি—

ওদিকে তখন হা হা চিৎকারের সঙ্গে মানুষের মরণ-আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছে। মশালের আলোয় ভয়াল হয়েছে রাত্রি এবং বন। আট জন রক্ষকই পড়েছে। ডাকাতদেরও ক জন। গুলিতেই প্রথম পড়েছে চার-পাঁচ জন। সে অর্জুন দেখেছে।

ডুলির ভিতর থেকে টেনে বের করেছে তিনটি মেয়েকে। চেপে ধরেছে তাদের হাত। ঘোড়ায় চড়ে শোভান হাসছে।

হঠাৎ দুটি তীর দু দিক থেকে এসে বিঁধল শোভানকে। একটি কাঁধে, একটি বুকে। সে চিৎকার করে উঠল—আ! দুশমন!

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা তীর কপালে। তার সঙ্গে আরও কজন ডাকাত বিদ্ধ হয়েছে তীরে। চিৎকার উঠল—বুতাও, মশাল বুতাও রে। জলদি।

মাটির উপর জ্বলন্ত মশাল গুঁজে দিল তারা।

তীর আবার এক ঝাঁক এসে পড়েছে দু দিক থেকে। ডাকাতেরা

চিৎকার করে হল্লা করে উঠল, দুশমন! কিন্তু কই? কোন্ দিকে?

এক জন বলছে, সর্দার পড়ে গিয়েছে। খতম।

তারপরই আবার এসে পড়ল সড়কি। পঁচিশ জন জোয়ান লাঠি তলোয়ার নিয়ে উন্মত্ত তাণ্ডবে প্রেতের মত চিৎকার করে দু পাশে বন থেকে বেরিয়ে এসে পড়ল তাদের উপর। তাদের সঙ্গে একটা কালো ছিপছিপে মেয়ে। হাতে তলোয়ার।

অনেক ডাকাত পড়েছে। প্রায় বাইশ-চব্বিশ জন। প্রথম রক্ষকদের গুলিতে এবং তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে আট জন। আর আকস্মিক এই আক্রমণে পনর-ষোল জন। পাইকদের লাঠি বড় সাংঘাতিক। মাথা দু ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। তার উপর নায়ক পড়েছে। তারা ছুটো পালাল। পালাল প্রায় কুড়ি জন।

গণ্ডার কজনকে নিয়ে চিৎকার করতে করতে তাদের অনুসরণ করলে।

—গণ্ডার, ফিরে আয়। গণ্ডার—

গণ্ডার এক জনের চুলের মুঠো ধরে টেনে এনে সামনে ফেলে দিলে।

ডুলিযাত্রী মেয়ে তিনটি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপছে এখনও। অর্জুন তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হাত জোড় করলে। এরা যেন রাজার ঘরের মেয়ে। তার মায়ের মত। একজনের বয়স বেশী।

তিনি কি বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বলা হ'ল না। মেয়ের গলার একটা ক্রুদ্ধ অথচ শঙ্কিত চিৎকারে চমকে উঠলেন। অর্জুন চমকে উঠে চিৎকার করলে, ঝুমঝুমি!

ঝুমঝুমি উপুড় হয়ে পড়েছে একটা ডাকাতের উপর।

—ঝুমঝুমি!

ঝুমঝুমি উঠেছে। সে উঠল। তার সর্বাঙ্গ-রক্তাক্ত হয়ে গেছে। বাঁ হাতের বাঘনখে ডাকাতটায় পেট চিরে তার নাড়িভুঁড়ি তুলে এনেছে। লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে সকলের অজ্ঞাতসারে তলোয়ার তুলেছিল। ঝুমঝুমিও পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘনখ বিঁধে দিয়েছে।

সে অর্জুনের পাশে এসে দাঁড়াল।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে?

বয়স্কা মহিলা যিনি,—আমরা মা, মানুষ বটি বনের। যেতে যেতে দেখলম আপনাদের বিপদ, ছুটে এলম।

—তোমরা ডাকাত নও?

—না মা। এখন ডাকাত লই। মিছা বলব ক্যানে—হাট-টাট লুট করি, যেমন করে পাইকরা।

—তোমরা পাইক?

—হঁ। পাইক বটি। বটি বইকি।

—তুমি বাগ্দী?

—না। আমি ছত্রি।

—ছত্রি?

—হঁ। এই দেখেন পৈতে। তাতেই তো ছুটে এলম মা। গুরু বলেছে, ছত্রির এই ধরম।

ঠিক এই সময়ে একটা মশাল জ্বেলে নিয়ে এল গণ্ডার—সর্দ্দার!

—হঁ—

—যা আছে লিয়ে লি ডাকাতগুলার? তরোয়াল, ঢাল, সড়কি, বন্দুক—

গণ্ডারের কথা ঢাকা দিয়ে মেয়েটি তীক্ষ্ণ বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ছত্রি?

বিস্ময়ের আর অবধি রইল না অর্জুনের। সে মুখ তুলে আরও বিস্মিত, বিস্মিত কেন, স্তম্ভিত হয়ে গেল। একি মহিমা! এ কে!

—তুমি ছত্রি?

—হাঁ মা।

—তোমার বাবার নাম কি? কে তোমার বাবা?

—আমার বাবার নাম রাজা মাধব সিং। আমি তাকে দেখি নাই। বনেই আমার জন্ম। বাবা যখন মরে আমি তখুন মায়ের গভ্যে ছিলম। আমার দাদো আমার মাকে লিয়ে পালিয়েছিল। লইলে মায়ের সঙ্গে আমাকেও মেরে ফেলাতো তাহলে।

—হাঁ বাবা। ফেলত সে রাক্ষসী। আজকের কথা ভাবত না। হাসলেন।

অর্জুন বললে, গুরু বললে, অর্জুন, আজ রেতেই যাও। কাল একাদশী। মাকে বল গা একটি কথা। চন্দনগড়ের বিপদ। আর

শুধায়ো তোমার পরিচয়। বলো, গুরু বলতে বলেছে। সময় হয়েছে। আমি সব জানি না।

—হয়েছে বাবা। সময় হয়েছে। রুক্মিণীকে বলতে হবে না। আমি বলব। আমি বলব সব কথা। কিন্তু আর দেরি করো না বাবা। চল। ডাকাতরা আবার তো দল বেঁধে ফিরতে পারে।

গণ্ডার বললে, হাঁ মাঠাকরুণ। এক বেটাকে ধরেছিলাম। তাকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে সব খবর লিয়েছি। শোভানের বড় দল গিয়েছে লালতে হাটের দশুমীর মেলা লুটতে। আর শোভান নিজে এখানে ছিল, তোমরা পালিয়ে যেছ কোন কুটুম বাড়ি সেই খবর পেয়ে। তোমাদের বেহারাদের মধ্যে একজনা গুপ্তচর ছিল মা।

—শোভানের মুণ্ডুটা আমাকে এনে দিতে পার?

অর্জুন নিজে গিয়ে মুণ্ডুটা কেটে নিলে। সেটা তুলে আনলে ঝুমঝুমি

—লাও মা।

—এটি?

—উ আমার বটে মা।

—তোমার?

—হঁা মা, আমার।

—হে ভগবান! চল বাবা—চল।

—চড় মা ডুলিতে।

—বেহারা তো নেই।

—আমরা পঁচিশ মরদ রয়েছি! বারো জনায় তিন ডুলি হৈ হৈ করে লিয়ে যাব।

—দাঁড়াও বাবা, ভাবি।

—কি ভাববে মা?

—চন্দনগড় যাব, না রুক্মিণীর কাছে গিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়াব!

—আমার মাকে তুমি জান মা?

—জানি।

—আমার বাবাকে? তিনি সত্যিই রাজা ছিল?

—হাঁ। চন্দনগড়ের রাজা মাধব সিং ছিলেন তোমার বাবা।

—চন্দনগড়ের রাজা মাধব সিং আমার বাবা!

—হাঁ। তুমিই চন্দনগড়ের রাজা। তোমার মা শুক্লী রাজপুতের মেয়ে। শুক্লীরা পৈতেহারা, তাই তাদের মেয়ে বিয়ে করেছিল বলে

আমার সহ্য হয় নি। ভেবেছিলাম শ্বশুর বংশের জাত ধর্ম গেল। তাকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু—

অবাক হয়ে শুনছিল অর্জুন। তার গা ঘেঁষে ঝুমঝুমি। তার চারিপাশে সকলে।

তিনি বললেন, ভগবান সাক্ষী, তাঁকে খুন করতে আমি চাই নি। না, চাই নি। কিন্তু, আমার ভাই, বিশ্বাসঘাতক ভাই, পিশাচ ভাই মীর হবিবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করেছিল এই বিজয়া দশমীর দিন। তারপর—যখন হয়ে গেল—তখন আমি বলেছিলাম, তা হলে রুক্মিণীকেও মেরে ফেল। নইলে ওর গর্ভের সন্তান একদিন গদী চাইবে। আমরা আরও দুই সতীন ছিলাম। আমার সন্তান হয় নি। সতীনের ওই মেয়ে। বিধবা। আজ এসেছে শাস্তি। মীর হবিব চেয়েছে চন্দনগড়ের দুই মেয়ে। রাজা মাধব সিং-এর বিধবা মেয়েকে আর সুচেত সিং-এর মেয়েকে। আমি ওদের নিয়ে পালাচ্ছিলাম। দূর দেশে চলে যাব। সুচেত সিং শঙ্করী মায়ের ওখানে গিয়েছে। আর সেই অবসরে পালিয়েছি। পথে এই বিপদ। তুমি কোথা হতে এসে বাঁচালে। তাই ভাবছি, চন্দনগড় যাব, না, তোমার সঙ্গে যাব।

হাত জোড় করে অর্জুন বললে, আমার সঙ্গে চল মা। চন্দনগড়ে বিপদ হবে। ওখানে তা হবে না মা। আমরা বেঁচে থাকতে হবে না।

—তোমার দিদি উনি, প্রণাম কর। তোমার থেকে ক'মাসের বড়।

—দিদি!

অর্জুন মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। এত সুন্দর দিদি! এত রূপ!

—আর ওই আমার ভাইঝি। ওরে হিঙ্গন, তুই প্রণাম কর্।

ঝুমঝুমি অর্জুনের গা ঘেঁষে যেন তার অঙ্গের সঙ্গে মিশে গিয়ে দাঁড়াতে চাইলে।

ডুলি উঠল। অর্জুন বললে হুঁশিয়ারির সঙ্গে, তবে আর ভয় নাই। ওরা আর আসবে না। মশাল জ্বাল।

মশাল জ্বলল।

নয়

দু বছর পর।

ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড়ের কিষণজীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ছিলেন রত্নাদেবী। মাধব সিং-এর প্রথমা মহিষী। মন্দিরের দাওয়ায় বসেছিল রুক্মিণী। তার দুই পাশে আর দুটি ছত্রি তরুণী। মাধব সিং-এর দ্বিতীয় মহিষীর বিধবা কন্যা ভবানীবাঈ আর সুচেত সিং-এর কন্যা কুমারী হিঙ্গনবাঈ। তারা মালা গাঁথছিল।

জঙ্গলগড়কে আর সে জঙ্গলগড় বলে চেনা যায় না। দু বছরে তার বহু পরিবর্তন হয়েছে। কিষণজীর মন্দির আর কাঠের নয়, পাথর দিয়ে কাদায় গেঁথে প্রশস্ত চতুষ্কোণ চত্বরের উপর চারিপাশে অলিন্দ-ঘেরা মন্দির হয়েছে। সামনের অঙ্গন সমান করে পাথর বসিয়ে বাঁধানো হয়েছে এখন। চারিপাশে পাথরে গাঁথা ছোট পাঁচিল, প্রবেশপথের দুই পাশে দুটি থাম।

আরও কয়েকখানি পাথরে গাঁথা বাড়ি তৈরি হয়েছে। অলিন্দ-ঘেরা একখানি সুপ্রশস্ত বাড়ি, তার চারিপাশে উঁচু দেওয়াল। প্রবেশ-দরজাটি সুন্দর। বাড়িটির নাম মাতাজী মহল। এই বাড়িতে থাকেন রত্নাদেবী, ভবানীবাঈ, হিঙ্গন এবং রুক্মিণীদেবী। রুক্মিণী এখন আর শুধু রুক্মিণী নয়, এখন তার নাম রুক্মিণীবাঈ অথবা রুক্মিণীদেবী, মাতাজী রুক্মিণীদেবী। রত্নাদেবী রানীসাহেবা রাজমাতা। দরজার সামনে একজন পাইক একটা বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পাইকও আর সে পাইক নয়, তার মাথায় পাগড়ি, গায়ে একটা কুর্তা, পরনে মালসাঁট মেরে কাপড় পরা। চোখে তার সম্ভ্রম, কান তার সজাগ।

মন্দিরপ্রাঙ্গণের পাশে আর একখানি সুদৃশ্য বাড়ি, তার ফটকেও একজন পাইক। রাজার মহল। তার পাশেই পাথরের একটি নাটমন্দিরের মত খোলা প্রশস্ত স্থান। একদিকে তার প্রশস্ত বেদী। জঙ্গলগড়ের দরবার। সামনে পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত একটি উঠান। চারি-পাশে নতুন লাগানো শালগাছের ঘের। পুরনো জঙ্গলগড়ের রুক্মিণী মায়ের আগুনে বলে চেনাই যায় না।

শুধু এই থানটি নয়, গোটা গড় বারো পাহাড়ের চেহারা পাল্টেছে।

এই মহলে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালে প্রথমেই নজরে পড়বে পাহাড়-গুলির মাঝবরাবর পাহাড়ের গায়ের জঙ্গলের সবুজের বুক চিরে একটি লম্বা গেরুয়া চাদরের বেড়। যেন গোল পাথরের বুকে পৈতের সাদা দাগের মত এঁকে দিয়েছে। গোটা চাদরটা অবশ্য চোখে পড়ে না। কোথাও বাঁকের মোড়ে গাছের আড়ালে সবটাই ঢাকা পড়েছে, কোথাও সরু ফালির মত দেখা যায়। তবে একটু অবহিত হয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালেই বুঝতে পারা যায় যে একটি প্রশস্ত রাস্তা বারো পাহাড়ের বুকের ওপর তৈরি করে চলাচল সুগম করা হয়েছে। পাহাড়ে পাহাড়ে সংযোগস্থলের অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গাগুলিতে শক্ত প্রশস্ত পাথরের দেওয়াল হয়েছে। তার উপর পাইকরা সড়কি, তীর, ধনুক, বন্দুক নিয়ে পাহারা দেয়। যমদুয়ারে বড় ফটক তৈরি হয়েছে।

পাইকদের বাড়িঘরেরও উন্নতি হয়েছে। কয়েকটি পাড়াতে ভাগ করে চার-পাঁচটি পাহাড় নিয়ে এখন তাদের বাস। রাস্তা হয়েছে। সব থেকে পরিবর্তন হয়েছে নিচের সেই স্যাঁতসেঁতে জবজবে জাম ও জঙ্গলের। সেখানকার জমিতে জঙ্গল সাফ হয়েছে। মাটি এখন শুকনো, তার উপর ক্ষেত হয়েছে। নিচের দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানে অনেক গরু চরছে, ঘোড়া চরছে।

পাইকদের মধ্যে থেকে এখন সওয়ার তৈরি হয়েছে একদল। যমদুয়ার থেকে বেরিয়ে বনের মধ্য দিয়ে অচিহ্নিত পথটাও আর বনের সঙ্গে মিশে নেই। শুধু সংকেতে আর ইশারাতেই তাকে চিনতে হয় না। একটি সুগম চিহ্নিত সড়ক হয়ে সে গিয়ে মিশেছে দক্ষিণ দিকে বড় সড়কের সঙ্গে, উত্তর দিকে যেখানে শোভান খাঁ মারা পড়েছিল সেখানকার রাস্তার সঙ্গে। এই দিকটাই যেন মূল পথ হয়েছে। এই পথ ধরেই যেতে হয় চন্দনগড়। এখানে একটা গম্বুজের মত আছে যেখানে পাইক মোতায়েন থাকে।

জঙ্গলগড়ে বন্দুক এসেছে, বারুদ এসেছে। ঘোড়া এসেছে, আস্তাবল হয়েছে। মানুষের জন্য ক্ষেত হয়েছে, খামার হয়েছে। রত্নাদেবী একালে বৈদ্য এনেছেন। রুক্মিণী রত্নাদেবীর অনুরোধে এবং গুরুত্ব বুঝে মরণজ্বরের ওষুধের গাছ তাঁকে চিনিয়েছেন। বৈদ্য চিকিৎসা করে। ব্রাহ্মণ এসেছে, সে পূজা করে।

এ সবই হয়েছে এই আশ্চর্য মহিমময়ী রত্নাদেবীর বুদ্ধিতে, তাঁর চালনায়। দু বছর আগে যে দশমীর রাত্রিশেষে অর্জুন তার দল নিয়ে

এঁদের উদ্ধার করে ডুলিতে করে জঙ্গলগড়ে নিয়ে আসে, তার তিন মাসের মধ্যেই দেশে এসেছিল বর্গী। বর্গীরা এসে আক্রমণ করেছিল চন্দনগড়। এখান থেকে একশো পাইক নিয়ে ছুটে গিয়েছিল অর্জুন। কিন্তু সে কিছু করতে পারে নি: চন্দনগড় রক্ষা হয় নি! ব্যর্থ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিল কিন্তু বর্গীরা তার পিছন ধরে জঙ্গলগড়ের সন্ধান জেনেছিল। ওদিকে চন্দনগড়ের অন্তঃপুরে সরন্দাজ খাঁর দুই ছেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে ভবানীবাঈ এবং হিঙ্গনবাঈ-এর সন্ধান না পেয়ে খুঁজেছিল কোথায় গেল তারা।

আবদুস শোভানের হত্যার পর খবরটা আর চাপা ছিল না। চারিদিকে জঙ্গলগড়ে অর্জুন সিং-এর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। আহত ডাকাতরা যারা কোনরকমে বেঁচেছিল তারা অর্জুন সিং নামটা শুনেছিল। অর্জুন সব আহতদের মেরে ফেলবার হুকুম দিয়েছিল গণ্ডারকে। গণ্ডার লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে মেরেছিল। তলোয়ার তার পছন্দ নয়। বাকি সে কাউকে রাখে নি বলেই তার ধারণা। কিন্তু প্রাণের ভয়ে জঙ্গলের মধ্যে কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করেও দু-তিন জন মরার ভান করে বেঁচে ছিল। এবং যারা পালিয়েছিল তারাও কিছুটা খবর জেনেছিল। অর্জুন সিং, একটা আশ্চর্য কালো মেয়ে আর গণ্ডার। এই তিনটে কথা।

একজন বেহারা জঙ্গলগড়ের নাম শুনেছিল। কথা কটি ছড়াতে বাকি থাকে নি। সরন্দাজ খাঁর ছেলেরা পিতৃহত্যার প্রতিহিংসায় এবং নারীলালসায় ঘুরছিল জঙ্গলগড়ের দিকে। অর্জুন একশো পাইকের মধ্যে ষাট জনকে নিয়ে জঙ্গলগড়ে ঢোকে। তখনও তার আক্ষেপ, তার বিষণ্ণতা, তার বেদনাকে ঠেলে ফেলতে পারে নি। মুহ্যমান হয়েই ছিল। চন্দনগড়, তার বাবার রাজ্য চন্দনগড়, তার চন্দনগড় বর্গীরা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়েছে। তোপ দেগে উড়িয়েছে। নরনারীর উপর অত্যাচারের বাকি রাখে নি। সে বাইরে থেকে গিয়ে বার বার পিছন দিক থেকে বর্গীদের আক্রমণ করেছে। বর্গী হত্যা করেছে তারা অনেক। তার দলের গেছে চল্লিশ জন, তারা মেরেছে অন্তত একশো জন। তাদের বন্দুক ছিল না। বন্দুক থাকলে আরও বেশি হত্যা করতে পারত। কিন্তু তাতেই বা কি হ'ত? চন্দনগড় রাখবার শক্তি তো তার ছিল না। সে শঙ্করীমায়ের ভক্তির বলেও সম্ভবপর হয় নি। সে নিজেও আহত হয়েছিল। একটা তীর বিঁধেছিল উরুতে। একটা

চোট খেয়েছিল বাহুতে। অবশ্য একটা আঁচড়। সে মুহ্যমান হয়ে বসেছিল, সেবা করেছিল অপরাজিতা। সে তখন অপরাজিতাই বলত ঝুমঝুমিকে। অবশ্য আদর করে ঝুমঝুম বলে ডাকা ছাড়ে নি।

এরই মধ্যে খবর এসেছিল। এনেছিল ছিদাম। সে প্রায় গাছে গাছে চলে এসেছে। মাটির উপর দিয়ে আসে নি। খবর এনেছিল, বর্গীরা চন্দনগড় থেকে মেদিনীপুরের দিকে চলে গেল বটে কিন্তু সরন্দাজ খাঁর ছেলেরা পাঁচশো সিপাহী নিয়ে ঘুরছে। ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড়ে আছে চন্দনগড়ের দুই বেটি। তার সঙ্গে আছে রত্নাবাঈ। এখন তারা তিন জনকেই নিয়ে যাবে আর জঙ্গলগড় ধ্বংস করে দেবে।

লাফ দিয়ে উঠে বেরিয়ে এসেছিল অর্জুন।

ঝুমঝুমি বলেছিল, আস্তে। এত জোরে না।

—জোরে না ? ঝুমঝুমি ?

—না। ঘায়ের মুখগুলো ফাটবেক। চল, আমি সাতে যাব।

—ঝুমঝুমি !

—হাঁ !

—কি করব ?

—গুরু যা বলেছে—লড়বে। তুমি ছত্রি।

বাইরে তখন কিষণজীর মন্দিরের সামনে সর্দাররা এসে জুটেছে। সর্দারের গদীর উপর গম্ভীর মুখে বসে আছে দাদো দলু। সামনে ভৈরব, গোবর্ধন, গণেশ। তাদের পরে আর কয়েকজন। বাকিরা সব ঘিরে উৎকণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

মন্দিরের দাওয়ায় বসে রুক্মিণী। তার পাশে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রত্নাবাঈ। অর্জুনের রানীমাতাজী। স্থির গম্ভীর। এসে অবধি তিনি নির্জনেই থাকতেন। ওই দুটি মেয়ে হিঙ্গন আর ভবানীকে নিয়ে বসে থাকতেন, পূজো করতেন। রুক্মিণী এবং অর্জুন তাঁর কাছে যেত। অর্জুনের সঙ্গে যেত ঝুমঝুমি। এ কয়েক মাসে এই বিচিত্র মহিমময়ীকে মনে হ'ত যেন আগুনের স্তূপ, পাতলা ছাইয়ের আবরণের মধ্যে ক্রমশ ঢেকে ফেলছেন নিজেকে। আগুনে ছাই আপনি পড়ে। ইনি যেন নিজে ইচ্ছে করে ফেলছেন। নিত্য সেই এক কথা। এবং সে এক কথা কেবল কটি কথা।

ভাল আছ রুক্মিণী ? ভাল আছ বাবা ? আমি ? ভালই আছি। বাবা। কোন দুঃখ নেই। বড় সম্মানে রেখেছ তোমরা। এত চুপচাপ ?

ভাবছি। কি ভাবছি? সবই কি নিজেই বুঝি? তবে ভাবছি নিজের জীবনের কথা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেন।

এই কথা কটি তিনি বলেছিলেন প্রথমদিন এসেই। তারপর সমানে বলেই যাচ্ছেন। সেদিন তাঁদের ডুলি নিয়ে অর্জুনের সাঙ্গোপাঙ্গরা যখন কিষণজীর মন্দিরের সামনে নামিয়েছিল, তখন মা, দাদো, অহল্যা দিদি বিস্ফারিত দৃষ্টি ও ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে বলেছিল, ওরে লুচ্চা, বদমাশ, কুলাঙ্গার, এ কি করলি? কোন্ বড় ঘরনা মেয়েদের লুটে আনলি! এ কি মহাপাপ করলি রে তু!

ডুলির কাপড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছিলেন রত্নাদেবী। বলেছিলেন, না, মহাপাপ ও করে নি রুক্মিণী, ও মহাপুণ্য করেছে। ওর বংশের নাম উজ্জ্বল করেছে। ছত্রির ছেলে ছত্রির কাজ করেছে। ও শয়তানের হাত থেকে ছত্রি মেয়ের ধরম রক্ষা করেছে। তার চেয়েও বড় পুণ্য রুক্মিণী, ও তার মাকে রক্ষা করেছে, বিধবা বহিনকে রক্ষা করেছে বিধর্মীর লাঞ্ছনার হাত থেকে।

ওদিক থেকে বিস্ফারিত চোখে এক পা এক পা করে যেন কোন ভয়ঙ্কর কিছুর দিকে এগিয়ে আসছিল দলু সর্দার। এদিকে স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়েছিল তার মা—রুক্মিণী দেবী।

ঈষৎ একটু তিলের মত এক তিল হাসি ফুটে উঠেছিল রত্নাবাঈয়ের ঠোঁটে মুখে। মনে হয়েছিল যেন ওই এক তিল হাসির মধ্যে কান্নার একটা সমুদ্র লুকানো আছে; সেটা অর্জুনের চোখেও ধরা পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন—চিনতে পারছ সর্দার? রুক্মিণী? আমি চন্দনগড়ের রাজা মাধব সিং-এর বড় রানী। তোমার সতীন। আমি রত্নাবাঈ।

অহল্যা কঠোর কণ্ঠে বলে উঠেছিল, তুই সর্বনাশী। তুই রাক্ষসী।

—হ্যাঁ, তা স্বীকার করছি আমি।

মা বলে উঠেছিল, পিসী! পিসী!

পিসী বারণ শুনবে কেন? সে বলেছিল, কি বলে এলি? কোন্ মুখে এলি? বেসরমী!

—পিসী। পিসী?

উনি হেসে বলেছিলেন, বেসরমী নই পিসী। রুক্মিণী তোমাকে পিসী বলছে, আমিও তোমাকে তাই বলছি। সরম আছে বলেই আজ এসেছি। অপরাধ স্বীকার করতে এসেছি। হ্যাঁ, অপরাধ আমার হয়েছে। কি বলে এসেছি? বলতে এসেছি রুক্মিণী বহিন, তুই

আমার সতীন। তুমি আমার বহিন, তুই সতী, রাজরানী আমারই মতন। তোর গর্ভের সন্তান আমারও সন্তান। নইলে এই বিপদে রাজা রাজা মাধব সিং-এর চরম সর্বনাশের সময় সে এল কেন, এল কোথা থেকে? মন বললে পূর্বপুরুষ পাঠিয়েছে তার বংশধরকে। সে আমাকে মা বললে। আমি তাকে সব বললাম, জিজ্ঞাসা করলাম এর পরেও আমি তোমার মা? সে বললে, হ্যাঁ, নিশ্চয়। মুখ উজ্জ্বল হ'ল। সেই উজ্জ্বল মুখে এখানে এসেছি।

বলতে এসেছি রুক্মিণী, তোর কাছে আমার অপরাধ হয়েছে। তোর ছেলে মাধব সিং-এর বংশের মান রেখেছে।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। অর্জুন কাঁদতে শুরু করেছিল। তার সঙ্গে ঝুমঝুমিও। মা এসে তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

দলু দুই হাত উপরে তুলে বলেছিল, জয় কিষণজী! হে ভগবান!

রুক্মিণীকে হাত ধরে তুলে উনি বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, এ ভবানী। মেঝলির ছোট বেটী। বিধবা। আর আমার ভাইঝি, সুচেতের বেটী হিঙ্গন। তারপর দলুকে বলেছিলেন, সর্দার, তোমাকে যদি বাপ বলি তুমি গোঁসা করবে?

দলু সর্দার কেঁদে ফেলেছিল। আবার হাত তুলে বলেছিল, ধন্য, আমি ধন্য হয়ে গেলাম মায়ী। আমার হারানো ইজ্জত আবার ফিরে পেলাম। হায়, হায়, আজ যদি এখানে বামুন থাকত তবে তোমাদিগে সাক্ষী করে আমি ফের পৈতে নিতাম।

রানী রত্নাবাঈ বলেছিলেন, তার জন্যে আক্ষেপ কর না বাপ, হবে। সময় যখন হবে তখন সূতা ছাড়ার মত সূতা ফেরা গাঁয়ের প্রতিষ্ঠা হবে। কখনও-না-কখনও হবেই এ তুমি জেনো। বলে তিনি ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

বাস্। ওই পর্যন্ত। আর না। তার পর থেকে ঘরেই আছেন। এই কথা। তবে বলে রেখেছেন, হাঙ্গামা মিটলেই চলে যাবেন পুরী, জগন্নাথ-ধাম।

আর একদিন কথা বলেছিলেন। যেদিন অর্জুন বর্গীদের চন্দনগড় আক্রমণের সংবাদ পেয়ে একশো পাইক নিয়ে লড়তে যায় সবার অমতে সেইদিন। অমত ছিল দলুর, ভৈরবের, গোবর্ধনের, গণেশের প্রবীণদের সকলেরই! ছিল না মায়ের। আর ছিল না অল্পবয়সী জোয়ানদের।

ঝুমঝুমি তার মুখে চুমু খেয়ে গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে বলেছিল, যাও। আমি শঙ্করীমায়ের কবচটা বুকে ধরে পড়ে রইলাম। যাও।

সেদিন রত্নাবাঈ তাকে বুকে চেপে ধরে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, ধন্য রুক্মিণী। ধন্য রাজা মাধব সিং। ধন্য আমি। গর্ভে না ধরেও আমি তোর মা। তারপর একখানা ছোরা তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, তোর বাপের ছোরা। বলেই আবার ঘরে ঢুকেছিলেন। আহত হয়ে যেদিন অর্জুন ফিরে আসে সেদিন দেখতে এসেছিলেন। আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন। চন্দনগড়ের অবস্থার কথা শুনে কেঁদেছিলেন।

হঠাৎ বেরিয়ে এলেন ওই দিন। সরন্দাজ খাঁয়ের ছেলেরা পাঁচশো সিপাহী নিয়ে আক্রমণ করতে আসছে খবর যেদিন এল সেদিন। এসে দাঁড়িয়ে বললেন, সর্দার!

নীরব সকলে তার দিকে তাকালে। সবার মুখে বিরক্তি। কারণ সকল উপদ্রবের মূল এরাই। এদের জন্যই আসছে সরন্দাজ খাঁর ছেলেরা। তিনি বলেছিলেন, জানি, তোমাদের এ বিপদ আমাদের জন্যে। এক কাজ কর। ডুলি করে আমাদের পাঠিয়ে দাও, আমরা এবার তৈরি হয়ে যাব। আমি ঝুমঝুমির কাছে শুনেছি, তার বাপের কাছে খুব চড়া বিষ আছে! সেই বিষ খেয়ে চড়ব ডুলিতে।

চিৎকার করে উঠেছিল অর্জুন, না না—কভি না।

রুক্মিণী এসে তাঁর হাত ধরে বলেছিল, বিষ যদি খেতে হয় তবে ডুলিতে চেপে তোমরা তিনজনে খাবে কেন? ঘরে কিষণজীর মন্দিরে তাঁর সামনে বসে তোমাদের সঙ্গে আমিও খাব। বলব, কিষণজী, তুমি বিগ্রহ। আমার বাপ, আমার পাইকরা অপারগ—

দলু উঠে বুক চাপড়ে বলে উঠেছিল, আমার মাথায় বজ্রাঘাত কর হে কিষণজী। আমার মাথা তোমার চক্র দিয়ে কেটে ফেল। এই কথা আমার সেই বেটি বলে যার জন্যে আজ বিষ বরিষ—

হা হা করে কেঁদে উঠেছিল সে।

—বাবা বাবা! পিতাজী! বলেছিলেন রত্নাবাঈ।

অর্জুন ছুটে এসে দাদোকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, কেউ না লড়ে, দুজন লড়ব।

অধীর ভৈরব উঠে হাত জোড় করে বলেছিল, আমরা তো না বলি

নাই। কিন্তুক—আমরা তো কি বলতে হয় জানি না। লড়াইয়ের সময় চেঁচাতে জানি।

দলু বলেছিল, এবার বিলকুল তৈরি হয়ে যা। বিলকুল। এখনি থেকে।

রত্নাবাঈ বলেছিলেন, দাঁড়াও পিতাজী। বলে, ডেকেছিলেন, ভবানী, নিয়ে আয় ও পেটিটা।

একটি পেটি এনে নামিয়ে দিয়েছিল ভবানী। পেটি খুলতে বেরিয়েছিল—মোহর, সিক্কা আর জড়োয়া গহনা জহরত।

রত্নাবাঈ বলেছিলেন, ধান চাল গঁহু জোয়ার যা মেলে কাছে-পিঠে যত পার কিনে আন। তিনগুণ চারগুণ দশগুণ। যদি সিক্কা দামের জিনিসে মোহরের দাম দিতে হয় তবে তাও দিবে, মাল কিনে এনে বোঝাই কর। খবরদার, লুঠ করো না। আশেপাশের লোক যেন না চটে। আর কিনে আন তীরের ফলা, সড়কির ফলা, তলোয়ার। না হয়তো পাশের গাঁও থেকে লোহা আর লোহার জন কতককে এখানে আন। মুলুকে আসে ভাল, না আসে জবরদস্তি করে আন, চুরি করে আন। কামারশাল পেতে দাও।

—ঠিক বলেছ মা। রাজবুদ্ধি।

—যদি হুকুম দাও বাপ, তবে দেখি নিজে সমস্ত পাহাড় ঘুরে। রাজপুতের, মেয়ে লড়াই বুঝি, জানি। আমি কিছু বুদ্ধি দিতে পারি।

—নিশ্চয়!

সমস্ত দেখে ফেরবার সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, এখানে নিমগাছ তো অনেক সর্দার। এর বীচি কি হয়?

—জড়ো করে মা তেল হয়।

—যত পার বীচি যোগাড় করে পেষাই করাও। বর্গী যে মুখে হানা দেবে সেই মুখে পাথর গড়াবে। সঙ্গে সঙ্গে গরম তেল গড়াবে আর ওই যমদুয়ারের মুখ বিলকুল বন্ধ করে দাও।

—বন্ধ করে দেব!

—হাঁ, নিচেটা ভরে যাক জলে। দুশমন ঢুকলে যেন নিচে দাঁড়াবার জায়গা না পায়। পাথর ঢেলে ঢেলে বন্ধ করে দাও। জল আটকালে বাইরে নদীতে জল থাকবে না। বনে জল পাবে। আর কোন্ পাহাড়ে ভিমরুল আছে শুনেছি। সেই পাহাড়ের মুখটাতে একটা ফটকের

মতন গড়ো। যেন বাইরে থেকে মনে হয় সেটাই ঢুকবার জায়গা। বুঝেছ? ভিমরুলরা আমাদের হয়ে লড়বে।

—সাবাস, সাবাস মা! বহুত সাবাস! তুমি রাজরানী, রাজমাতা।

* * *

কৌশলটা ব্যর্থ হয় নি। সরন্দাজ খাঁর ছেলের দল ঢুকতে পারে নি। একদিন রত্নাদেবী পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ চালনা করেছিলেন। একদিন পাঠানকে এই মুখে ইচ্ছে করে ঢুকতে দিয়েছিলেন। খুব উৎসাহের সঙ্গে তারা যেমনি দুই পাহাড়ের জোড়ের মাথায় উঠেছিল, অমনি ঠিক সেই মুহূর্তে তীরের পর তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ভিমরুলের চাকের দিকে। বাস্, তারপর আর দেখতে হয় নি। সেখানে ছত্রিশ জাতিয়াদের কেউ সামনে ছিল না। আর যারা ছিল তারা মেখেছিল নিমের তেল আর সেই পাতার বাটা। তৈরি করেছিল ঝুমঝুমি অন্য মেয়েদের নিয়ে। সেইদিন যে পাঠানরা পালিয়েছিল সেই বোধ হয় শেষ পালানো। ওদিকে খবর এসেছিল মেদিনীপুর পর্যন্ত হটে এসে বর্গীরা আবার উড়িষ্যা পালাচ্ছে। বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী আবার এসে পৌঁছেছেন খড়্গাপুরে। মীর হবিব, জানোজী, মুস্তাফা খাঁ মেদিনীপুর থেকে ছাউনি তুলে দ্রুত হটছে। সরন্দাজ খাঁর ছেলেরা যদি এখনও ওই ঔরতের মামলা নিয়ে কটা শুকনো পাহাড় ঘিরে বসে থাকে তবে তার দায় তাদের।

পাঠানরাও বিরক্ত হয়েছিল। তারা না পেয়েছিল লুটের মত গ্রাম শহর, না পাচ্ছিল ভাল জল। তার উপর ভিমরুলের সঙ্গে কে লড়াই করতে পারে? মানুষে পারে না।

অগত্যা পালিয়েছিল সরন্দাজ খাঁর ছেলেরা।

বারো পাহাড়ের মাথা থেকে বারো পাহাড়ের বাইরে এসে বনের গাছে গাছে ফিরে যখন আর একটিও পাঠানকে দেখতে পায় নি, তখন সকলে এসে রত্নাদেবীর চরণে লুটিয়ে পড়েছিল। রত্নাদেবী, যিনি আসা অবধি হাসেন নি, তিনি সেদিন হেসেছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রতি জনকে এক সিক্কা পুরস্কার দিয়েছিলেন। সারা পাইক মহলে আনন্দের অবধি ছিল না। হাট থেকে কাপড় আনিয়ে মেয়েদের দিয়েছিলেন। দেন নি শুধু দাদোকে কিছু। দাদোর তখন অসুখ। জখম হয়েছিল দাদো। দাদোকে দেখতে গিয়ে বলেছিলেন, প্রণাম তোমাকে পিতাজী।

দাদো বলেছিল, আমি নিশ্চিন্ত মায়ী। আমি গেলে রুক্মিণী আর

অর্জুনকে দেখবার লোক রইল। তুমি প্রণাম করলে, আমি ধন্য হলাম। আজ ফের আমি শোলাঙ্কী রাজপুত।

সব শেষে রত্নাদেবী অর্জুনকে রুক্মিণীর কাছে বসিয়ে বলেছিলেন, তুমি আজ থেকে শুধু অর্জুন সিং নও—কুমার অর্জুন সিং। রাজা মাধব সিং-এর ছেলে। সিংহের বাচ্চা সিংহ। তোমাকে এবার চন্দনগড়ের গদীতে বসতে হবে। নবাব বাহাদুরের কাছে আমি পাঠাব তোমার হয়ে দরখাস্ত। তার আগে তোমাকে পরিচয় করতে হবে নবাব সাহেবের সঙ্গে। তা ছাড়া বেটা তোমার বাপকে যে যড়যন্ত্র করে মেরেছে তার একজন সুচেত সিং, আমার ভাই, সে মরে তার মাসুল দিয়েছে। এখন আসল শয়তান বেঁচে—মীর হবিব। বেটা!

—মাতাজী!

—বল রুক্মিণী, বল বহিন।

—তুমি বল দিদি—

—বেশ, আমি বলছি। বলছি, মীর হবিবকে সাজা তোমাকে দিতে হবে। রাজা মাধব সিং-এর খুনের বদলা নিতে হবে। বল, তার খুন এনে দেবে আমাদের দুই বহিনকে? তোমাকে চন্দনগড়ের গদীতে বসিয়ে আমরা দু বহিন তোমাকে দু হাত তুলে আশীষ করব। তোমার পুরস্কার তোলা রইল। দেব আমি।

অর্জুন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, যাব আমি মাতাজী, আমি যাব।

কায়ার সঙ্গে ছায়ার মত ঝুমঝুমি ছিল পাশে দাঁড়িয়ে, সে কেঁপে উঠেছিল।

রুক্মিণী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, না না না। ঝুমঝুমি, কিসের ভয়? আয়, আমার কাছে আয়।

মাতাজী বলেছিলেন, শুনেছি, গুরু বলেছেন তুই নায়িকা। সে যে শঙ্করীমায়ের জয়া বিজয়া রে। আঁ! নায়িকা, তুই ডর খেলে চলবে কেন? আয় শোন্, এই নে।

নিজের গলা থেকে খুলে লাল প্রবালের মালা পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আজ ভবানী বেটী তোর কেশবন্ধন করে দেবে, সাজিয়ে দেবে। সারা রাত আনন্দ করবি। বলবি অর্জুনকে, লড়াই ফতে করে নবাব সাহেবের কাছে মুক্তাহার এনে দেবে তোকে। আঁ! তুই নায়িকা, রানী নোস! তুই নাচবি, নাচাবি নায়ককে, তবে তো রে বেটী!

অভিভূত হয়ে গিয়েছিল অর্জুন, ঝুমঝুমি দুজনেই।

রাত্রে কিন্তু ঝুমঝুমি বলেছিল, জান সিং, মাতাজীকে কেমন ভয় করছেক গ!

—হাঁ। মহিমা কেমন দেখছিস না!

পরদিন বাছা বাছা পঞ্চাশ জন পাইক নিয়ে অর্জুন রওনা হয়ে গিয়েছিল উড়িষ্যার পথে। নবাব চলেছেন বর্গীদের পিছন পিছন। নিজে হাতে কলম ধরে মাতাজী এক আর্জি তৈরি করে দিয়েছিলেন। মহামহিম মহিমার্ণব সুজাউল মুল্ক্ হেসামউদ্দৌলা বাংলা-বিহার উড়িষ্যার মালেক নবাব আলিবর্দী খাঁ বাহাদুর বরাবরেষু—

সে আর্জির বাঁধুনি কি! তিনি যখন পড়ে শুনিয়েছিলেন তখন রোগশয্যায় শুয়ে দলু সর্দার বার বার সাবাস সাবাস করে সারা হয়েছিল। পাইক সর্দারেরা অবাক হয়েছিল। আর্জিতে নবাবী ফৌজে অর্জুনের চাকরি ভিক্ষা করেই ক্ষান্ত হন নি এই সুচতুর মাতাজী, দাবি করেছিলেন চন্দনগড়ের গদী তাঁর সন্তান এই দরখাস্তবাহক পুত্র কুমার অর্জুন সিং-এর জন্য। সঙ্গে দিয়েছিলেন রেশমী রুমাল আর দিয়েছিলেন পাঁচখানি মোহর। নবাব সাহেবের সামনে কুর্নিশ করে হাঁটু গেড়ে বসে কেমন করে নজরানা দিতে হবে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। যাবার সময় অর্জুন বলেছিল, মাতাজী, দাদো রইল, মা রইল, পাইকরা রইল, তুমি দেখো।

—নিশ্চিন্ত হও।

অর্জুন মা রুক্মিণীকে বলেছিল, মা!

—অর্জুন!

—আসি মা।

একটু ইতস্তত করে বলেছিল, ঝুমঝুমিকে দেখো মা। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল রুক্মিণী, কেমন শিউরে উঠেছিল ঝুমঝুমি, অর্জুনেরও বিস্ময়ের শেষ ছিল না নিজের কথাগুলি শুনে। সে যেন দোসরা মানুষ হয়ে গেছে। কুমার অর্জুন সিং।

রুক্মিণী উত্তর দেয় নি। দিয়েছিলেন রত্নাদেবী। বলেছিলেন, কুমার, তোমার নায়িকা, সে আমাদের খুব আদরের। শুধু দেখা কি—আমরা সবাই আদর দিয়ে ভুলিয়ে রাখব ওকে। ওকে চন্দনগড়ের রাজা-বাহাদুরের নায়িকা করে গড়ে রেখে দেব। দেখবে এসে।

তারপর থেকে জঙ্গলগড়ের এই পরিবর্তন করিয়েছেন রত্নাদেবী। দলু সর্দার

মারা গেছে। সর্দার রুদ্রদেবীকে ডেকে বলেছিল, আমি নিশ্চিন্ত মায়ী। আমি নিশ্চিন্ত।

রানীজী ছত্রির মত সংকার করে তার শ্রাদ্ধ করিয়েছিলেন। তারপর গোবর্ধন আর গণেশকে নিয়ে এই জঙ্গলগড়কে গড়েছেন। স্বচেত সিং-এর মৃত্যুর পর চন্দনগড় নবাবী শাসনে মেদিনীপুরের ফৌজদারের অধীন; তবুও সেখানকার ছত্রিরা, পাইকরা রানী-মাতাজীর কাছে আসে যায়। সেখান থেকে রাজমিস্ত্রী ছুতোরমিস্ত্রী আনিয়ে এসব গড়ে তুলেছেন।

উড়িষ্যা থেকে পাইকরা গিয়ে সংবাদ আনে। অর্জুন সিং নবাবের ফৌজে নাম করেছে। তার পদ হয়েছে। নবাব একবারের যুদ্ধে তার বীরত্বের জন্যে তলোয়ার দিয়েছেন। পোশাক দিয়েছেন। সে এখন ঘোড়া কিনেছে। ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করে। মীর হবিব হটছে—হটছে—হটছে। অর্জুন সিং-এর আপশোস এখনও পিতৃহত্যার শোধ নেওয়া হয় নি। মীর হবিব এখনও মরে নি। একবার খবর এল, ভৈরব মরেছে। ভৈরব অর্জুনের সঙ্গে গিয়েছিল। রানীমাতাজী ভৈরবের ছেলে গোরাচাঁদকে সর্দারী দিয়েছেন। তলোয়ার দিয়েছেন। টাকাও দিয়েছেন—একশো টাকার তোড়া। গোটা জঙ্গলগড় অন্যরকম, শুধু বাইরের চেহারাতেই হয় নি। ভিতরের চেহারাতেও পাল্টেছে। আর ছোকরারা মদ খেয়ে বারো পাহাড়ের এলাকায় আসে না। সকালে সন্ধ্যায় মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজে। রাত্রে আলো জ্বলে। আগের মত বারো পাহাড়ে অন্ধকার নিরন্ধ্র নয়; সে অন্ধকার দলবদ্ধ তরুণ পাইকদের স্খলিত চিৎকারে চমকায় না। ছত্রিশ জাতিয়া আদিবাসীরা নেমে গেছে নিচে। সমতলের কাছাকাছি তাদেরও বেশ একটি পল্লী তৈরি হয়েছে। তাদের মেয়েরা আর স্বল্পবাসা নয়। তাদের মধ্যে থেকে উপপত্নী সংগ্রহ এখনও করে পাইকরা, কিন্তু তারা সে উদ্দাম বেদিয়ার মেয়ে নয়।

ঝুমঝুমি কেশ বন্ধন করে, মুখে সরময়দা মেখে প্রসাধন করে। বেশবাস তার কাচুলি, ওড়না, ঘাঘরি। হাতে রূপার কঙ্কণ, কোমরে রূপার চন্দ্রহার। তাকে ভবানী তরিবৎ সহবৎ শেখায়। কুমার অর্জুন সিং-এর নায়িকা সে। মহাভারতের রামায়ণের গল্প শোনায় তাকে। কিন্তু আশ্চর্য, আজ সে নেই।

গতকাল খবর এসেছে মীর হবিব নেই, সে খতম। কুমার অর্জুন

সিং একখানা রুমালে তার রক্ত মাখিয়ে মাথার পাগড়ির মধ্যে নিয়ে ফিরছে বারো পাহাড় ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড়ে। ফিরবে আট দশ দিনের মধ্যে। রানীমাতাজী বারো পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় পতাকা উড়িয়ে দিয়ে জঙ্গলগড়ের বারো পাহাড়কে সাজাচ্ছেন। পাইকদের পাগড়ি কুর্তা বিলকুল নতুন হয়েছে। শালগাছের ডালে পাতায় ফটক্ হচ্ছে। স্থির হয়েছে কুমার এখানে যেদিন আসবেন তার তিনদিন পরই সব রওনা হবে চন্দনগড়।

চন্দনগড়ে অর্জুন সিং-এর দাবি মেনে নিয়েছেন নবাব আলিবর্দী খাঁ। ফরমান দিয়েছেন মেদিনীপুরের ফৌজদারকে, হুকুম দিয়েছেন চন্দনগড়ের দখল রাজা মাধব সিং-এর ছেলে অর্জুন সিংকে দেবার জন্যে। অর্জুন সিংকে রাজা খেতাব দিয়েছেন। অর্জুন সিং বছর বছর নবাবী খাজনার তঙ্কা আমানত করবেন মুর্শিদাবাদের খাজাঞ্চীখানায়।

তিনমাস পূর্বে এসেছে ফরমান। দখল পাওয়া গেছে। নবাব আলিবর্দী ফিরে গেছেন মুর্শিদাবাদ। মীর হবিব নবাবের কাছে দাঁতে খড় নিয়ে মাফ চেয়ে তাঁর হাত থেকে বেঁচে উড়িষ্যায় রয়েছে। সেই দুঃখে অর্জুন ফরমান পেয়েও ফেরে নি। সে ঘুরছিল, তীর্থের অজুহাত করে ফিরছিল। সংকল্প সিদ্ধ না হলে ফিরবে না জানিয়েছিল লোক মারফত। বারণ করেছিল ভয় করতে। প্রকাশ করতেও নিষেধ করেছিল। রানী জানিয়েছিলেন শুধু রুক্মিণীকে। বলেছিলেন, বীরমাতা তুমি। বুক বাঁধ।

—দিদি, আজ বাইশ বছর বুক বেঁধে আছে রুক্মিণী। জীবনের বাকি কটা দিন? সে তা পারবে।

চঞ্চল হয়েছিল ঝুমঝুমি। সে বার বার জিজ্ঞাসা করেছিল, মা, কেন ফিরল না সে?

রত্নাদেবী বলেছিলেন, চুপ কর ঝুমঝুমি। তার বাপের মৃত্যুর শোধ নিতে পারে নি। ছত্রির ছেলে সে।

সে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে।

—মহাভারতের গল্প ভবানী তোকে শোনায় ঝুমঝুমি?

—হাঁ মা।

—তবে সেই। ছত্রির কসম—প্রতিজ্ঞা তাই।

পরের দিন সন্ধ্যায় রানীমাতাজী দরবার করেছিলেন। ঘোড়-সওয়ার গিয়েছিল চন্দনগড়। সেখান থেকে কজন ছত্রি সর্দার

এসেছিলেন। আর এসেছিলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত, কয়েকজন মাহিষ্য সদ্‌গোপ জোতদার।

অনেক মশাল জ্বেলে চারিপাশে খুঁটো পুঁতে তার সঙ্গে বেঁধে দরবার করেছিলেন রানীমাতাজী। পাশে ছিল মাতাজী রুক্মিণী। ভবানী, হিঙ্গন ছিল পিছনে। একপাশে ঝুমঝুমিও বসেছিল। ভয় করছিল তার। এসব সে জানত না, বুঝত না। আজ বুঝতে হয়েছে, বুঝতে হচ্ছে, কিন্তু ভয় করছে। তার নিজেকে দেখেই কেমন যেন ভয় করে। তার মা বাপ, তার আত্মীয়স্বজন তার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। আবার রানীমাতাজী, ভবানীবাঈ, হিঙ্গনবাঈও তার থেকে অনেক দূরে ও পরে। মাতাজীও ওদের সঙ্গেই রয়েছেন। শুধু সে একা। একেবারে একা। রুক্মিণী মাতাজী ওদের কাছ থেকে মধ্যে মধ্যে নেমে এসে তাকে সমাদর করেন। কিন্তু সে কতক্ষণ? সে নিঃসঙ্গ। তার পরিচর্যার জন্য একটি বেদিয়া মেয়ে দাসী আছে। তার স্বজাতি। কিন্তু সে একা—সে একা হয়ে গেছে। ঝুমঝুমিকে ভয় করে। মেয়েটাও অর্জুন অর্জুন করে কাঁদে। ভবানী তাকে মহাভারতের অর্জুনের গল্প বলে। বলে, অর্জুনের বনবাসের কথা। তার বিয়ের কথা। উলুপী, চিত্রাঙ্গদা, কত কত বিবাহ! তারা সারাজীবন অর্জুনের জন্য কেঁদে কাটিয়েছে। তাকেও কি তেমনি করে—? সে কাঁদে, আবার নিজেই সান্ত্বনা খুঁজে নেয়। না না, তার অর্জুন তেমন নয়। সে আসবে। কবে আসবে? তবু ভয় করে। সেই ভয় নিয়েই সে সেদিনও দরবারে বসেছিল।

রানীমাতাজী বসে আদেশ দিয়েছিলেন বাজী পোড়াবার। আতসবাজী এসেছিল চন্দনগড় থেকে। বারো পাহাড়ের আকাশ আতসবাজীর ফুলঝুরিতে ভরে গিয়েছিল। বোম ফুটেছিল; ত্রস্ত পাখির ডাকে বন মুখরিত হয়ে উঠেছিল সেই রাত্রে। দূরে উঠেছিল একটা বাঘের গর্জন। হুঙ্কার দিয়ে সেটা পালিয়েছিল এক লাফ দিয়ে। সেটা বুঝতে কারুর কষ্ট হয় নি। সকলে হো হো করে হেসে উঠেছিল।

রানীমাতাজী উঠে দাঁড়াতেই সকলে থেমে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, ভগবান রাধামাধব, কিষণজীর করুণা—আর সুবিচারক মেহেরবান নবাব আলিবর্দীর মেহেরবানি। চন্দনগড় আবার ফিরে এল রাজা মাধব সিং-এর পুত্রের হাতে। কুমার অর্জুন সিং বাহাদুর। আমার ভাই হলেও সুচেত সিং তার বাপের শত্রু ছিল। কেমন করে

আমাকে প্রতারিত করে সিংহাসন থেকে নামাবার বদলে মীর হবিবকে দিয়ে খুন করিয়েছিল, নিজে গদী দখল করেছিল, সে সবাই জানে। আমার ভুল হয়েছিল—ছত্রিদের ভুল হয়েছিল রানী রুক্মিণীকে রানী বলে স্বীকার না করা। আমি স্বীকার করছি। অর্জুন সেই রানী রুক্মিণীর ছেলে। সেই বিপদের দিনে শুধু তার মা আমাকে, তার বহিন ভবানীকেই রক্ষা করে নি, সুচেতের বেটী হিঙ্গনকেও রক্ষা করেছে। ছত্রির কাজ করেছে। আমাদের জন্যে পাঠানদের সঙ্গে লড়েছে। শুধু সে নয়, এখানকার পাইকশ সবাই। চন্দনগড় রাখতেও সে গিয়েছিল। কিন্তু পঙ্গপালের মত বর্গীর সঙ্গে পারে নি তখন। তার শোধ সে নিয়েছে। নবাবের ফৌজে যোগ দিয়ে সে বর্গী পাঠানদের অনেক রক্ত ঝরিয়েছে। ভগবান তার পুরস্কার দিয়েছেন। দেশের নবাব তাকে চন্দনগড়ে জায়গীর মঞ্জুর করে রাজা খেতাব দিয়ে ফরমান দিয়েছেন। তার কল্যাণে চন্দনগড় পূর্বের মত আপনা রাজ হয়ে গেল। কুমার অর্জুন এখনও ফেরে নি। সে তীর্থ ঘুরছে। নবাবী খেলাত পেয়েছে। এবার পিতৃঋণ শোধ করে পিতৃপ্রসাদ দেবতার প্রসাদ নিয়ে ফিরবে। কুমার ফিরলে আমি তাকে নিয়ে চন্দনগড়ে যাব। সে গদীতে বসবে। তার আগে আমি তাকে দেব মায়ের আশীষ। এই কন্যা—সুচেত সিং-এর কন্যা হিঙ্গনকে তার হাতে দিয়ে আশীষ করব। রাজার শাদি আর অভিষেক একসঙ্গে হবে।

সকলে সমস্বরে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেছিল। রানীমাতাজী আবার বলেছিলেন, এখানকার পাইকরা চন্দনগড়ে বসতের জমি পাবে। পাইকান ক্ষেত পাবে। এখানেও থাকবে তারা। ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড়ে রাজা-বাহাদুরের অবসর যাপনের ঠাঁই হবে।

আবার জয়ধ্বনি উঠেছিল। ধন্য ধন্য করেছিল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। শুধু নিজেদের অজ্ঞাতসারে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে গিয়েছিল ছত্রিশ জাতিয়া বেদিয়ারা। আর পাথর হয়ে গিয়েছিল ঝুমঝুমি।

দরবার ভেঙ্গে গেলেও সে বসেছিল। রুক্মিণী তার গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছিলেন, ঝুমঝুমি!

—মা!

—চল। ওঠ।

উঠেছিল সে নীরবেই, সঙ্গে চলেছিলও নীরবে। রুক্মিণী বলেছিলেন, তুই যেমন আছিস তেমনি থাকবি ঝুমঝুমি। সে তোকে ভালবাসে।

সে প্রশ্ন করেছিল, অর্জুন?

—হাঁ। ভালবাসে কি না তুই বল্।

—হাঁ মা। তারপর চুপ হয়ে গিয়েছিল। তার অন্তরের কথা রুক্মিণীর বুঝতে কষ্ট হয় নি। তাঁর কাছে তো দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু কি করবেন? একটি মানুষী সারাজীবন এক হয়ে থাকা সে কোথায়? ছত্রি রাজা। রাম কোথায়? সীতা এখনও আছে। হায় শবরী সীতা!

ঝুমঝুমি নীরবেই গিয়ে বসেছিল মন্দিরে আরতির সময়। মধ্যে মধ্যে চোখ মুছছিল। রুক্মিণী লক্ষ্য রেখেছিলেন তার উপর। আরতি শেষ হতে কিষণজীকে প্রণাম করে তাঁদের প্রণাম করে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন।

পরদিন সকালে ঝুমঝুমিকে খুঁজে কেউ পায় নি। তার বেশভূষা সব পড়ে ছিল। কিন্তু তাকে পাওয়া যায় নি। খোঁজ অনেক করেছিলেন রানীমাতাজী। কিন্তু কোন খোঁজ মেলে নি। রুক্মিণী কোন কথা বলেন নি। তিনি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

কয়েকদিন পাইক মহলে কথা হয়েছিল। কথা বুঝতে কারুর বাকি থাকে নি। তারা কেউ সমর্থন করতে পারে নি ঝুমঝুমিকে। ছত্রিশ জাতিয়া বেদিয়ারাও না।

তিন মাস পর। ফিরেছেন কুমার অর্জুন সিং। মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে তাঁর। বর্গীরা সন্ধি করেছে নবাবের সঙ্গে। উড়িষ্যা ছেড়ে দিয়েছিল নবাবকে, কিন্তু চৌথ পেয়েছিল। মীর হবিব তাঁর স্বভাবমত এবার দল বদল করে আবার হয়েছিলেন নবাবের চাকর। কিন্তু বর্গীরা তাঁকে ক্ষমা করে নি। জানোজী কটকের প্রান্তে ছাউনি ফেলে সুযোগ খুঁজছিলেন। অর্জুন তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। একদিন জানোজী মীর হবিবকে নিমন্ত্রণ করে এনে হিসাব-নিকাশের কথা পেড়েছিলেন। তারপর বর্গীরা করেছিল আক্রমণ। মীর হবিব তাঁর দল নিয়ে লড়াই করে পারেন নি। মরতে তাঁকে হয়েছিল। কুমার অর্জুনের তলোয়ার আরও কয়েক জনের সঙ্গে বিদ্ধ হয়েছিল মীর হবিবের বুকে। তাতেই ভিজিয়ে নিয়েছিল সে তার রুমাল।

সেই রুমাল মাথার পাগড়িতে বয়ে নিয়ে ফিরল কুমার অর্জুন। সঙ্গে

তার চল্লিশজন পাইক। ঘোড়ার উপর চড়ে ফিরছে। সঙ্গে আসছে এক ডুলি।
শঙ্খধ্বনির মধ্যে কোলাহলের মধ্যেও কথাটি প্রশ্নের সুরে ধ্বনিত হল।
—ডুলি ?
ছত্রি রাজপুত ! বীর ! কোথা থেকে কোন বিমুগ্ধাকে নিয়ে এসেছে ! আশ্চর্য কি !
রানীমাতাজী সবিস্ময়ে তাকিয়েছিলেন দরবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে। তাঁর পাশে রুক্মিণী। তিনিও বিস্মিতা।
অর্জুন নেমে এসে প্রণাম করে রক্তাক্ত রুমালখানা নামিয়ে দিয়ে বললে, এই নাও মাতাজী, মীর হবিবের রক্ত।
গম্ভীরভাবে রত্নাদেবী বললেন, দীর্ঘজীবী হও। তোমার সুযশে চন্দনগড় দেশ মুখরিত হোক। কিন্তু ডুলিতে কে ? কাকে নিয়ে এলে অর্জুন ? আমি যে হিঙ্গনের সঙ্গে তোমার বিবাহের দিন স্থির করেছি।
—সে তো হয় না রানীমাতাজী। আমি জীবনে একটি মেয়েকেই ভালবেসেছি। তাকেই জগন্নাথ সাক্ষী করে বিবাহ করেছি। ঝুমঝুমি নাম। প্রণাম কর।
সলজ্জিত বধূবেশিনী কৃষ্ণাঙ্গী কন্যা নেমে এসে প্রণতা হল।
—ঝুমঝুমি ?
—হ্যাঁ রানীমাতাজী। অসীম ওর সাহস। ভয়ডর নেই। আমার জন্যে পাগল হয়ে রাত্রে জঙ্গলগড় থেকে বেরিয়ে ভিক্ষা করতে করতে গিয়েছিল পুরী। সেখানেই ছিল। অসীম সাহসিনী ও। পুরী থেকে কটকে গিয়ে আমার কাছে গিয়েছিল। আমার বুকে পড়ে কী কান্না ! বল, তুমি শুধু আমার, শুধু আমার। আমি তো তাই। আমি আর কারু হতে পারব না মাতাজী। আমি ওকে বিবাহ করেছি জগন্নাথের সামনে। তাঁকে সাক্ষী করে। ভাগ্যক্রমে শঙ্করীপুরের মায়ের গুরুকে সেখানে পেয়েছিলাম। তিনি বিবাহ দিয়েছেন। এই পাইকরা সাক্ষী। তিনি বললেন, তোমার মায়ের সঙ্গে তোমার বাবার বিবাহে আমি মন্ত্র পড়েছিলাম। তোমার বিবাহেও পড়ছি। বললেন, তোমার জাত যায় না অর্জুন।
—কিন্তু চন্দনগড়ের ছত্রিরা প্রজারা তো এ সহ্য করবে না !
—হবে না মাতাজী সহ্য করতে। চন্দনগড়ের গদীতে বসবে আমার

খড় বহিনের ছেলে। রাজা মাধব সিংএর দৌহিত্র। হিঙ্গনকে তার হাতে দাও মা।

—ভাল। সেই বসবে। কিন্তু হিঙ্গন—। হাসলেন রানীমাতাজী। বললেন, আমারই ভুল। হিঙ্গনকে যে জগন্নাথের কাছে যেতেই হবে। আমি যে চন্দনগড় থেকে বেরুবার সময় তাঁর নাম করেই ওকে বলেছিলাম—চল্, তাঁর হাতে তোকে দিয়ে আসি। তাই হবে।

রুক্মিণী নেমে এসে কৃষ্ণাঙ্গী বেদিয়ার মেয়েকে বুকে টেনেই নিলেন না, সকলের সমক্ষে তার কপালে চুম্বন দিয়ে চোখ বুজলেন। দুটি জলের ধারা তাঁর চোখ থেকে নেমে এসে ঝরে পড়ল বধূর মাথার উপর।



ব স ন্ত রা গ

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চ রথ এবং বিরাটকায় প্রস্তর হস্তী সমৃদ্ধ তীর্থস্থল মহাবলীপুরম ও উত্তরে মান্দ্রাজের কাছাকাছি একটি স্থান। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ। মান্দ্রাজ তখন নামে মাত্র শহর, প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে—প্রায় সমুদ্রতটে একটি সুন্দর তপোবনের মত আশ্রম। সুন্দর সুগঠিত,—কি বলব, বাড়ি? না, বাড়ি বলতে যা বোঝায় তা নয়, তবে কুটির? না, তাও নয়। কুটির বলতে যা বোঝায় তা থেকে অনেক সমৃদ্ধ; এবং বাড়ি বলতে যা বোঝায় তা থেকে আয়তনে আকারে স্থান সঙ্কুলানে অনেক ছোট। চারটি পাথরের থামের মাথায় পাথরের ছাদের ছয় হাত প্রস্থ বারো হাত দীর্ঘ একটি বারান্দা, তার কোলে এমনি আয়তনেরই এক-খানি ঘরকে দুখানি করে নেওয়া হয়েছে; একখানি ছোট, একখানি বড়। সামনে ঘন বৃক্ষবেষ্টনীর মধ্যে কয়েক কাঠা পরিমিত জমিতে পরিচ্ছন্ন একটি উদ্যান। কিছু দূরেই নারিকেল তাল গাছের সুদীর্ঘ সারি, তারই কোলে মহাসমুদ্রের বেলাভূমি। গাঢ় কৃষ্ণাভ নীল সমুদ্র-তরঙ্গ সাদা ফেনা মাথায় নিয়ে কলকল্লোল তুলে আছড়ে এসে পড়ছে। তরঙ্গশীর্ষে রৌদ্রচ্ছটা ঝিকমিক করছে। অবিরাম কল্লোলধ্বনিতে মুখরিত।

বারান্দায় ঘরে সজ্জার উপকরণ স্বল্প কিন্তু সেগুলি বড় সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। ছোট ঘরখানির পাশেই অল্প একটু হয়তো বা দশ হাত পরিমিত স্থান তফাতে আর একখানি ঘর। নারিকেল পাতায় আচ্ছাদিত একখানি মাটির ঘর। বেশ সুগঠিত ও পরিচ্ছন্ন। সামনে দুটি হৃষ্টপুষ্ট ধবলাঙ্গী গাভী রোমন্থন করছে।

একটি আশ্রম, সত্যই একটি আশ্রম। নির্জন পরিবেষ্টনীর মধ্যে এমন মনোরম পরিচ্ছন্ন স্বল্পায়তন গৃহকে আশ্রম ছাড়া কিছু বলাও যায় না। আজ কিন্তু স্থানটি নির্জন নয়। বারান্দায় এবং বারান্দার সামনে উদ্যানের মধ্যে বহু জনের ভিড়। উত্তেজিত অথচ চাপা কোলাহল কোন অতিকায় মধুচক্রের উত্তেজনা-চঞ্চল মধুমক্ষিকার গুঞ্জন-ধ্বনির মত ধ্বনিত হচ্ছে। প্রতিটি লোকই মুখর—চাপা গলায় প্রত্যেকে কথা বলছেন। স্বর অনুচ্চ কিন্তু সুরে উত্তেজনা রয়েছে—উত্তপ্ত বায়ুস্পর্শের

মত স্পষ্ট। কিন্তু একটি কথা বা শব্দও বোঝা যায় না—বহু জনের উচ্চারিত কথায় কথায় জড়িয়ে সব দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে এবং অদূরবর্তী সমুদ্রকল্লোলের ধ্বনি তার উপর একটি আবরণ টেনে দিয়ে তাকে আরও অস্পষ্ট করে তুলেছে। শুধু মনে হচ্ছে—একটি হায় হায় হায় হায় আক্ষেপ সব কিছুর মধ্যে। উদাস সমুদ্রের একটানা ধ্বনির মধ্যেও এবং এই কথাবার্তার চাপা কণ্ঠস্বরের মধ্যেও।

জনতার পিছন দিকে দূরে আশ্রম. প্রবেশ পথের বাঁদিকে যে দিকে ঐ গাভী দুটি বাঁধা ছিল—সেই দিকে বিষণ্ণতায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে ছিল শূদ্রকন্যা লল্লা। মনে হচ্ছিল যেন রৌদ্রতাপক্লিষ্ট একটি শ্যামলতা। রৌদ্রম্লান পাতার মত তার সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ক্লিষ্টতার চিহ্ন। নির্বাক হয়ে সে শুনবার চেষ্টা করছিল, কে—কি বলছে।

এসেছে বহুজন। ব্রাহ্মণ শূদ্র—সকলেই কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান এবং বিদগ্ধজন। কারও প্রতিষ্ঠা বেশী, কারও কম। বৈদগ্ধ্যেও তাই। যার যেমন বেশী প্রতিষ্ঠা সেই তেমন আগে দাঁড়িয়েছে স্বাভাবিক-ভাবে। লল্লা দাঁড়িয়ে আছে একা—সকলের পিছনে। সেই শুধু নির্বাক—শুধু শুনছে।

আরও একজন নির্বাক। অর্ধশায়িত অবস্থায় নির্বাক হয়ে শুয়ে আছেন—দক্ষিণের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সুকণ্ঠ গায়ক বীণকার রঙ্গনাথন,—বৈষ্ণব সঙ্গীতাচার্য রঙ্গনাথন। তিনিও নির্বাক হয়ে শুনছেন। তাঁর কপালে আঘাত-ক্ষতকে আবৃত করে বেশ পুরু কাপড়ের আবরণী বাঁধা, মুখ চোখ ফুলেছে একটু। তিনিও ক্লিষ্ট।

তিনি আহত। তাই এত লোকের সমাগম। মহাগুণী আচার্য রঙ্গনাথন। সুরের যাদুকর। কণ্ঠস্বর বংশীধ্বনির মত। শুধু তাই নয়, নিজেই তিনি গীত রচনা করেন—নিজেই সুরারোপ করে বীণা বাজিয়ে গেয়ে বেড়ান। বড় বড় মন্দিরের প্রাঙ্গণে গিয়ে প্রথম তাঁর নূতন গান দেবতাকে শুনিয়ে আসেন; তারপর রাজার ধনীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। মন্দিরের পুরোহিতেরা তাঁর নূতন গানের সংবাদ পেলেই তাঁকে নিমন্ত্রণ পাঠান; তিনি পত্রখানি মাথায় ধরে বলেন—শিরোধার্য—গিয়ে বলো, যথা সময়ে উপস্থিত হব। মন্দির-প্রাঙ্গণে আসর পড়ে, দীপাধারে উজ্জ্বল আলো জ্বালা হয়—তৈলদীপ, বর্তিকা, সুগন্ধি ধূপশলাকা জ্বলে। চারিপাশে হাজার হাজার শ্রোতা সমবেত হয়। নিয়মানুযায়ী শূদ্রেরা অচ্ছুতেরা দূরে দাঁড়িয়ে শোনে। তাঁর বীণা ঝঙ্কার দেওয়া মাত্রেই

মোহের সঞ্চার হয় শ্রোতার মনে। বীণা মন্ত্রপূত নয়, ঝঙ্কারের মধ্যেও কোন যাদু নেই। কিন্তু তাঁরা গান যাঁরা পূর্বে শুনেছেন—তাঁদের মনে জেগে ওঠে পূর্বস্মৃতি ; তাই করে মোহের সঞ্চার, যাঁরা নূতন তাঁদের মনে এর ছোঁয়াচ লাগে। তিনি আলাপ শুরু করেন। কণ্ঠস্বর—বীণার ঝঙ্কারের সঙ্গে মিশে কিন্তু সত্যই মোহ সৃষ্টি করে। স্বর এমন মধুর অথচ বলিষ্ঠ। ভারতবর্ষের সানাইয়ের সুর ওঠে যেন। তারপর গান শুরু হয়। গানও রঙ্গনাথনের নিজের রচনা। তার মধ্যেও আছে এক নূতন ভাব ও ভাবনার প্রকাশ।

প্রতি বারই তাঁর বীণায় তিনি আঙুলের কৌশলে প্রথমেই শব্দ তোলেন —ঝম্। যারা সঙ্গত করে তারাও করতালধ্বনিতে মৃদঙ্গ-শব্দে অনুরূপ ধ্বনি মিশিয়ে দেয়। তারপর তিনি গেয়ে ওঠেন—অনাদি সৃষ্টির আদিতে নিস্তরঙ্গ শব্দের মধ্যে প্রথম নটরাজ চরণপাকে তাঁর নূপুর-ঝঙ্কারের মধ্যে জন্ম নিল ধ্বনি। বিশ্বের সকল ধ্বনিই সঙ্গীত। প্রলয় তাণ্ডবের ভীম ভয়ঙ্কর নিনাদ থেকে ব্রজের বংশীধ্বনি, যুদ্ধক্ষেত্রের আর্তনাদ হুঙ্কার থেকে বেতসকুঞ্জে প্রণয়ীযুগলের মৃদু গুঞ্জন—আকাশের মেঘগর্জনের বজ্রনাদ থেকে কোকিলের কুহুরব—সঙ্গীতঝঙ্কার সবের মধ্যেই। সব আছে এবং জন্ম নেয় নটনাথের নূপুরপাতে। হে নটনাথ —তা থেকেই প্রসাদস্বরূপ আহরণ করেছি এই যৎকিঞ্চিত সুর ও সঙ্গীতকণা। তাই আবার নিবেদন করি নটনাথ, তোমারই চরণে।

এটুকু তাঁর প্রতিটি সঙ্গীতের বা তাঁর সঙ্গীতসাধনারই ভূমিকা। বঙ্গদেশে এমন ভূমিকার নাম চৈতন্যের আবির্ভাবের পর থেকে গৌরচন্দ্রিকা। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে এর নাম বন্দনা। মহাভারতে ব্যাসদেব শুরু করেছেন—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্—দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।"

রঙ্গনাথনের এটুকু তাই। এদিক দিয়ে তিনি মহাভারতের অনুরাগী এবং মহাভারতকারের অনুসরণকারী। তারপর আরম্ভ হয় আসল গান। পুরাণ থেকে কাহিনী নিয়ে তিনি গান রচনা করে তাই গেয়ে থাকেন। পালা গানের মত। কিন্তু গায়ক তিনি একক। মধ্যে সূত্রধারের মত কাহিনীটির সূত্রটি টেনে নিয়ে যান। আবার উপনীত হন সঙ্গীতে। যতক্ষণ গান করেন ততক্ষণ শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ বা স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। বুকের মধ্যে নানা ভাবতরঙ্গ অবিরাম উচ্ছ্বসিত হয়—করমণ্ডল বেলা-

ভূমের সমুদ্রের মত। লোকে তাই বলে। সমুদ্রতটবাসী মানুষগুলি সমুদ্রকে বড় ভালবাসে;—তারা সমুদ্র-শঙ্খের অলঙ্কার পরে, তাই দিয়ে কত শিল্প রচনা করে, তটভূমের নারিকেল ফল ও বৃক্ষ তাদের সম্পদ,—বেদনায় আনন্দে তারা বেলাভূমে গিয়ে বসে, সমুদ্রকল্লোলে হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শোনে, সমুদ্রের বাতাস তাদের নিদ্রা আনে, সমুদ্রের ঝড় তাদের ঘর উড়িয়ে ভাসিয়ে দেয় সমুদ্রের নীলকজ্জল বর্ণের আভা তাদের অঙ্গলাবণ্যে সুষমা সঞ্চার করে; জীবনে উপমায় সমুদ্র তাদের রত্নাকর। সকালের সমুদ্র, দ্বিপ্রহরের সমুদ্র, সন্ধ্যার সমুদ্র, রাত্রের সমুদ্র, উচ্ছ্বসিত সমুদ্র, শান্ত সমুদ্রেই তাদের জীবনের প্রতিবিম্ব দেখতে তারা অভ্যস্ত। ভাবোচ্ছ্বসিত হৃদয়ের উপমা তাদের সমুদ্রে। রঙ্গনাথনের গান যখন তারা শোনে—তখন তাদের হৃদয়ের উপমা রাত্রের সমুদ্রের মত। শুধু তরঙ্গের পর তরঙ্গ। অন্য চিন্তার একটি নৌকাও তখন থাকে না। তারপর কখন গান শেষ করেন রঙ্গনাথন। বীণাটি পাশে রেখে দেন। হাত জোড় করে বলেন—ত্রুটি-বিচ্যুতি সব ক্ষমা কর। আপনারাও করুন—আপনারা শ্রোতা, আপনারা দেবতা। এতক্ষণে শ্রোতারা যেন মোহমুগ্ধতা থেকে মুক্ত হয়। তারা সমবেত স্বরে ধ্বনি দিয়ে ওঠে—জয় রঙ্গনাথন।।

রঙ্গনাথন হাত তোলেন—না।

স্তব্ধ হয়ে যায় শ্রোতারা সবিস্ময়ে।

রঙ্গনাথন বলেন—না। বলুন—জয় বিশ্বরঙ্গ-পতি রঙ্গনাথন,—নটরাজ শিব-জয়!

এই রঙ্গনাথন। লোকপ্রিয় রঙ্গনাথন। সুন্দর রঙ্গনাথন। মধুর-প্রকৃতি সঙ্গীতশাধক রঙ্গনাথন।

এই গুণী গীতিকার লোকপ্রিয় রঙ্গনাথন গত রাত্রে মান্দ্রাজ শহরে এক বর্ধিষ্ণু শ্রেণীর নিমন্ত্রণে গান করতে গিয়েছিলেন, কিরাতার্জুনীয় উপাখ্যান। প্রত্যাবর্তনের পথে একদল অজ্ঞাত আততায়ী পথের মধ্যে আক্রমণ করে তাঁর মাথায় আঘাত করেছে। তিনি আহত হয়েছেন। রাত্রের অন্ধকারে মাথায় আঘাত করে তারা অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। স্বল্প কয়েকজন সঙ্গী ছিল, তারা তাঁকে কোন রকমে বয়ে এখানে এনেছে।

ঘরের মধ্যে তিনি একখানি কাষ্ঠাসনের উপর বিছানো শয্যায় গোলাকার একটি উপাধানের উপর ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে আছেন।

হাতের কাছে বীণাটি রয়েছে। একখানি হাত বীণার তারের উপর অলস বিশ্রামে পড়ে আছে। কপালের ক্ষতস্থান পরিচ্ছন্ন বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বাঁধা। রক্তের একটি শীর্ণ রেখার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। রক্ত এখনও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নি। সারা মুখে একটি বিষণ্ণ বেদনার ছায়া পড়েছে। দৃষ্টিও তাঁর উদাস বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন, সামনের জানালার ভিতর দিয়ে আকাশের নীলিমার মধ্যে যেন সান্ত্বনা খুঁজে ফিরছে। তাঁর শয্যার সামনে মেঝের উপর বিস্তৃত আসনে বসে আছেন এখানকার কয়েকজন অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি। এখানকার শাসনকর্তার প্রতিনিধিও রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আরও যাঁরা আছেন তাঁরা স্থানীয় বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট চিকিৎসক, কয়েকজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণও রয়েছেন, ব্রাহ্মণেরা স্বতন্ত্র আসনে বসে আছেন অবশ্য।

মৃদু স্বরে কথা চলছে : একটি কথাই বিভিন্ন ভঙ্গিতে বলছেন সকলে—

এ অরাজক। এত বড় অন্যায় আর হয় না। বর্বরতার চূড়ান্ত।

ব্রাহ্মণেরাও তাই বলছেন ; কিন্তু তাঁদের প্রকাশভঙ্গি অতি কঠোর অতি রূঢ়। বলেছেন—এ পাপ। মহাপাপ। বিধর্মী রাজশক্তির উদাসীনতাই এর কারণ। কিন্তু দেবতা ক্ষমা করবেন না।

রাজপ্রতিনিধি শ্রীনিবাসন প্রশ্ন করে উত্তরের প্রতীক্ষায় রঙ্গনাথনেরই মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু রঙ্গনাথন সেই উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিরুত্তর হয়ে বসে আছেন। ব্রাহ্মণদের কথা শ্রীনিবাসনের কানে যেতেই তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে আবার প্রশ্ন করলেন —বলুন আচার্য, আততায়ীদের কাউকেই কি আপনি চিনতে পারেন নি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রঙ্গনাথন ঘাড় নাড়লেন—না।

—কাল ছিল তিথিতে ত্রয়োদশী, আজ রাত্রে পূর্ণিমা, আকাশেও মেঘের লেশ ছিল না। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্যেও আপনি চিনতে পারলেন না। আশ্চর্য!

পণ্ডিত চিদাম্বরম এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন, এবার বলে উঠলেন— আপনি রাজপ্রতিনিধি হয়ে ব্রাহ্মণ-প্রকৃতি বিস্মৃত হয়েছেন শ্রীনিবাসন। রঙ্গনাথন ব্রাহ্মণ এবং গায়ক। সম্ভবত ভয়ে তাঁর চোখের সামনে গতরাত্রির এমন জ্যোৎস্নালোক গাঢ় অন্ধকারে পরিবর্তিত হয়েছিল। ভয়ে বোধ করি উনি চক্ষু মুদ্রিত করেছিলেন। তাঁর কথার মধ্যে শ্লেষ যেন ঝণ ঝণ করছিল।

এবার একটু বিষণ্ন হাস্যের সঙ্গে রঙ্গনাথন বললেন—আচার্য চিদাম্বরম, অম্বর চিন্ময় হলে তাতে তার স্বরূপ আবৃত হয় না, কিন্তু মৃত্তিকা-জাত কার্পাস থেকে তৈরি বস্ত্রে তারা অতি সাবধানে তাদের স্বরূপকে আবৃত করেছিল। এবং আমিও কিছু অন্যমনস্ক ছিলাম। সঙ্গীরা পশ্চাতে পড়েছিল। সুতরাং সঠিক চেনা তো সম্ভবপর হয় নি।

রাজপ্রতিনিধি শ্রীনিবাসন বললেন—তারা তো কিছু যেন বলেছিল আপনাকে। কি বলেছিল?

—হ্যাঁ, বলেছিল। এই বিকৃত ব্যাখ্যা কোথা থেকে পেলে তুমি?

চিদাম্বর বললেন—তাদের বাক্যবিন্যাস—উচ্চারণ—

বাধা দিয়ে রঙ্গনাথন বললেন—তাঁরা ব্রাহ্মণ নন আচার্য। অবশ্য গ্রাম্য-মূর্খ ব্রাহ্মণের তো অভাব নেই দেশে। বাক্‌ভঙ্গি, উচ্চারণ দিয়ে সিদ্ধান্ত করা দুরূহ। কিন্তু তবুও তারা ব্রাহ্মণ না।

চিদাম্বরম বললেন—সন্তুষ্ট হলাম রঙ্গনাথন। তোমার গানে তুমি পুরাণের যে ব্যাখ্যা করেছ তাতে তুমি আঘাত করেছ ব্রাহ্মণদেরই। তোমার প্রেম সহানুভূতি ওই সকল কৃষ্ণকায়দেরই উপর। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও মূর্খ অবশ্যই আছে। তবুও তোমার এই সিদ্ধান্তের জন্য আমি প্রীত। তার কারণ এ নয় যে তুমি ব্রাহ্মণদের সন্দেহ কর নি নিছক প্রীতির বশে বা ভয়ে। ব্রাহ্মণ-প্রকৃতির সত্য তুমি উপলব্ধি করেছ। শ্রীনিবাসন বললেন—আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন না? কণ্ঠস্বর আকার আয়তন এগুলি তো বস্ত্রাবরণের ছদ্মবেশে ঢাকা যায় না।

বেশ একটু চিন্তা করে নিয়েই যেন রঙ্গনাথন বললেন—না।

দৃষ্টি তাঁর সেই জানালা দিয়েই বাইরে নিবদ্ধ। বাইরে গোশালার ধারে বিষণ্নক্লিষ্ট শ্যামলতার মত শূদ্রকন্যাটি গোশালার কাঠের খুঁটিটি ধরে দাঁড়িয়েই আছে। বিষণ্ন বেদনাচ্ছিন্ন মুখ—চোখে যেন জল টলটল করছে। তিনি ওকে চেনেন। বড় ভাল মেয়ে। এখান থেকে অল্প দূরেই ওদের বাস। কন্যাটি সুকণ্ঠী। অন্ধ মায়ের হাত ধরে গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়াত এই কিছুদিন পর্যন্ত। তাঁর সম্মুখে বা কাছে বিশেষ আসে নি। ভয়ে আসে নি—অধর্মের ভয় শাসনের ভয় এবং লজ্জার ভয়ও বটে। গান তাঁর সামনেও কখনও গায় নি। এই সুকণ্ঠী কিশোরীর দূরাগত সঙ্গীতধ্বনি শুনে তাঁরও কখনও কখনও ইচ্ছা হয়েছে ডেকে ওর গান শোনেন। কিন্তু সামাজিক অনুশাসন এবং মর্যাদার সঙ্কোচে ডাকতে পারেন নি। তার দু'চারদিন পরই হয়তো বিস্মৃত হয়েছেন। এক

মাস আগে সমুদ্রতটে একদিন ওর সঙ্গে ক'টি কথা বলেছিলেন। তারপর আর এদিকে আসেন নি। কাল রাত্রে ওকে দেখেছিলেন। গানের সময় অনেক দূরে চত্বরের বাইরে জনতার প্রথম শ্রেণীতে একটি কাঠের দীপদণ্ডের সামনেই যেন ও দাঁড়িয়েছিল। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ওর চোখের অশ্রুধারা। আজও এসেছে—তাঁর আঘাতের কথা শুনেই এসেছে। নইলে এতটা নিকটে তাঁর আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করে গোশালার খুঁটি ধরে ও দাঁড়াতে সাহস করত না। আজও ওর চোখে জল।

শ্রীনিবাসন বললেন—এ না—কি না রঙ্গনাথন ? আমি বললাম মানুষের কণ্ঠস্বর আকার আয়তন এগুলি বস্ত্রাবরণের ছদ্মবেশে ঢাকা পড়ে না। আপনি 'না' বলে তাই সমর্থন করেছেন ?

রঙ্গনাথন বললেন—মাননীয় শ্রীনিবাসন, আমি আপনার দুটি বাক্যাংশের উত্তরেই না বলেছি। আপনার যুক্তি সত্য—ছদ্মবেশে আকার আয়তন ঢাকা যায় না; একে সমর্থন করেও বলেছি—না। আবার কাউকে সন্দেহ করি কিনা এর উত্তরেও বলেছি—না, কাউকে সন্দেহ করি না।

চিদাম্বরম বললেন—অজ্ঞাত আঘাতকারী এবং রঙ্গনাথন অসাধুতার এবং সাধুতার দুই দূরতম প্রান্তে অবস্থান করেন শ্রীনিবাসন। রেখাটি কাল অকস্মাৎ গোলাকার হতেই মুহূর্তের জন্য পরস্পরের নিকটতম স্থানে পৌঁছে সংঘর্ষ হয়েছে—তারপরই আবার সরলরেখায় দূরতম প্রান্তে চলে গেছে। সুতরাং সাধুতার উচ্চতম বা শেষতম বিন্দুতে স্থিত রঙ্গনাথ অসাধুতম ব্যক্তিকে দেখেও চেনেন নি, কণ্ঠস্বর শুনেও শোনেন নি, জেনেও জানেন না। অবান্তর প্রশ্নে লাভ নেই। রঙ্গনাথন এবার বললেন—আচার্য চিদাম্বরম, প্রণাম আপনাকে, অনুমান অভ্রান্ত আপনার। শুধু আমি সাধুতার শেষতম বা উচ্চতম বিন্দুতে পৌঁছেছি এই কথাটির প্রতিবাদ করি। আচার্য, যে পাণ্ডিত্য সাধুতার শেষতম বিন্দুর পথ বলে দেয়—তা আমার নেই। বোধ করি আপনি ওই বিন্দুতে থেকে পথের মাঝখানের যে রেখাটি ঠিক সন্দেহের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে না—তার অন্তরটি দেখতেও পারছেন না, বুঝতেও পারছেন না। আচার্য, আঘাত আমার সত্য। বেদনা দুঃখ সত্য। রক্তপাত তার সাক্ষী। যারা মেরেছে তারা ব্রাহ্মণ নয় এও সত্য। কিন্তু তারা মারলে কেন আমারে ? আমি তো তাদের আঘাত করি নি। আমার শত্রু বলে কাউকে তো মনে করতে পারছি না।

—তুমি উদার। তাই বা কেন—উদারতম ব্যক্তি। তুমি শবর চণ্ডালও ব্রহ্মবিদ্ হতে পারে বলে বিশ্বাস করেছ।

—আমি মহাভারত থেকে উপাখ্যান নিয়েছি আচার্য। মহর্ষি বেদব্যাস স্বয়ং এ সত্য মহাভারতের অঙ্গীভূত করেছেন। কেবল দুটি বিভিন্ন অংশকে আমি একত্রিত করেছি। কিরাতার্জুনীয় উপাখ্যানের আগে ধর্ম ব্যাধ উপাখ্যানের সারমর্মটুকু ভূমিকাস্বরূপ জুড়ে দিয়েছি।

কিন্তুতার ব্যাখ্যা সে তোমার নিজস্ব। "কৃষ্ণবর্ণ চর্মের অন্তরালে যিনি বসবাস করেন তিনিই বসবাস করেন বৈকুণ্ঠে। যিনি বসবাস করেন বৈকুণ্ঠে তিনিই বাস করেন শবর পল্লীতে, সকল পতিত পল্লীতে, ওই ওদের মধ্যে ওদের কৃষ্ণচর্মের অন্তরালে। কৈলাসে যিনি বাস করেন ভবানীপতি, তিনিই আছেন ওদের মধ্যে। ওদের কৃষ্ণচর্ম দেখে যদি তোমার ঘৃণা হয়, ওদের পল্লীর অপরিচ্ছন্নতায়, কটু গন্ধে যদি তোমার দ্বিধা হয় কাছে যেতে, তবে তোমার জানা হবে না তাঁকে। ব্রাহ্মণ তনয়, তুমি ব্রহ্মাভিলাষী ক্রোধে ঘৃণায় অহঙ্কারে শিক্ষার মধ্যে তোমার জানা হয় নি ব্রহ্মকে। আমি নারী, আমার ধর্মে আমি অধিষ্ঠিতা। আমার যিনি পতি তিনি শুধু আমার পূজ্যই নন তিনি আমার প্রিয়তম। তাঁর সেবা আমার ধর্মই শুধু নয়, সেই আমার জীবনধর্ম, সেই আনন্দ যার স্বাদে আর ব্রহ্মের স্বাদে প্রভেদ নেই, তুমি তাতে আমার উপর ক্রুদ্ধ হলে। সে ক্রোধে কোন ক্ষতি হয় নি বা হবে না আমার। সুতরাং তোমার পরম সত্য পরম তত্ত্বকে জানা সম্পূর্ণ হবে ব্যাধ পল্লীতে ব্যাধ ধর্মে অধিষ্ঠিত ধর্ম ব্যাধের কাছে। ঘৃণা করো না, নাসিকা কুঞ্চন করে প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে থেকো না, প্রবেশ করো। তুমি কি জান ভবানীপতি মহারুদ্র কিরাত রূপেই দেখা দিয়েছিলেন তপস্যাপরায়ণ অর্জুনকে? অর্জুন কিরাত বলে অবজ্ঞা করেছিল, ঘৃণাও করেছিল, কিরাতরূপী ভগবান তাঁর সে শক্তির অবজ্ঞা চূর্ণ করেছিলেন। হিমগিরির কাঞ্চন-জঙ্ঘার স্বর্ণচ্ছটায় প্রতিভাত স্বর্ণকান্তি কিরাত নীলগিরিতে যখন আসেন তখন তিনি সুনীল সমুদ্রলাবণ্যে অবগাহন করে হন নিবিড় নীলকান্তি। এ তো তোমারই ব্যাখ্যা রঙ্গনাথন।

—আমি কি ভ্রান্ত বা বিকৃত ব্যাখ্যা করেছি আচার্য?

—সে কথা তুমি কৃশ্চান পাদ্রীদের জিজ্ঞাসা কর রঙ্গনাথন।

শ্রীনিবাসন বললেন—এর মধ্যে কৃশ্চান পাদ্রীদের কথা তুলছেন কেন আচার্য চিদাম্বরম?

চিদাম্বরম বললেন—তার কারণ কি রাজপ্রতিনিধি আপনি, আপনার সুবিদিত নয় শ্রীনিবাসন? মাদ্রাজের চারিপাশ, সারা তেলেঙ্গানা ওদিকে ত্রিবাঙ্কুর কোচিন আজ তারা গীর্জা গড়ে এসেছে। মাদ্রাজে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত। মহারাষ্ট্র শক্তি পানিপথে প্রায় শেষ। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল নানা ফড়নবীশের মৃত্যুতে তাও গেল। তিন বছর যেতে-ন-যেতে পেশোয়া ইংরেজের কাছে অধীনতার খত লিখেছে। মহীশূরে সুলতান টিপু বিগত। সুলতান টিপু হিন্দুধর্মের বন্ধু ছিল না, কিন্তু পাদ্রীদেরও কঠোর শাসনে শাসিত রেখেছিল। নিজাম মাত্র অক্ষম। দক্ষিণে ইসলাম তিন শত বৎসরেও সনাতন ধর্মের ক্ষতি করতে পারে নি। কিন্তু খৃষ্টান ধর্মের প্রসার দেখ। এরা যে কৌশলে ধর্মের প্রসার করে চলেছে তাদের অভিসন্ধি দেখ। তাই উঠেছে এই সঙ্কটক অবস্থায় তারা অতি উগ্রভাবে ধর্ম প্রচারে শক্তি নিয়োগ করেছে। তারা অস্পৃশ্যদের এই সুযোগে বিদ্রোহী করে তুলে পরিশেষে তাদের খৃষ্টান করবে। সুতরাং কারণটা তুমি সত্য জেনেও স্বীকার করছ।

শ্রীনিবাসন বললেন—এ সব আলোচনা রাজনৈতিক আচার্য। অস্বীকার করছি না যে, এ আলোচনায় আমার অধিকার নেই। শুধু অপরাধীকে জানতে পারলে শাস্তি নিশ্চয় দেব।

চিদাম্বরম বললেন—কারণবশতঃ কার্য হয় শ্রীনিবাসন; কিন্তু এই কারণটিও স্বয়ম্ভুর মত তার পূর্ববর্তী কোন কার্য বা কারণ ভিন্ন উদ্ভূত হয় না। এ আঘাত করেছে অস্পৃশ্যরা এবং অস্পৃশ্যদের উত্তেজিত করেছে ওই খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা। রঙ্গনাথন যে ব্যাখ্যা করেছে তার গানের মধ্যে, তাকে বিকৃত করে বুঝিয়েছে ওই পাদ্রীরাই। এ সংবাদ আমি নিশ্চয়রূপে জানি। অপরাধীকে আবিষ্কার করলেও তোমাকে প্রচারের হস্ত সঙ্কুচিত করতে হবে শ্রীনিবাসন

শ্রীনিবাসন বললেন—আমি প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি, আমি তাদের আবিষ্কার করব, শাস্তি দেব। শুধু রঙ্গনাথনকে বলতে হবে—আমি চিনেছি, আকার অথবা কণ্ঠস্বর এক—শুধু এইটুকু। সকলের সম্মুখে এ আমি শপথ করছি। তারপর রাজপ্রতিনিধিত্ব পরিত্যাগ করতে হলে তাও করব আমি।

সকলে একবাক্যে বলে উঠল—সাধু সাধু সাধু

ওপাশে বসেছিলেন বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী গোপালন। তিনি বললেন, আততায়ীর নাম বা সন্ধান তিন দিনের মধ্যে আমি আপনাকে

দেব মাননীয় শ্রীনিবাসন। আমি ব্যবসায়ী—আমার দোকানে বহু-লোকের সমাগম হয়, বহুজন কর্ম করে। এ সন্ধান পেতে আমার দেরি হবে না। তবে আচার্য চিদাম্বরমের কথা সম্পূর্ণ সত্য। এ কথা আমিও জানি। আচার্য রঙ্গনাথন এই গান করেন প্রথম কাঞ্জীভরমে তাঁর ব্যাখ্যা বহু উচ্চবর্ণের জ্ঞানী-গুণীর কাছে প্রীতিদায়ক হয় নি, ব্যথিত হয়েছেন—বলেছেন, এ তত্ত্ব, এ ব্যাখ্যা সকলের জন্য নয়; তবু অস্বীকার করেন নি, সাধুবাদ উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু শবরদের মধ্যে এ ব্যাখ্যা ক্ষোভের কারণ হয়েছে। আপনারা বর্ধিষ্ণু শবর ব্যবসায়ী খৃষ্টান যোশেফকে জানেন? খৃষ্টান হয়েছে—ইংরাজী ভাষা শিখেছে—তবু সে যে শবর সে কথা ভুলতে পারে নি। সেও বোধ হয় কাঞ্জীভরমে গিয়েছিল গান শুনতে। আমার কাছে কিছুদিন আগে সে নারিকেল আর নারিকেল-দড়ির চালান এনেছিল। রঙ্গনাথনের গানের কথাই আলোচনা হচ্ছিল। আমরা সকলেই প্রশংসা করছিলাম একবাক্যে। অপূর্ব এবং হৃদয়স্পর্শী ব্যাখ্যা। যোশেফের মুখ চোখ ক্ষোভে কঠিন হয়ে উঠল। বললে, কুৎসিৎ, কুৎসিত—শেঠ গোপালন, অতি কুৎসিৎ ব্যাখ্যা। অতি সুকৌশলে আমাদের জাতিকে হেয় করা অবজ্ঞা করা ছাড়া আর কিছু নয়। কোথায় আমাদের পল্লীতে আবর্জনা, কোথায় দুর্গন্ধ? রঙ্গনাথন এতে ঈশ্বরের দয়া পাবে না, তাঁর কাছে শাস্তি পাবে। এ আমি নিশ্চয় বলে দিলাম—তুমি দেখো। হাতের মুষ্টিটা দৃঢ়বদ্ধ করে বললে, আমরা শবর থেকে কৃশ্চান হয়েছি, তবুও আমরা শবর। এই উক্তি এবং তার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার এলাকা তার সঙ্গে আঘাতকারীরা ব্রাহ্মণ নয়—

ঘরের সামনের বারান্দা থেকে কেউ বললে—ব্রাহ্মণ এবং শবর ছাড়া কি আর কারুর বা কাদেরও দ্বারা এ কাজ হতে পারে না শ্রেষ্ঠী গোপালন?

—কে? আলি নাসের সাহেব—

—হ্যাঁ, আমি।

—আপনি এসেছেন? তা বাইরে কেন?

—ভিতরে স্থান সংকীর্ণ। বাইরেই রয়েছি। রঙ্গনাথন আমার বড় প্রিয় গায়ক। আমি মুসলমান হলেও এসব পালাগান শুনতে ভালবাসি যেদিন বিষ্ণুকাঞ্চীতে রঙ্গনাথন এই গান প্রথম করেন সেদিন আমি ব্যবসায়সূত্রে ওখানে গিয়েছিলাম। রাত্রেও ছিলাম। সেখানে শিবকাঞ্চীর একদল আধা সন্ন্যাসী ভক্তের আলোচনা আমি শুনে

এসেছি। আমাকে তারা গ্রাহ্য করে নি। তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিল, এর জন্য রঙ্গনাথনের শাস্তি বিধান করবে তারা। বৈষ্ণব ধর্মের এই একাকার করার পন্থার প্রতি, রঙ্গনাথনের ব্যাখ্যার প্রতি তাদের আর ঘৃণার শেষ ছিল না।

তাঁর কথায় ঘরের ভিতরের প্রত্যেকেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল অর্ধোন্মাদ কোপন স্বভাবের ভক্ত আছে বটে।

শ্রীনিবাসন বললেন আচার্য চিদাম্বরমকে—আচার্য!

আচার্য চিদাম্বরম বললেন—হ্যাঁ, শুনলাম। একটু স্তব্ধ থেকে আবার বললেন—অসম্ভব নয় শ্রীনিবাসন। আমাদের গুণ-বারিধির সীমা-পরিসীমা নেই। ধর্মে ধর্মে বিরোধ সে ছেড়েই দিলাম। ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধও অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ডের মত জ্বলছে। রঙ্গনাথন ধর্মের অগ্নিতে হবি দিতে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিরোধের বহ্নিও জ্বলে উঠে থাকতে পারে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তা হলে আকার আয়তন কণ্ঠস্বর বাক্‌বিন্যাস থেকে রঙ্গনাথনকে কষ্ট করে আততায়ীর স্বরূপ অনুমান করতে হবে না। তাদের গাত্রগন্ধ থেকেই অনুমান হবে সর্বাগ্রে। তাদের গায়ের একটি গন্ধ আছে—যেমন বৈষ্ণবেরও আছে। রঙ্গনাথন—

শ্রেষ্ঠী গোপালন বললেন—শৈব অর্ধোন্মাদদের সন্দেহ করে কৃশ্চান জোসেফ এবং পাদ্রীদের ছেড়ে দেওয়া অনেকটা নিরাপদও হবে।

শ্রীনিবাসন বললেন—নিরাপত্তার কথা পরে শ্রেষ্ঠী গোপালন। আগে আচার্য রঙ্গনাথন বলুন।

রঙ্গনাথন বললেন—গন্ধের কথা স্মরণ করতে পারছি না রাজপ্রতিনিধি। তবে হতে পারে না এমন কথা বলতে পারি না। এবং এরপর সনাতন-ধর্মী মূর্খ গোড়ার দলই যে হতে পারে না তাই বা কেমন করে বলব আচার্য চিদাম্বরম, আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি। চিদাম্বরম বললেন—রঙ্গনাথন, ভালই বলেছ তুমি। তুমি উদার। ঠিক এই মুহূর্তে একজন বারান্দা থেকে ঘরে প্রবেশ করল এবং অতি সন্তর্পণে দেওয়ালের প্রান্তভাগ ঘেঁষে গোপালনের কাছে গিয়ে অতি মৃদুস্বরে প্রায় কানে কানে কিছু বললে।

গোপালন চমকে উঠে বললেন—কই, কোথায়?

—ওই যে গোশালার কাঠের খুঁটি ধরে। জানালার দিকে আঙুল

বাড়িয়ে সেও সবিস্ময়ে বলে উঠল—কই। ওই তো ওইখানেই তো দাঁড়িয়েছিল। কই!

সকলেই বিস্ময়ভরে প্রশ্ন বলেন—কে? কি?

—যোশেফদের গ্রামের একটি মেয়ে। লল্লা বলে একটি মেয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করে সেই-ই। ওই গোশালার খুঁটি ধরে সেই সকাল থেকেই ওখানে দাঁড়িয়েছিল। আপনাদের কথা শুনে আমি ভিতরে বলতে এসেছি —আর দেখি নি। আমার সন্দেহ হয়েছিল এই কথাগুলি শুনে অবশ্য যে ও এখানে এসেছে সংবাদ সংগ্রহের জন্য। তাহলে ঠিক তাই।

রাজপ্রতিনিধি শ্রীনিবাসন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে পড়লেন এবং ঘরের বাইরে এসে ডাকলেন—থিরুমল!

কোতোয়ালীর কর্মচারী থিরুমল এসে সম্ভ্রমভরে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

—দেখ তো থিরুমল, এই স্থানটি তন্ন তন্ন করে সন্ধান করে দেখ—এখানে লল্লা বলে কোন শবরকন্যা—

—গান গেয়ে সে তো তার অন্ধ মায়ের হাত ধরে ভিক্ষা করে বেড়াত। তাকে তো চিনি। সে তো এখানেই ছিলো। ওইখানে ওই গোশালার ধারে।

—খোঁজ। তাকে খোঁজ। বের কর তাকে। সত্বর কাউকে আশ্রমের বাইরে পাঠাও দেখি।

রঙ্গনাথন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন—আচার্য, রাজপ্রতিনিধি, এ কী করছেন? এইখানেই এসে আমি দেখেছি একটি ম্লানমুখী শবর বালিকা গোশালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু কী অপরাধ করলে রাজপ্রতিনিধি?

রাজপ্রতিনিধি বললেন—আমার কর্তব্যকর্মে বাধা আপনি দেবেন না রঙ্গনাথন। আপনি সরল—

আচার্য বললেন—সরল নয়, নির্বোধ।

রঙ্গনাথনকে চুপ করতে হ'ল।

থিরুমল তার চৌকিদারদের নিয়ে তল্লাস শুরু করলে। গোশালার অভ্যন্তর ঘরের মাচান, বাইরে প্রতিটি গাছের আড়াল—গাছের ঘন পল্লব ভেদ করে শাখাপ্রশাখায় দৃষ্টি সঞ্চালন করে দেখলে কোথায় গেল। তাদের সঙ্গে সমবেত লোকদেরও কিছু লোক যোগ দিলে সন্ধানে। কই, —কোথায়? আশ্রম থেকে বেরিয়ে চারপাশ তারা দেখলে—চারপাশে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখলে। কই—কোথায়?

একজন বললে—বেলাভূমি তো দেখা হয় নি।

ছুটে গেল একজন। তারপর পিছন পিছন আরও কয়েক জন। বেলাভূমি নির্জন। ঝিনুক শামুক বিকীর্ণ—দূর সুদূর মনে হয়। দিগন্ত পর্যন্ত বালুতট চলে গেছে। কোলে কোলে অশান্ত গাঢ় নীল সমুদ্র গর্জন করে আছড়ে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। দুরন্ত বাতাস নিরন্তর ক্রন্দন করে বয়ে চলছে হা হা করে। একদল উপকূলবর্তী নারিকেল তালের সারির অন্তরালে যথাসম্ভব সন্ধান করলে। কিন্তু কই? সে কোথায়? নেই তো!

শ্রীনিবাসন বললেন—আমি এর প্রতিকার করবই! অপরাধীকে দণ্ড দেবই। সকল জনের সম্মুখে দেবতা সাক্ষী করে শপথ করলাম আমি। সে তারা যেই হোক। শৈব অর্ধোন্মাদ অথবা কৃশ্চান প্রচারক নিয়োজিত নির্বোধ যোশেফ—যাই হোক।

আচার্য চিদাম্বরম বললেন—শ্রীনিবাসন তোমার সংকল্পে দেবতা এবং ধর্ম তোমাকে সাহায্য করবেন।

শুধু—। রঙ্গনাথন!

—আচার্য!

—তোমাকে দৃঢ়চিত্ত হতে হবে।

—সত্য বাক্য বলব আমি আচার্য। সত্যে স্থিতির চেয়ে তো দৃঢ়তা আর হতে পারে না আচার্য!

—হ্যাঁ রঙ্গনাথন: মহাভারতে আছে—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামা হত উচ্চকণ্ঠে বলে নিম্নকণ্ঠে ইতি গজ বলে সত্য বলার নীতির নিয়ম রক্ষা করেছিলেন কিন্তু ধর্ম তাঁকে ক্ষমা করে নি। তাঁকে নরক দর্শন করতে হয়েছিল। মনে রেখো। চল শ্রীনিবাসন।

শ্রীনিবাসন বললেন—এখানে প্রহরার জন্য জন দুয়েককে রেখে যাই।

রঙ্গনাথন হাত জোড় করে বললেন—মার্জনা করুন রাজপ্রতিনিধি। তার চেয়ে আমার মৃত্যুই শ্রেয়।

শ্রীনিবাসন সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রঙ্গনাথন বললেন—কতদিন আমাকে প্রহরাধীনে রেখে রক্ষা করবেন আপনি? অসম্মান করবার জন্য কথাটা বলি নি আমি। আপনি চিন্তা করে দেখুন।

শ্রীনিবাসন উত্তর দিলেন না। প্রহরীদের নিয়ে তিনি চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে শ্রেষ্ঠী গোপালন, আচার্য চিদাম্বরম এবং তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপর সকলেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই আশ্রম প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল।

রঙ্গনাথন আশ্রমে একরকম একাই বাস করেন। জীবন তাঁর বিচিত্র।

ব্রাহ্মণের সন্তান কিন্তু শাস্ত্রবিদ্ বা পণ্ডিত তিনি নন। নিতান্ত বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হয়ে অনাথে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁকে পালন করেছিলেন একজন বৈষ্ণব সাধু। রঙ্গনাথনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি—রঙ্গনাথনের সুস্বর এবং সঙ্গীতে জন্মগত অনুরাগ ও অধিকার দেখে। তিনিই তাঁকে গান শিখিয়েছিলেন। এবং পুরাণ কথা মুখে বলে শুনিয়ে পুরাণে পারঙ্গম করে তুলেছিলেন। তারপর পাঠিয়েছিলেন কর্ণাটক সঙ্গীতের একজন কর্ণধারের কাছে। ভক্তিবাদী বৈষ্ণব সাধুর তিনি ছিলেন ভক্ত। বালকের অনুরাগ, অধিকার এবং সুস্বর দেখে তো মুগ্ধ তিনি হয়েই ছিলেন—কিন্তু তারও থেকে বেশী মুগ্ধ তাঁকে করেছিল বালকের হৃদয়ের মমতার তৃষ্ণা। মমতার কাঙাল ছিল। শুধু পাবার জন্যই নয়, তার আপন মমতা রাখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আধার খুঁজে সে ফিরত। ক্রমে তার সঙ্গীত রচনার শক্তি স্ফুরিত হ'ল—তখন সে যুবা, সঙ্গীত গুরু তখন তাকে বিদায় দিলেন; পাঠিয়ে দিলেন বৈষ্ণব সাধুর কাছে। তাঁকে জানিয়েছিলেন এর পর নিজের পথ সে নিজেই করে নেবে। এখন শুধু চাই এর জীবনের সঞ্চয় রাখবার একটি আধার। আপনি নিজে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন.

কথাটা সত্য। এক গানের সময় ছাড়া বাকি সময় সে এক নিরবচ্ছিন্ন উদাসীনতায় মগ্ন থাকত। বৈষ্ণব গুরু জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এমন উদাসীন হয়ে তুমি কেন থাক রঙ্গনাথন?

করুণ রঙ্গনাথন বলেছিলেন—জানি না প্রভু। হয়তো—

—হয়তো কি রঙ্গনাথন?

—ঠিক জানি না প্রভু, মনে হয় বড় একা আমি।

—তুমি সংসার কর রঙ্গনাথন। আমি আমার গৃহী শিষ্যদের বলি—তারা একটি সুন্দরী সুশীলা পাত্রী দেখে দেবে।

হাত জোড় করে রঙ্গনাথন বলেছিলেন—না প্রভু, না।

—কেন?

—সংসারে আমি অনুপযুক্ত। আমার ভয় করে।

—ভয় করে?

—হ্যাঁ প্রভু। বড় ভয় আমার। আপনি আমাকে পালন করেছেন। আপনি গুরু। আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলছি না।

গুরু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করেছিলেন—তোমার কিসে সবচেয়ে উল্লাস বোধ হয় বলো তো? নিজেকে বুঝে সন্ধান করে বল;

কখনও কোন মুহূর্তেই তুমি এই উদাসীনতা থেকে মুক্তি পাও না? ক্ষণেকের জন্যও কি মনে হয় না তুমি আনন্দ বোধ করছ? তুমি সুখী?
অনেকক্ষণ পর রঙ্গনাথন বলেছিলেন—হ্যাঁ প্রভু, সঙ্গীত-গুরুর সঙ্গে কয়েকবার সঙ্গীতের বড় আসরে গান গাইবার সুযোগ পেয়েছিলাম। বহু শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে যখন আমাকে সাধুবাদে অভিনন্দিত করেছিল তখন মনে হয়েছিল আমি সুখী।
—একলা বসে কখনও কি আনন্দ অনুভব কর না?
—করি প্রভু। সে বিচিত্র অবিশ্বাস্য কথা। কেঁদে আমি আনন্দ পাই। যখন "আমার কেউ নেই"—এই চিন্তা গাঢ় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তখন চোখ থেকে জল গড়িয়ে আসে আপনি। আরও একটি কারণে কান্না আমার পায়— [illegible] দুঃখ দেখে।
গুরুর মুখ [illegible] হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন—এইটিই আমার শেষ [illegible] বল রঙ্গনাথন যখন বিপদ হয়, দুঃখ খুব গভীর হয় —কাকে ডাকতে [illegible] করে? কাকে মনে পড়ে? কার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়?
—ঠিক জানি না। তবে বি[illegible] পড়লে আপনার কথা মনে পড়ে, মনে হয় আপনার কাছে গেলেই পরিত্রা[illegible] পাব। কিন্তু দুঃখ গভীর হলে তো কাউকে মনে পড়ে না। মনে হয় আ[illegible] একা। কেউ নেই আমার।
কয়েকদিন পর গুরু তাঁকে ডেকে বলেছিলেন—রঙ্গনাথন, এ কয়েকদিন চিন্তা করে আমি দেখলাম। জীবনের আধেয় [illegible] মার অমৃতের মত। সে অমৃত রাখবার স্বর্ণপাত্র নেই, পাচ্ছ না বলে তোমার [illegible] বেদনা এই দুঃখ। গানের প্রশংসায় তোমার আনন্দ। গানই হোক [illegible] মার কর্ম: অনেক প্রশংসা পাবে—প্রতিষ্ঠা পাবে। সে সব যদি তুমি গোবিন্দ চরণের আধারে সঞ্চয় করতে পার তবে এই জন্মেই মুক্তি হবে তোমার।
সেই সাধনাই করে আসছেন রঙ্গনাথন। একাই চলেছেন তাঁর বীণাটি হাতে। তাঁর বাদকেরা আছে, প্রয়োজনমত আসে। না হলে একাই থাকেন। ঠিক একা নয়—পরিচারক আছে বৃদ্ধ কুড়ুমুনি।
সঙ্গীতের জন্য তাঁর খ্যাতি হয়েছে। তাঁর গান হবে শুনলে সহস্র জনের সমাগম হয়। গানের সময় তাদের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে তাঁর বুক ভরে ওঠে আনন্দে। গুরুর কথা স্মরণ করে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে চোখ বুজে বলেন—তোমাতে অর্পণ করছি। গান শেষে প্রসাদী মালা নিয়ে ফিরে আসেন; ধনীর গৃহ থেকে সম্মান অর্থ নিয়ে ফিরে আসেন; পথ থেকেই

সে আনন্দ মিলিয়ে যেতে শুরু করে। বাড়িতে এসে বীণাটি পাশে রেখে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই উদাসীনতা আবার তাঁকে আশ্রয় করে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার মধ্যে তাঁর মধ্যমাঙ্গুলি বীণার তারে মৃদু আঘাত করে, মনে যেন ধ্বনি ওঠে—কেউ নেই তার। বিগ্রহের মুখ স্মরণ করতে চেষ্টা করেন। স্মরণ হয় না, তার বদলে ভেসে ওঠে সপ্রশংস-দৃষ্টি কোন শ্রোতার মুখ। কখনও কখনও দুঃখীজনের মুখ মনে পড়ে। কোন ভিক্ষুক। কোন নিপীড়িত মানুষ। তার মধ্যে নারীর মুখও আছে। কিন্তু কোন বিশেষ একটি নারীর মুখ বার বার ভেসে ওঠে না। কিছুদিন থেকে তাঁর মনকে আলোড়িত করেছে এই শবরদের দুঃখ। কিছুদিন আগে তিনি মহাবলীপুরমে সমুদ্রতটভূমি ধরে পথযাত্রা করেছিলেন উত্তর মুখে। এই উদাসীনতা যেন হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলের কুয়াশা ও ঘন শীতে বরফ হয়ে জমে স্তূপীকৃত হয়ে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। অনেক বেদনাতুরাতা ও ভারাক্রান্ততার পর একদিন সারারাত্রি কেঁদেছিলেন। পরদিন তুষারাচ্ছন্ন জীবন ভূমি ও নির্মল মানসাকাশ নিয়ে তিনি পড়তে বসেছিলেন মহাভারত। সাবিত্রী উপাখ্যান মনকে আকৃষ্ট করেছিল। তার প্রধান কারণ মহীয়সী সাবিত্রী মদ্ররাজ কন্যা। মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা। তিনি যাচ্ছিলেন মাল্যবান পর্বতবেষ্টিত পম্পা সরোবর দেখতে এবং সেখানে স্নান করতে। ইচ্ছা ছিল সেখানে বসেই সাবিত্রী উপাখ্যান নিয়ে পালা গান রচনা করবেন। ওইখানেই আছে সেই মহামহিমময় ভূমি—যেখানে কৃষ্ণাচতুর্দশীর প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে মৃত সত্যবানের মাথা কোলে রেখে বসে চোখে দেখেছিলেন কৃষ্ণজ্যোতিষ্মান মৃত্যুদেবতাকে। ইচ্ছা ছিল গভীর রাত্রে বনে বসে বীণা বাজিয়ে মনে মনে গেঁথে যাবেন সুর এবং কথা। কিন্তু তা হয়নি। হঠাৎ তিনি রুদ্ধগতি হয়ে গিয়েছিলেন একখানি শবর পল্লীতে। ঝড় উঠেছিল সমুদ্রে। আকাশ নিকষ কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে এল, তার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়। সমুদ্র-বেলাভূমির বালুকণা উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভেঙে পড়েছিল তাল নারিকেল শীর্ষ। শাখাপ্রশাখা সমন্বিত গাছ যেগুলি সেগুলির শাখা ভাঙছিল, পাতাগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে যাচ্ছিল, মধ্যে মধ্যে দুচারটি সমূলে উপড়ে গিয়ে মাটিতে অন্য গাছের উপর সবেগে আছড়ে পড়ছিল। উচ্ছ্বসিত সমুদ্রতরঙ্গ পাহাড়ের মত উঁচু আকার নিয়ে বেলাভূমি পার হয়ে স্থলভাগে এসে প্লাবন বইয়ে দিচ্ছিল।

রঙ্গনাথন সমুদ্রকে পিছনে রেখে পশ্চিম মুখে স্থলভূমির অভ্যন্তরে আত্মরক্ষার জন্য প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছিলেন। বহু কষ্টের পর একখানি শবর পল্লী পেয়ে বেঁচে ছিলেন। কালটা দিনমান ছিল তাই পেয়েছিলেন—নইলে পেতেন না। নাতি উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল। সবটাই ছোট ছোট গাছের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তারই মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ পেয়ে যথাসাধ্য দ্রুত যেতে যেতে হুঁচোট খেয়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। জ্ঞান হলে দেখেছিলেন টোডা জাতীয় শবরদের পল্লীতে শুয়ে আছেন একটি ছোট কুটিরে। ঝড় তখন কেটে গেছে। ছোট গ্রাম, পনর কুড়ি ঘর মানুষের বাস। কুটির নামেই কুটির। তৃণাচ্ছাদিত কুঁড়ে। কৃষ্ণকায় সবল নরনারীর দল। বন থেকে জীবিকা সংগ্রহ করে। এদের দক্ষিণী রূপ রঙ্গনাথন দেখেছেন। উত্তরে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছিল সে রূপের। মেয়েরা বুকের উপরে কাপড় পরে। কাঁধ খোলা। পুরুষদের কাপড় সামান্য, কোমর থেকে জানু পর্যন্ত। তাও অনেকের নেই, সামান্য কৌপীন সম্বল। জ্ঞান যখন হয়েছিল তখন শিয়রে বসেছিল এক বৃদ্ধা। তাকে তিনি তামিল ভাষাতেই প্রশ্ন করেছিলেন—তোমরা আমাকে বাঁচিয়েছ ?

প্রৌঢ়ার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, কথা সে বলতে পারে নি। এরপর খবর পেয়ে এসেছিল পল্লীর কর্তা। সে বলেছিল, বাঁচাবার মালিক তোমাকে বাঁচিয়েছে। আমরা অচেতন অবস্থায় তোমাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। বাঁচবে সে আশা করি নি।

কর্তার পিছনে দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছিল পল্লীর সমস্ত লোক। প্রতিটি জনের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন আনন্দ এবং মমতায় মিশ্রিত প্রসন্ন দৃষ্টি। অকস্মাৎ পিছন থেকে একটা তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ চীৎকার উঠেছিল। নারী কণ্ঠে কে চীৎকার করে বলেছিল—রক্ত রক্ত—ওর রক্ত নে। আমাদের রক্ত নিলে। নে নে। ছাড়্ পথ ছাড়্।

গ্রামের কর্তা চকিত হয়ে বলেছিল—যা যা, ওকে নিয়ে যা। এখানে এল কি করে ? তারপর তাঁর বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন —ও পাগল।

সন্ধ্যার পর থেকে সারারাত চীৎকার করেছিল মেয়েটি। আতঙ্কের চীৎকার। যেন দলে দলে আততায়ীরা তাকে আক্রমণ করতে এসেছে। নিদারুণ আতঙ্কে চীৎকার করেছে।

কর্তা তার বীণাটি এনে পাশে রেখে বলেছিল—এটি আপনার পাশেই পড়েছিল।

—হ্যাঁ। আমার বীণা। ভেঙে গেছে, এতে আর কাজ হবে না। হাতে থাকলে গান শোনাতাম। তোমরা প্রাণ বাঁচিয়েছ।

—গান! কর্তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তুমি গান গাও?

—হ্যাঁ। গাই।

—আমাদের শোনাবে? আমরা গান ভালবাসি।

—তোমরা গান গাও না? মেয়েরা নাচে না?

—নাচত। গাইত। খুব ভাল। ওই পাগল মেয়েটা সবচেয়ে ভাল নাচত। ওটা আমার মেয়ে। কিন্তু—এখন পাগল। শুধু চেঁচাবে, সারারাত চেঁচাবে। মাঝে মাঝে ঘুম আসে, হঠাৎ ঘুম ভাঙে আর চেঁচায়। এলো—এলো। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে। ওর উপর বড় জুলুম করেছে। মরে যদি যেত—

রঙ্গনাথন কি উত্তর দেবেন? কি বলবেন? চুপ করে ছিলেন নির্বাক হয়ে। কিছুক্ষণ পর বলেছিলেন—গান গাইব? শুনবে? শুধু গলাতেই?

—গাও। গাও। সেটা ওরও ভাল লাগবে।

—তিনি গেয়েছিলেন। ছোট একটি পালা গান। রামায়ণের—গুহক চণ্ডালের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিতালি।

ওই পাগলিনী এসে বসেছিল শান্ত হয়ে। সকলের পুরোভাগে বসেছিল। আশ্চর্য শ্রীময়ী মেয়ে। নিতান্ত তরুণ বয়স। কুড়ির নিচে।

গান শেষ হলে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল—রামচন্দ্রের লোকেরা এসে ঘর পুড়িয়ে দিলে না?

কর্তা উদ্বিগ্ন হয়ে তাকে হাত ধরে বলেছিল—উন্নি, উন্নি— সীতারাম, সীতারাম। বলতে নাই। সীতারাম।

—হাঁ। সীতারাম। ভগবান।

—হ্যাঁ। ভ-গ-বা-ন।

—ভগবান দুঃখ দেয় না। জবরদস্তি জুলুম করে না। মানুষ—মানুষ করে। তারপরই চীৎকার করে উঠেছিল—মরে যা। মানুষ মরে যা।

বাবে রঙ্গনাথন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—উন্নি কেন ও কথা বললে? কর্তা বাবা বলেছিল সব কথা। এ গ্রাম তাদের সেই প্রাচীন-কালের বাসভূমি নয়। তাদের বাস ছিল সমুদ্রের ধারে বন্দর শহরের কাছে —খানিটা দূরে। একসঙ্গে তারা থাকত—প্রায় পঞ্চাশটি পরিবার। জুলুম তাদের উপর হয়—হ'ত। কিন্তু গত দু-বৎসরে মারাঠা নিজাম আংরেজদের লড়াই হয়েছে। সেই লড়াইয়ে তাদের গোটা গ্রামটা জ্বলেছে চারবার। দুবার জ্বালিয়েছে বর্গীরা, একবার ইংরেজ, একবার নিজাম। যার পথে যখন পড়েছে, সে জ্বালিয়েছে—জুলুম করেছে। এই মেয়েটাকে—উন্নিকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ধরে রেখেছিল তিন দিন। তিন দিন পর যখন ছেড়ে দিলে—তখন ও পাগল। রাত্রি হলেই চীৎকার করে—না—না—না—। ছেড়ে দে। ছেড়ে দে। মেরে ফেল। মেরে ফেল। সারারাত। দিনের বেলা নতুন লোক দেখলে ছুটে গিয়ে লুকোয়। লোকজন থাকলে তখন চেঁচায়—রক্ত নে, রক্ত নে। ওরা কেন রক্ত নিলে! আমাদের গ্রামে চার বারো তারা কুড়িজনের বেশী লোককে খুঁচে মেরেছে ও দেখেছে। সেই থেকে আমরা গ্রাম ছেড়ে এই বনে এসে ঘর বেঁধেছি। এই দেখ—এখন ঘরগুলান ভাল করতে পারি নি, কুঁড়ি বেঁধে আছি। এখনও সব বলছে—ইখানেও নয়—চল—আরও বনের ভিতরে চল। যেখানে কেউ খোঁজ পাবে না।

রঙ্গনাথনের চোখ জলে ভরে উঠেছিল। সারারাত ঘুমাতে পারেন নি। পরের দিন তিনি তাদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসে মাল্যবান পম্পা সরোবরের দিকে পিছন ফিরে, ফিরে এসেছিলেন মান্দ্রাজের পাশে তাঁর আশ্রমে।

মনের মধ্যে শুধুই ভেবেছিলেন এদের কথা। এই সরল মানুষ, দীন মানুষ, বঞ্চিত মানুষ, পদানত মানুষদের কথা। কেন? কেন এত অত্যাচার এদের উপর? কেন এত অবজ্ঞা? কেন এত ঘৃণা? মহাভারত মনে পড়েছিল।

মহাবলীপুরমে পাথরের বুকে খোদাই করা অর্জুনের তপস্যা কাহিনী মনে পড়েছিল।* অর্জুনের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে স্বয়ং মহারুদ্র এসেছিলেন কিরাত বেশে—সঙ্গে এসেছিলেন কিরাত নারীবেশে স্বয়ং পার্বতী।

---

* এখন এই খোদাই চিত্র ভগীরথের তপস্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে অর্জুনের তপস্যা নামেই পরিচিত ছিল।

এইটি অবলম্বন করেই তিনি নতুন গান রচনা করে বলবেন এরা সেই রুদ্রের বংশধর। অস্পৃশ্য নয়, পরম পবিত্র—বিপুল শক্তির অধিকারী। তারপর মনে পড়েছিল—ধর্মব্যাধের কথা যাঁর কাছে গিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ কুমার কৌশিক ব্রহ্মকে জানবার জন্য। তার কিছুটাও জুড়ে দিয়েছিলেন।

কৌশিককে ব্যাধের কাছে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন এক পতিতা নারী। তিনিই বলেছিলেন—ঘৃণা নিয়ে যেয়ো না। মনে রেখো—ওই কৃষ্ণবর্ণ মানুষগুলির অন্তর মন্দিরে যিনি বসবাস করেন—তাঁরই বসতি সর্বোচ্চ স্বর্গে গোলক নিবাসে। এইটুকু হয়েছিল ভূমিকা এবং এইটুকুই কিছু বিশদ করে হয়েছিল উপসংহার। পথেই শুরু হয়ে গিয়েছিল রচনা। ফিরে এসে রচনা করেছেন আর কেঁদেছেন। এই রচনার সময়েও একদিন তিনি ওই শবর কন্যা লল্লার দূরাগত সঙ্গীত শুনেছিলেন। ভগবানের স্তবগান করে বোধ হয় ভিক্ষা করছিল। কন্যাটি বিচিত্র। শুনেছিলেন। যোশেফের আপন জন, নাকি আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরের কন্যা। এই ব্যবসায় আরম্ভ করেছিল লল্লারই বাপ। যোশেফ তখন যোশেফ হয় নি। তবে পাদ্রীদের কাছে যাতায়াত ওর অনেক দিন থেকেই। গির্জার সংলগ্ন বাগানে ও কাজ করত। বাড়ি থেকে ঝগড়া করে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর লল্লার বাপের মৃত্যুর পর গ্রামে ফিরে দাদার ব্যবসায়ের ভার নিয়েছিল। অল্প চার-পাঁচ বছরেই সে সমৃদ্ধ করে তুলেছে তার ব্যবসায়। এখন ব্যবসায় তার। এরই মধ্যে সে নিজে খৃষ্টান হয়েছে, তার গ্রামের আরও অনেককে খৃষ্টান হতে প্রলুব্ধ করেছে। মান্দ্রাজে কোম্পানির চাকরি বড় প্রলোভন। তার সঙ্গে পোশাক, মর্যাদা—অনেক কিছু। হিন্দু-সমাজের যারা মাননীয়, যাদের সঙ্গে এক পথে হাঁটবার উপায় নেই, যাদের গায়ে কোনরকমে তাদের ছায়া পড়লে তাদের অপরাধ হয়—তাদের উপেক্ষা করার, অস্বীকার করার অধিকার পেয়ে তারা প্রমত্ত উল্লাসে মেতে উঠেছে। মুক্তিও পেয়েছে বইকি। গ্রামে তাদের এখন পাদ্রীদের পাঠশালা হয়েছে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পাচ্ছে। লল্লাও শিক্ষা পেয়েছিল। তার মায়ের আপত্তিতেই ধর্মান্তর তারা গ্রহণ করে নি। নইলে—। না না, তা তো নয়। মেয়েটির গান শুনে তা তো মনে হয় না। মেয়েটি সুকণ্ঠী—তার ওপর ওই টোডা মেয়েটির—ওই উন্নির চেয়েও সুশ্রী। তার উপর একটি মার্জনা আছে। শিক্ষার মার্জনা—নগর বাসের মার্জনা।

এই মেয়ে—। সে কি এইখানে এসেছিল সংবাদ সংগ্রহ করতে? তার চোখে যে জল তিনি দেখেছিলেন—তা কি শান্ত সমুদ্রের নিস্তরঙ্গতাকে বিষণ্নতা ধরে নেওয়ার মত একটি কল্পনা! মাত্র স্বেচ্ছাকৃত ভ্রম। যোশেফও তাঁর অপরিচিত নয়। তার সঙ্গীরাও তাঁর পরিচিত। কতদিন তারা গান শুনে যায় তাঁর আশ্রমের সামনে ওই বেলাভূমে বসে। দেখা হলে প্রসন্ন হাসিতে ভরে ওঠে তাদের মুখ, চোখ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে জ্বলন্ত প্রদীপের মত। অপরিমেয় ভালবাসা ব্যক্ত করেছে সামান্যতম উপলক্ষে। আশ্রমের বাঁশের ফটকটির পাশে রেখে যায় ফুলের গুচ্ছ। সবুজ কাঁচা নারিকেল, পরিপুষ্ট কলা, অমৃত ফলের সময় অমৃত ফল—বাঁশের নতুন আধারে সাজিয়ে এসে ডাকে—আচার্য! আচার্য!

তিনি শুনতে পেলেই বাইরে এসে বলেন—এস। আমার এখানে কোন সঙ্কোচ নেই। এস।

তারা হাসি মুখে এসে পাত্রটি নামিয়ে দিয়ে বলে—আমার বৃক্ষের ফল। আপনার জন্যে এনেছি।

তিনি তুলে নিয়ে বলেন—আজ আমার দেবতা পরম তৃপ্তিতে ভোজন করবেন ভদ্র।

রঙ্গনাথন তাদের ভদ্র ছাড়া সম্বোধন করেন না।

অবশ্য এসব আদান-প্রদান খৃষ্টান শবরদের সঙ্গেই বেশী হয়।

খৃষ্টানেরাও আসে—যোশেফই এসেছে। সে একবার তাঁকে নারিকেল রজ্জুর সুন্দর পাপোশ তৈরি করে এনে দিয়ে গেছে। তার কণ্ঠস্বর সঙ্কোচহীন কিন্তু সহজ নয়। এই সঙ্কোচ বর্জনের প্রয়াসেই কিছুটা যেন অস্বস্তিকর। ডেকে বলেছিল—সঙ্গীতচার্য, রয়েছ নাকি?

—কে?

—আমি যোশেফ।

—এস এস।

—তোমার জন্য এই পাপোশটি নিয়ে এসেছি। দেখ তো, সুন্দর হয় নি?

—সুন্দর—সুন্দর হয়েছে ভদ্র।

—ভদ্র কেন বলছ? বল যোশেফ।

—বেশ, তাই বলব।

—হ্যাঁ। আমি তো এখন একজন কৃশ্চান জেন্টু। জান তো?

—হ্যাঁ, জানি।

—আমি তোমাকে সঙ্গীতাচার্য রঙ্গনাথন বলব। কিছু মনে করবে না তো?

—না না। কেন মনে করব?

—এই কারণেই তোমার জন্যে এটি আনবার ইচ্ছা হ'ল। ওই সব ব্রাহ্মণ আচার্যদেব আমি এ সব দিই না। তারপর বলেছিল, জান সঙ্গীতাচার্য, তোমার গান শুনবার আমার ইচ্ছা হয়। কিন্তু আমরা অনেকেই তো প্রভু যিশুকে ভজনা করি। তাই ভয় হয় যদি প্রভু রুষ্ট হন। পাদ্রী বাবারা রুষ্ট হবেন এ নিশ্চিন্ত। নইলে রীতিমত তোমার দক্ষিণা দিয়ে পালা গান শুনে একদিন আনন্দ করতাম। তুমি যেতে আচার্য?

একটু ভাবতে হয়েছিল তাঁকে। গেলে হয়তো উচ্চবর্ণের সমাজে, দেবমন্দিরে তাঁর প্রবেশপথ রুদ্ধ হতে পারে।

যোশেফ বলেছিল—তোমার ইচ্ছা আছে সে আমি জানি আচার্য। আমারই মত তোমারও ভাবতে হচ্ছে পুরোহিত পণ্ডিত সমাজপতিদের কথা। হ্যাঁ ভাবনার কথা।

—হ্যাঁ যোশেফ, ভাবছি তাই।

—থাক আচার্য। তোমার গান আমরা দূর থেকেই শুনব। কিন্তু তোমার গানে তুমি বড় বেশী কাঁদাও।

কালো মানুষটি শুভ্র সুন্দর সুগঠিত দুপাটি দন্ত বিস্তার করে হেসেছিল —আমরা হাসতে ভালবাসি। বলে সে চলে গিয়েছিল। যেতে যেতে আবার ফিরে এসে বলেছিল—আচ্ছা, একটা কথা বলতে পার?

—কি বল।

—হাসতে ভালবাসি। তোমার গানে কাঁদতে হয়। তবু যাই। আর কেঁদেও সুখ হয়। কেন বল তো? হেসে রঙ্গনাথন বলেছিলেন— তোমারই মত ওর উত্তর আমি জানি না যোশেফ।

—আমার ভাইঝি—সে খুব ভাল গান গায়। খুব ভাল কণ্ঠ। আর শুনেই শিখে নেয়। মধ্যে মধ্যে যখন মেজাজ খারাপ হয় ওকে ডাকি। গান গাইতে বলি। শুনে মেজাজ ভাল হয়।

—হ্যাঁ। দূর থেকে ওর গান শুনেছি আমি। সুন্দর কণ্ঠ।

—ওকে দেখেছ? সুন্দর দেখতে। ওকে আমাদের খৃশ্চান পাঠশালায় লেখাপড়াও শিখিয়েছি। দাদা মারা গেল। ভার তো আমার ওপর। ইচ্ছা ছিল ভাল লেখাপড়া শেখাব, খৃশ্চান করে দেব—ভাল বিয়ে হয়ে যাবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কত ছোকরা ইংরেজ কর্মচারী আসে।

তারা এখানে বিয়ে করে। তা দাদা ছিল গোঁড়া আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ওর বউটা বেশী। সেই মা-ই ওকে হতে দেয় নি খৃশ্চান। রাগ করে আমার কাছ থেকে এক মুঠো চালও নিত না। ভিক্ষে করে খেতো। আমিও খুব কড়া লোক, খুব কড়া। আমিও দিই নি। তা ছাড়া আইনের ভয় আছে। জান তো, ও থেকেই ওরা বলতে পারে আমরা এক সংসার। সব কিছুতে তাদের ভাগ আছে। মেয়েটার বিয়ে হবে —জামাই দাবি করবে। ওর মাটা অন্ধ হয়েছিল—মেয়ের হাত ধরে গান গেয়ে ভিক্ষে করত। রোজগার ভাল হ'ত আচার্য। মেয়েটা এখন মায়ের গোঁড়ামি পেয়েছে। মা বলত, খৃষ্টান হতে কখনও দেব না। তার চেয়ে কোনও মন্দিরে দিয়ে আসব, মন্দিরের চারপাশ ঝাড়ু দেবে, বাইরে দাঁড়িয়ে গান করবে—ওর গতি হয়ে যাবে।

অবাক হয়ে শুনেছিলেন সোমনাথন। এ সবই নূতন কিছু নয়। শুনেছেন। তিনি বৈষ্ণব—কত অদ্ভুত ভক্ত জীবনে সত্য হয়ে গেছে। কিন্তু এমন করে চোখের সামনে ঘটছে—অথচ জানেন না—এইটেতে বিস্ময় তাঁর। যোশেফ বলেছিল—মেয়েটা নাচতেও পারে। এখন ওর ইচ্ছে ভাল করে নাচ শেখে, গান শেখে। কোন কথাকলির দলে ওকে দেওয়া যায় না আচার্য? তুমি একটু সাহায্য করতে পার না? ঠিক বলছি তোমাকে, লল্লা খুব নাম করবে। খুব ভাল পারবে।

এ সব ঠিক পম্পা সরোবর যাবার আগের কথা। পম্পা সরোবর যাবেন —স্নান করবেন—সাবিত্রীর উপাখ্যান নিয়ে পালা রচনা করবেন এই ভাবনার মধ্যে যোশেফ লল্লা এদের কথা মনেই পড়ে নি। পথে ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে টোডা গ্রাম থেকে ফিরে আসবার পথে কিন্তু ওই উন্নি মেয়েটির সঙ্গে লল্লার স্মৃতি জড়িয়ে গিয়েছিল। উন্নিকে মনে হলেই তার পিছনে লল্লা এসে দাঁড়াত। মনে হ'ত লল্লার ভাগ্যেও হয়তো এমনই দুর্গতি লেখা আছে। ভেবেছিলেন যোশেফকে ডেকে বলবেন —যোশেফ, লল্লা তোমার ভাইঝি! দেশকাল তো দেখছ। আজ যুদ্ধ —কাল যুদ্ধ। রাজারা সব সামুদ্রিক ঝড়ে নারিকেল সুপারি বৃক্ষের মত পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে লল্লাকে এমন ভিক্ষা করে বেড়াতে দিয়ো না। ওর বিয়ে দাও। সংসারী করে দাও। পল্টনের সিপাহী—সে তোমার যেমন দেশী হিন্দু মুসলমান তেমনি ফিরিঙ্গী। এদের কাছে আমরা সবাই দুর্বল। তার উপর মান্দ্রাজ নগর দিন-দিন বড় হচ্ছে। নানান স্থানের ধনী আসছে, দুষ্ট আসছে। এরাও বর্বর। সংসারে মানুষ ভূমি

আর নারীর প্রলোভনে জন্তু হয়ে যায়। কন্যাটির বিয়ে দিয়ে ওকে কিছুটা রক্ষা কর, নিরাপদ কর। ভেবেছিলেন বলবেন, কিন্তু তাও ভুলে গেছেন। বলা হয় নি। যোশেফও এ দিকে আসে নি। লল্লার কণ্ঠস্বর দূর থেকে তাঁর কানে আসে নি। তিনি নিজেও রচনার কাজে এমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগ ছিল না।

লল্লাকে এরপর দেখেছিলেন কাঞ্জীভরমে—বরদরাজের মন্দির-চত্বরে এই গান প্রথম দেবতা ও সাধারণের সামনে গাইবার দিন। মন্দির প্রবেশ-পথে গোপুরমের বাইরে সে দাঁড়িয়েছিল অস্পৃশ্য শ্রোতাদের মধ্যে। মেয়েটিকে দেখে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল, এই কি লল্লা নয়? হাতে করতাল, কাঁধে ভিক্ষার ঝোলা। রঙ কৃষ্ণবর্ণ নয়, শ্যামবর্ণ। সুন্দর মুখশ্রী। তন্বী দীর্ঘাঙ্গী। পরনের হরিদ্রাবর্ণ মোটা কার্পাস বস্ত্রখানি নিম্নপ্রান্ত বাহুবন্ধনীর আকর্ষণে হাঁটুর উপরে উঠেছে। খাটো অঞ্চলখানি কোন মতে বুকের বক্ষাবরণীকে ঢেকে কাঁধ পার হয়ে পিঠে পড়েছে। মাথায় রুক্ষ কালো চুলের রাশি—রঙীন ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে পাক পাকিয়ে পরিষ্কার বাঁধা। তাতে একগুচ্ছ ফুল।

দেখে একটি টুকরো স্মিত হাসি বিকশিত হয়ে উঠেছিল তাঁর মুখে। ভিখারিণী হলে কি হবে, জীবনে যৌবন-ধর্মের লীলা অমোঘ। তৈলহীন অবিন্যস্ত চুলের বোঝার উপরে পুষ্পগুচ্ছটি গুঁজেছে লল্লা। লল্লার দৃষ্টিতে মুগ্ধ সম্ভ্রম। তার প্রতি দৃষ্টিপাতের জন্য তার চোখে ওই মুগ্ধ সম্ভ্রমের শিখা জ্বলে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে সশ্রদ্ধ হাসি। সে যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। করতাল নিয়েই হাত দুটি কৃতাঞ্জলিতে আবদ্ধ করেছিল লল্লা। মণিবন্ধে অনেকগুলি শঙ্খবলয় পরেছে, হাতের আঙুলগুলি দীঘ—তার অনামিকায় পিতলের অঙ্গুরীয়। পায়ে? পায়ে ভূষণ পরে নি? হ্যাঁ, তাও পরেছে। রূপদস্তার চরণভূষাও পরেছে।

আসবার সময়ও দেখেছিলেন। গোপুরমের মাথায় ঝোলানো বড় দীপাধারটির আলো পরিপূর্ণভাবে তার মুখে পড়েছিল। শুভ্র চক্ষুচ্ছদ রক্তাভ মনে হয়েছিল। চক্ষুপল্লবের দীর্ঘ রোমগুলি সিক্ত। লল্লা গান শুনে কেঁদেছিল।

সেদিন রাত্রে লল্লার কথা ভেবেছিলেন। চিন্তিত হয়েছিলেন। যে যৌবন-ধর্ম পুষ্পিত বৃক্ষের পুষ্পগুচ্ছের দিকে তার অন্নকাঙাল ভিক্ষাপাত্র-বাহী হাতটিকে ভিক্ষাপাত্রের কথা ভুলে প্রসারিত করে—সেই যৌবন-

ধর্মে মানুষ মাটির বন্ধুরতার কথা ভুলে গিয়ে আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে পথ হাঁটে। মৃত্তিকা পরমাশ্রয়—সে আশ্রয়ে পাথর কাঁটা কীট পতঙ্গ সরীসৃপ খানাখন্দরের তো অভাব নেই। আবার জ্যোৎস্নার বিষম-লাগা চোখে রঙীন সাপকে মালা ভ্রম করে গলায় পরাও তো বিচিত্র নয়।

মনে পড়েছিল উন্নিকে। শিউরে উঠেছিলেন। লল্লাও পাগল হয়ে যাবে না তো! কাঞ্জীভরম থেকে ফিরে এসেই তিনি যোশেফকে বলবেন ভেবেছিলেন। কাঞ্জীভরম থেকে পরদিন প্রাতে এক প্রহরের সময় রওনা হয়েছিলেন। সকলে প্রত্যাশা করেছিলেন শিবকাঞ্চী থেকে তাঁর আহ্বান আসবে। এর পূর্বে তাই হয়েছে। তিনি বৈষ্ণব—বরদরাজের শতস্তম্ভ মণ্ডপে গান তিনি প্রথম করে থাকেন, তারপর আহ্বান আসে শিবকাঞ্চী থেকে। একে একে একাম্বরেশ্বর, মাতঙ্গেশ্বর, ঐরাবতেশ্বর, ত্রিপুরান্তকেশ্বর মণ্ডপে গান তিনি করেন। কোনবার এক যাত্রাতেই সেরে আসেন—কোনবারে এক যাত্রায় মনস্তবপার হয় না, তুবার তিনবার যেতে হয় কাঞ্জীভরমে। এবার কোন মন্দির থেকে আহ্বান আসে নি। তিনি লোক পাঠিয়েছিলেন একাম্বরেশ্বর মন্দিরের কর্তৃপক্ষের কাছে। রঙ্গনাথন কাল প্রভু বরদরাজকে গান শুনিয়েছেন—আজ প্রভু একাম্বরেশ্বরের মণ্ডপে—মধ্যপথেই রূঢ়ভাবে বাধা দিয়ে মঠাধীশ বলেছিলেন—না।

লোকটি বিস্মিত হয়েছিল। সঠিক বুঝতে পারে নি। সে কিছুটা বিভ্রান্তের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই ছিল, বলতে কিছু পারে নি, চলে আসতেও পারে নি।

মঠাধীশ বলেছিলেন—একাম্বরেশ্বর সম্প্রতি দ্বাররুদ্ধ করেছেন। অর্জুনের তপস্যায় যে কিরাত বেশে এসেছিলেন—সেই কিরাত বেশের জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করবেন চিন্তা করছেন। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হলে রঙ্গনাথন পালাটিকে যখন সম্পূর্ণ করবে তখন শুনবেন একাম্বরেশ্বর।

লোকটি ফিরে এসে সব বলতেই রঙ্গনাথনও একটু চিন্তিত হয়েছিলেন। তিনি কি ভুল করেছেন? কোথাও কোন অপরাধ করেছেন মহেশ্বর মহিমা কীর্তনে? চিন্তান্বিত হয়েই ফিরেছিলেন আশ্রমে।

আশ্রমে ফিরে আগাগোড়া রচনাটি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন—খুব যত্ন এবং তীক্ষ্ণ সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছিলেন। কোথাও কোন অপরাধ তো চোখে পড়ে নি! হঠাৎ মনে হয়েছিল—ব্যাস

লিখেছেন—স্বর্ণকান্তি কিরাতরূপী মহাদেব। হ্যাঁ, এখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন—হিমগিরির অরণ্যে যিনি হিমাচলে কাঞ্চনজঙ্ঘার জ্যোতি-স্নাত হয়ে স্বর্ণকান্তিতে বিচরণ করেন—তিনিই নীলগিরিতে বিচরণ করেন নীলাভ কৃষ্ণকান্তিতে, নীলসমুদ্রের লাবণ্য অঙ্গে মেখে শবর বেশে। তাতে অপরাধ হয়েছে? না—কখনও না। আর কি? মহাভারতে অঙ্গগন্ধের কথা নেই। তিনি অঙ্গগন্ধের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, দেবতা যখন ব্যাধ শবর বেশ ধারণ করেন তখন তাঁর দেহগন্ধকে লুকিয়ে কটুগন্ধই ধারণ করেন অঙ্গে। এতে অপরাধ হয়েছে? না। স্বীকার করতে তিনি পারেন নি।

পরদিন পত্র লিখতে বসেছিলেন তিনি। লিখেও ছিলেন—মহামান্য পূজ্যপাদ আচার্যদেব, দেবাদিদেব একাম্বরেশ্বর দ্বাররুদ্ধ করিয়া কিরাতবেশ ধারণের জন্য প্রায়শ্চিত্তের চিন্তা করিতেছেন অবগত হইয়া কৌতূহলবশে একটি প্রশ্ন নিবেদন করিতেছি। দেবাদিদেব কি অনাদিকাল থেকে শ্মশানবাসের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তকথাও চিন্তা করিতেছেন না?

লিখে অনেকক্ষণ পত্রখানি ধরে বসেছিলেন। পাঠাবেন?

এই সময়েই তিনি গান শুনতে পেয়েছিলেন। সমুদ্রতটে বসে কেউ গাইছে। অতি মিষ্ট নারীকণ্ঠ। এই লল্লা! লল্লা গাইছে। উপকূল অভিমুখী সমুদ্রবায়ু বয়ে নিয়ে আসছে। তিরুকুরুলের পদ। দ্রাবিড় ভারতের ঋষি তিরুবল্লুবর, প্রণাম তোমাকে। কী রচনাই দিয়ে গেছ। লল্লা গাইছে—

> বেণু বীণা রবে কেন এত মিছে মোহ—
> বালগোপালের হাসি কাকলী
> শুনিস নি কি তোরা কেহ?

বাঃ! এর আগে অবশ্য এমন করে মন দিয়ে কখনও লল্লার গান শোনেন নি রঙ্গনাথন। কানে ঢুকেছে—ভাল লেগেছে ওই পর্যন্ত। তখন লল্লা সম্পর্কে কোন বিশেষ কৌতূহল ছিল না। সেদিন তাঁর মনে কৌতূহলের অনেক কারণ ছিল।

ওর সম্পর্কে যোশেফের কথাগুলি রঙ্গনাথনের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। খৃষ্টান হয়েছে বলে যোশেফের তণ্ডুলমুষ্টির সাহায্যও নেয় না। খৃষ্টান হবে না বলে গান গেয়ে ভিক্ষা করে খায়। ওদের পোশাকের লোভ সামলেছে। ওদের প্রবল প্রতাপের মোহেও আচ্ছন্ন

হয় নি। ওদের সাদা রঙ ওর চোখে কাজল পরায় নি। মনে মনে বলেছিল—বাঃ বাঃ বাঃ।

তারপর উন্নিকে দেখে ওর সম্পর্কে একটি আশঙ্কা জেগেছিল। যদি অসহায়া বালিকাটি এমনি করে পাগল হয়ে যায়! আহা-হা-হা!

পরশু কাঞ্জীভরমে গোপুরমের সামনে কৃতাঞ্জলিপুট লল্লার চোখের শ্রদ্ধাভারাবনত দৃষ্টি দেখে অন্তরে অন্তরে স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। আজ গান গাইছে—সে গান মহর্ষি তিরুবল্লুবরের তিরক্কুলের পদ। সপ্রশংস হয়ে উঠলেন রঙ্গনাথন—অনেক শিখেছে লল্লা।

তিনি সেদিন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সমুদ্রতটে এসে দেখেছিলেন নারিকেল কুঞ্জে একটি বৃক্ষকাণ্ডে ঠেস দিয়ে বসে সে গাইছে।

কৃষ্ণ গোপাল—কৃষ্ণ গোপাল—কৃষ্ণ গোপাল—
বরদরাজ—বরদরাজ—বালগোপাল!

অংশটুকু লল্লা নিজে জুড়েছে ওর সঙ্গে। বুদ্ধিমতী লল্লা। বাঃ! পিছন দিক থেকে এসে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে সরবে 'বাঃ' কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন।

চমকে উঠেছিল লল্লা। চকিত ভঙ্গিতে পিছন ফিরে তাঁকে দেখেই লজ্জায় আনত হয়ে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যেন পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গিয়েছিল। রঙ্গনাথন বলেছিলেন—বাঃ! তুমি তো বড় চমৎকার গান কর! সুন্দর!

লল্লা উত্তর দিতে পারে নি। নীরবে আরও একটু যেন নত হয়ে গিয়েছিল। রঙ্গনাথন আর কথা খুঁজে পান নি। না পেয়েই বোধ হয় বলেছিলেন—থামলে কেন? গাও।

অতি মৃদু জড়িত কণ্ঠে সে বলেছিল—না প্রভু। আপনার সামনে গাইতে পারব না।

তার সে কথায় আশ্চর্য আকুতি ছিল, কথা বলতেই কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সেইটিই তার সব থেকে বড় আকুতি।

এবার রঙ্গনাথন বলেছিলেন—তিরক্কুলের পদ শিখলে কি করে?

—মঠে শুনেছি প্রভু। শুনে শিখেছি।

—শুনে?

—হ্যাঁ প্রভু। যেটুকু মনে থাকে লিখে রাখি।

—লিখতে পার তুমি? ও হ্যাঁ—যোশেফ বলেছিল, তুমি পাদরীদের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখতে।

অল্প শিখেছিলাম। তারপর মা আর পড়তে দেয় নি।

—শুনেছি।

—মা বলেছিল, লল্লা তোর বাপ বলত কলাত্তন্না আমার বরদরাজ স্বামীর কির্‌পা পাবে।

—কলাত্তন্নী কে?

এবার মুখ তুলে স্মিত হেসে বলেছিল—আমি প্রভু। ডাকনাম আমার লল্লা। ছেলেবেলা থেকে গাইতে পারতাম, নাচতাম গান গেয়ে বরদরাজের নাম গেয়ে। তালি দিত বাপ, তাল ভঙ্গ হ'ত না। তাই বাবা নাম রেখেছিল—, কাঞ্চীতে গিয়ে নামটা নিয়ে এসেছিল; এক বৈষ্ণব সাধুর কাছে বাবা আমার কথা গল্প করেছিল—আমার গল্প ফুরোত না তার। সাধু বলেছিলেন, এ কন্যা তোমার কলাত্তন্নী কন্যা—বরদরাজ কির্‌পা করবেন।

রঙ্গনাথন বুঝলেন, একটু হেসে বললেন—ও! কলাবন্তী!

—হ্যাঁ প্রভু, কলাবন্তী। লজ্জিতভাবে আবার সে মাথাটি নামাল। আপন মনে রঙ্গনাথন শব্দটি বার তিনেক উচ্চারণ করলেন—কলাবন্তী। কলাবন্তী। কলাত্তন্নী।

তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন—কলাত্তন্নী—কল্যাণী! কল্যাণী! তুমি কল্যাণী হবে তার চেয়ে।

মাথা সে আবার তুললে—কল্যাণী!

—হ্যাঁ, কল্যাণী। কলাবন্তীও তুমি বটে, কল্যাণীও তুমি বটে। তোমার কল্যাণী রূপটিই আমার ভাল লাগে লল্লা। আমি তোমাকে কল্যাণীই বলব।

মুগ্ধ কণ্ঠে কৃতার্থর মতই সে বলেছিল—কল্যাণী!

—হ্যাঁ, কল্যাণী। নৃত্যগীতে পারঙ্গমা হয়ো তুমি। কলাবন্তী নাম তোমার সার্থক হোক। কিন্তু জীবনে তুমি কল্যাণী হবে।

দূর থেকেই সে প্রণতা হয়েছিল বেলাভূমের উপর। রঙ্গনাথন পরম স্নেহে এগিয়ে গিয়ে তার মাথার রুক্ষ কেশরাশিতে হাত রেখে বলেছিলেন—কল্যাণী হও।

সেই ভূমিষ্ঠ অবস্থাতেই সে চমকে উঠেছিল—তার সে চমক তিনি মাথায় হাত দিয়েই অনুভব করেছিলেন। সে উঠে কাতরস্বরে বলেছিল—আমাকে ছুঁলেন প্রভু!

রঙ্গনাথন বলেছিলেন—তুমি সেদিন আমার গান শুনেছ কাঞ্চীভরমে।

শোন নি, বৈকুণ্ঠধামে যাঁর বসতি তিনিই বাস করেন পৃথিবীতে মানুষের সাদাকালো সকল চর্মের অন্তরালে। এ কি, তুমি কাঁদছ ?

হাসবার চেষ্টা করে চোখ মুছে সে বসেছিল—এ শুনলে আমার কান্না পায় প্রভু! এমন কথা তো কেউ বলে না। আপনি বড় ভাল—প্রভু, আপনি বড় ভাল।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়েছিল যোশেফকে যে কথাটা বলবেন ভেবেছিলেন সেই কথাটা। এই মেয়ে, এমন কণ্ঠস্বর, এমন সুগঠিত দেহ—নব-পল্লবের মত শ্যাম দেহবর্ণ যা শবরদের মধ্যে দুর্লভ; এই দুটি দীর্ঘায়ত চোখ; এই কন্যা—আর এই মাৎস্যন্যায়ের কাল, এর—

উন্নিকে মনে পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন—তোমার অভিভাবক কে কল্যাণী ?

তিনি তার দিকে চেয়েছিলেন, সে আনত দৃষ্টিতে মাথা নীচু করে বসেছিল। নীরবতার পর এই বাক্য ক'টি হারিয়ে গিয়েছিল, সে ধরতে পারে নি। তিনি আবার ডেকেছিলেন—কল্যাণী!

—আমাকে বলছেন প্রভু ?

—হ্যাঁ। এই মাত্র যে তোমার নাম দিলাম কল্যাণী।

হেসে সে বললে—কলাতুন্নী নামও আমার সবসময় খেয়াল থাকে না লল্লা না বললে—

হাসলে আরও একটু।

—তোমার অভিভাবক কে ? যোশেফ ?

—অভিভাবক ? না প্রভু। মানুষ কেউ আমার অভিভাবক নেই। নিতান্ত বালিকা বয়সে, আমার তখন ছ সাত বছর বয়স—

—জানি, যোশেফ আমাকে বলেছে। বলেছে—সে তোমাকে খৃষ্টান ধর্মে—

—ও কথা শুনতেও আমাকে বারণ করে গেছে আমার মা। আমার বাবা বলে গেছে আমি বরদরাজের কৃপা পাব। আমার কাকা আমার অভিভাবক নয়। সে আমাদের সব নিয়ে নিয়েছে। ও ব্যবসা তো আমার বাবার ব্যবসা। বাড়ি জমি তাও নিয়েছে। আমাকে হয়তো—আমাকে বেচে দেবে ফিরিঙ্গীদের কাছে।

তার সুন্দর শান্ত চোখ দুটি উত্তেজনায় বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। মসৃণ ললাটখানি ভরে উঠেছিল সারি সারি কুঞ্চনরেখায়। রঙ্গনাথন বলেছিলেন—তাহলে কে তোমার অভিভাবক ?

—মা মরবার সময় বলে গেছে—লল্লা, বরদরাজ তোকে দেখবেন।

কথাটা এবার ঘুরিয়ে পেড়েছিলেন তিনি—তোমার বাবা কি তোমার বিয়ের কোন সম্বন্ধ করে যায় নি ?

—না প্রভু।

—তোমার মা ?

—তিনিও না। তিনি বলে গেছেন, এদের কারুকে বিশ্বাস নেই লল্লা। এরা সব খৃষ্টান হয়ে যাবে। তুই ওই বরদরাজের মন্দিরের চারপাশ ঝাড়ু দিবি। ভিক্ষা করবি।

—তা হলে—

—আমি তাই করব প্রভু। গান গাইতে পারি, ছেলেবেলা থেকে গান গেয়ে ভিক্ষে করি। বাইরে—দেবস্থানেই বেশী কেটেছে আমার। গ্রামে কখনও কখনও আসি। এদের মতন থাকা—সে আমি আর পারব না প্রভু।

সে অকস্মাৎ সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরালে। তারপর বললে—আমি আপনার কাছেই এসেছিলাম প্রভু। কথাকলি নাচ শিখবার আর গান শিখবার যদি কোন সুবিধা করে দেন—

—তোমার কাকা আমাকে বলেছিল—

—সে আমার শত্রু। তার নাম আপনি করবেন না। শুধু আমার নয় —আপনারও। আজ সকালে কাঞ্চী থেকে এসে গ্রামে গিছলাম। সেখানে দেখলাম কাকা আপনার নামে গজরাচ্ছে। বলছে, গান গেয়ে শবরদের আপনি অপমান করেছেন। আপনাকে দেখবে।

রঙ্গনাথন সবিস্ময়ে বললেন—আমি অপমান করেছি ?

—তারা তাই বলছে।

—তুমি ? তুমিও শবরকন্যা কল্যাণী। তোমার মনেও কি আঘাত লেগেছে ?

—সেদিন রাত্রে গান শুনতে শুনতে কেঁদেছিলাম। আপনি যখন বেরিয়ে এলেন তখনও চোখের পাতায় জল লেগে ছিল। ভালবাসায় মানুষ কাঁদে—সে কান্না সেইদিন কেঁদে বুঝেছি।

—তবে এরা কেন রাগ করলে বলতে পার ?

—তা তো জানি না। শুধু এরাই নয়, শিবকাঞ্চীতে তারা নাকি আপনাকে কখন ডাকবে না।

—সেটা জানি।

তারপর অনেকক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে—লল্লা ছিল মাটির জগতের দিকে তাকিয়ে। সমুদ্র দ্বিপ্রহরের আভাসে ঘনতর নীল এবং তরঙ্গশীর্ষ তীব্রোজ্জ্বল রৌদ্রচ্ছটায় ঝলমল করে উঠে পরক্ষণেই গাঢ় নীলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। তিনি শুধু ভাবছিলেন—কেন ?

—কেন ? এরা এমনি—

—প্রভু !

—কিছু বলছ ?

—আপনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। এবার যাবার সময় আমি চরণস্পর্শ করে প্রণাম করি।

—নিশ্চয়। তুমি কল্যাণী। আর আমার প্রভুর কাছে সংসারে সব মানুষ সমান। হয়তো লল্লা, সবাই তিনি। ভক্ত শুধু আমি।

—কী সুন্দর কথা প্রভু।

প্রণাম করে উঠে সে বলেছিল—আমার নাচ গান শিখবার সুযোগ কি হবে না প্রভু আমি শবরী বলে ?

—দেখব আমি। এবং হবে, নিশ্চয় হবে।

বেলাভূমির নারিকেল সুপারির ঘন বীথিকার মধ্য দিয়ে সে চলে গিয়েছিল। তিনি চিন্তিত মনে ফিরে এসেছিলেন।—কেন ? কেন ? কোথায় কোন্ ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটল ?

অনেকক্ষণ পর তিনি চিত্তকে দৃঢ় করে বলে উঠেছিলেন—না, আমার অন্যায় হয় নি—হয় নি। আমি সত্যকে প্রকাশ করেছি। সত্যেরও আঘাত আছে। মিথ্যাশ্রয়ী এবং ভ্রান্তজনেরা সে আঘাতে আহত হয়। ক্রুদ্ধ হয়। হোক—তাই হোক। তিনি আবার এই গান করবেন। সারা দেশে এই গান সুরে কথায় আচ্ছন্ন করে দেবেন।

এ সব তো এই এক মাস আগের কথা। এক মাস পর শুক্লা ত্রয়োদশী ছিল কাল, কাল এই গান গেয়ে ফিরবার পথে এই ঘটনা।

* * *

কালও লল্লা ছিল—বাইরে যে সব শ্রোতা দাঁড়িয়ে শুনেছিল তাদের প্রথম সারিতে। কালও একটি দীপাধারের আলো তার মুখের উপর পড়েছিল। সে তাঁকে শ্রদ্ধা করে—গভীর শ্রদ্ধা; সেটা সে তাঁকে প্রতি বার নিবেদন-কালে জানাতে চায়; তাই সে এমন করে দাঁড়ায় প্রতি বার। কালও তার দীর্ঘ অক্ষিপল্লবগুলি ভিজে ছিল। তিনি

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কাল তার সঙ্গে কথা বলবার তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কন্যাকুমারীর একদল যাত্রী এসেছিল পার্থ সারথি ও কপালীশ্বর দর্শনে। তাঁদের এক প্রৌঢ়া কুমারী সন্ন্যাসিনী তাঁকে এসে অভিনন্দিত করতে গিয়ে তাঁর বিলম্ব করে দিয়েছিল— সেই সময় সে চলে গিয়েছিল। আজ সে এসেছিল তাঁকে অজ্ঞাত আততায়ীরা আঘাত করে আহত করেছে শুনে। ছুটে এসেছিল।' এসে দূরে গোশালার চালায় বেদনার আর্তিতে যেন নিজে ভেঙে পড়ে কোন রকমে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল। চোখ ছল ছল করছিল তিনি দেখেছেন। ঠোঁট দুটিও কাঁপছিল নিশ্চয়। শান্ত কোমল-প্রকৃতি ভক্তিমতী মেয়েটি কথা কইবার সুযোগ পেলে বোধ হয় শুধু 'প্রভু' এই কথাটি উচ্চারণ করেই রুদ্ধবাক হয়ে যেত। চোখের কোণ দুটি থেকে অশ্রুর দুটি ধারা গড়িয়ে পড়ত। ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠত প্রবল কম্পনে। তাকে এরা ধরেছে শবরদের চর।

কিন্তু তারা কি শবর? শবরই যদি হয় কেন তাকে তারা আঘাত করলে? তিনি তো তাদের ভালবেসেই ওই পরম সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সমস্ত জীবনাবেগ দিয়ে। তারা তো এর পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে গভীর ভালবাসা দিয়ে অভিষিক্ত করেছে। এদের বালক বালিকা যুবক প্রৌঢ় যে মুগ্ধ দৃষ্টিতে, প্রশংসা-প্রসন্ন হাসিতে তাঁর যে আরতি করেছে তা তো ব্রাহ্মণ শৈব ধনী বিদ্বানেরা করে নি। তারা দিয়েছে প্রসাদ, এরা করেছে পূজা। তবে? তা ছাড়া—। গন্ধের কথা এঁরা তুলেছিলেন। কথাটা খুব যুক্তিসঙ্গত। গাত্রগন্ধ একটা আছে। সেটা ছদ্মবেশে ঢাকা পড়ে না। গাত্রগন্ধ একটা পেয়েছিলেন। সেটা কি শবরদের?

না।

তবে? শৈবদের?

তারাই বা এতটা ক্ষিপ্ত হবেন কেন? হতে পারে। ধর্মের আবেগ— প্রবলতম আবেগ। স্বর্গলোক থেকে পৃথিবীর বুকে যে বেগের প্রচণ্ডতা নিয়ে গঙ্গা ঝরে পড়েছিলেন, যে বেগের মুখে ঐরাবত ভেসে গিয়েছিল, তার থেকেও এ আবেগের বেগ প্রচণ্ডতা—প্রবলতর, প্রচণ্ডতর।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। কি করবেন তিনি? তিনি তো দ্বন্দ্ব কলহ হিংসা' চান নি। উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। তবে এমন কেন হ'ল!

—আচার্য রঙ্গনাথন রয়েছে?

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন রঙ্গনাথন। যোশেফের কণ্ঠস্বর। যোশেফ—

—আচার্য—

নিজেকে সংযত করে নিয়ে তিনি উত্তর দিলেন—যোশেফ, এস এস। যোশেফ এসে ঢুকল। চোখে তার প্রখর দৃষ্টি, পদক্ষেপ যেন যুদ্ধকামীর মত উদ্ধত এবং অপ্রয়োজনে দীর্ঘ ও সবল।

—তোমাকে কারা আঘাত করেছে শুনলাম রাত্রির অন্ধকারে?

একটু হেসে রঙ্গনাথন বললেন—হ্যাঁ। মাথায় আঘাত করে তারা দ্রুত পদে চলে গেল। সঙ্গের সঙ্গীরা সংখ্যায় তাদের থেকে বেশী ছিল এবং কাছেই ছিল। নইলে হয়তো—

—আমি দুঃখিত আচার্য। কিন্তু তার থেকেও বড় দুঃখে ক্ষুব্ধ যে তুমি আমাদের সন্দেহ করছ।

—আমি করি নি যোশেফ, করেছেন অপর সকলে। তুমি মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠী গোপালনের দোকানে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিলাম। মনে আঘাত লেগেছিল আমার।

—একটা প্রশ্ন করব তোমাকে?

—মেরেছি কি না? আচার্য, আমি মারলে এইটুকু আঘাত দিতাম না। উচ্চ বর্ণের হিন্দু, বিশেষ করে আবার যারা তারা দেহের শক্তিতে দুর্বল ভীরু, কিন্তু কুটিল এবং মারাত্মক তাদের বিষ। সাপের মত। এদের মাঝখানে পা দিয়ে ছেড়ে দেওয়ায় বিপদ আছে। আমি একবারে মেরে ফেলতাম।

—তা আমি প্রশ্ন করি নি।

—ও, তবে কৃশ্চান হয়েছি বলে জিজ্ঞাসা করছ? শোন আচার্য, কৃশ্চান হয়েও শবর ছিলাম এটা ভুলতে পারি না।

—তাও নয় ভাই। আমার প্রশ্ন আমি তো তোমাদের ভালবাসি এবং সেই কথাই তো বলেছি। তবে কেন দুঃখ পেলে তোমরা?

—কেন?

এ প্রশ্নে স্তব্ধ হয়ে যোশেফ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বোধহয় ভেবে নিলে। তারপর বললে—কথাটা তোমার সত্য। এতটা ভাবিনি। তবে এটা সত্য রঙ্গনাথন, গান শুনে রাগ হয় আমাদের। সঙ্গে সঙ্গে এও বলি, আঘাত আমরা করি নি। এটা বিশ্বাস করো।

—বিশ্বাস করলাম যোশেফ।

—আমার ভাইঝি লল্লা এসেছিল ? তাকে এখানে শ্রীনিবাস চৌকিদার দিয়ে পাকড়াতে চেয়েছিল আমাদের গুপ্তচর বলে ?
—হ্যাঁ। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম যোশেফ। কিন্তু তারা শোনে নি।
—তাও শুনেছি। কিন্তু সে তোমার ভক্ত। ভক্তি করে। তোমার গান সে আমাদের সকলের চেয়ে ভালবাসে। তাই সে এসেছিল বোধ হয়। গুপ্তচর আমাদের নয়। আমাদের কেউই সে নয় আর। তার মা তাকে আমাদের পর করে দিয়ে গেছে। তাকে ভিক্ষুক করে দিয়ে গেছে। মন্দির ঝাঁট দিয়ে খেতে বলেছে। সে ভিক্ষুক। শবরদের চেয়েও অধম। গুপ্তচর হলে শৈবদের—আমাদের নয়।
একটু তিক্ত হেসে বললে—চর সে কারুরই নয় রঙ্গনাথন—সে তোমার উচ্ছিষ্ট-সন্ধানী লোভী কুক্কুরী।
—যোশেফ !
রঙ্গনাথনের কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে উঠল এবার।
হেসে যোশেফ বললে—সেদিন বালুবেলায় তোমাদের আলাপ আমাদের কেউ কেউ দেখেছে, শুনেছে। তার কাছে তুমি বড় ভাল—বড় ভাল রঙ্গনাথন। তুমি তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছ, সে তোমার পায়ে হাত দিয়েছে, তার কিছু অজানা নেই আমাদের। সে যদি আমাদের হ'ত, তা হলে তোমার কাছে এর জন্য কৈফিয়ত চাইতাম। কিন্তু সে ভিক্ষুক। আমাদের সে কেউ নয়। আচার্য রঙ্গনাথন, তোমাকে আঘাতকারী যদি কেউ লল্লার প্রতি লুব্ধ ব্যক্তি হয়, তবে তাও আশ্চর্য হব না আমি। তোমার গান শুনতে শুনতে সে যেন মোহগ্রস্ত হয়, এলিয়ে পড়ে। সে হয়তো তুমি জান না, কিন্তু আমরা জানি। শবরদের যারা পালা গান শুনতে যায় তারা বলেছে আমাকে। সে দিনই বলেছে, ওই কথা প্রসঙ্গে।
রঙ্গনাথন কেমন সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যোশেফ বললে—তুমি আঘাত পেয়েছ, তার জন্যে আমি দুঃখিত। আমি আঘাত করলে তোমাকে হত্যা করতাম। কন্যাটি আমাদের কেউ নয়। আচ্ছা, চললাম।
চলে গেল সে। রঙ্গনাথন দাঁড়িয়ে রইলেন স্তম্ভিতের মত।
সামনের সমস্ত কিছু যেন অর্থহীন হয়ে গেছে। দুর্বোধ্য। একটা এলোমেলো বিশৃঙ্খল—সব যেন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। চিত্তলোক অন্ধকার। কানে কিছু শুনছেন না।

বুকেই একটা কিসের আঘাত চলেছে। অনুভবে বুঝছেন।
হে বরদরাজ স্বামী! ক্ষমা কর। ক্ষমা কর প্রভু।
অকস্মাৎ একটি যন্ত্রণা-কাতর মৃদু আর্তনাদ তাঁর কানে এসে ঢুকে তাঁকে সচেতন এবং ঈষৎ চকিত করে তুললে।
উঃ। উঃ! উঃ মা!
কি? কে? কোথায়?
উঃ-হু-হু!
এ তো সেই লল্লা! কিন্তু—।
দিক লক্ষ্য করে রঙ্গনাথন গোশালার দিকে তাকালেন। গোশালার চালায় পাশেই বিচালির স্তূপ। পোয়াল অর্থাৎ, এলো খড় স্তূপের মত করে রাখা রয়েছে। সেটার মাথা নড়ছে। শব্দ ওখান থেকেই আসছে। তিনি দ্রুত পদে এগিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, পড়ে গেল পোয়ালের মাথাটা। পোয়ালের পিছন দিকেই ঘন বৃক্ষবেষ্টনী। সেই দিক থেকে পোয়াল ঠেলে উঠে দাঁড়াল লল্লা। মাথার রুক্ষ চুলে মুখে খড়ের কুটি লেগেছে কিন্তু সেদিকে তার লক্ষ্য ছিল না—একটা যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। দাঁড়িয়ে সে যেন এই যন্ত্রণার মধ্যেও লজ্জা-সঙ্কোচ প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে।
—কি হ'ল? লল্লা! লল্লা!
—ওঃ, কিসে আমাকে কামড়েছে প্রভু!
—কোথায় কামড়েছে? কোন্ জায়গায়?
—পিছন দিকে। ঠিক ঘাড়ের নীচে। চুলের মধ্যে ঢাকা পড়েছে।
—দেখি দেখি।
লজ্জায় সে যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল, বললে—না প্রভু. আমি যাই, সমুদ্রের জলে গিয়ে ডুব দিই। তাতে সেটা ছেড়ে দেবে।
—না, দেখি। তোমার লজ্জার এতে কারণ নেই।
—আমি শবরী।
—না, তুমি মানুষ। অবাধ্য হতে নেই। বস পিছন ফিরে।
বলতে বলতেই তিনি নিজেই তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেও অবাধ্য হ'ল না, বসল। রঙ্গনাথন সন্তর্পণে তার অযত্ন-বদ্ধ, রুক্ষ, পোয়ালের ধুলায় ধূসর চুলের বোঝায় হাত দিলেন। লল্লা বললে—দেখবেন প্রভু, আপনাকেও হয়তো কামড়াবে।

রঙ্গনাথন সন্তর্পণে চুলের বোঝা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন—ওখানে ঢুকলে কেন ?

—ভয়ে প্রভু। ঘরে যখন শবরদের কথা বলছিলেন শ্রেষ্ঠী গোপালন তখন বাইরে কয়েক জনকে আমার দিকে আঙুল দেখাচ্ছিল। আমি ভয়ে ওই পোয়ালের পিছন দিকে গিয়ে লুকিয়েছিলাম। তারপর আমার নাম করতে ভয়ে ওই পোয়ালের ভিতর—

রঙ্গানাথন বললেন—এ কি! এ যে—! এঃ, রক্ত বের করেছে কামড়ে! বিষাক্ত বৃশ্চিক জাতীয় কীট। কর্কটের মত দুটো দাঁড়ায় তার পিঠের মাংস কেটে কামড়ে ধরেছে এবং হুল দিয়ে দংশন করেছে। দাঁড়ায় কাটা ক্ষত থেকে রক্তের একটি ধারা গড়িয়ে এসেছে। তখনও ছাড়ে নি। নিষ্ঠুর আক্রোশ হয়েছে কীটটার। রঙ্গনাথন মুহূর্ত চিন্তা করে তাঁর পুরু উত্তরীয়ের ভাঁজে কীটটাকে সন্তর্পণে দৃঢ় দুটি আঙুলে চেপে ধরে সজোরে টেনে নিলেন। লল্লা যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল। উঃ— কিন্তু অর্ধপথেই নিজেকে সংযত করে স্তব্ধ হ'ল। হাতে টিপেই সেটাকে মেরে ফেলে দিয়ে রঙ্গনাথন বললেন—লল্লা, এ বিষাক্ত ছোট বৃশ্চিক। তুমি কি যন্ত্রণার সঙ্গে অবসন্নতা বোধ করছ ?

—হ্যাঁ প্রভু।

—তোমাকে বিশ্রাম করতে হবে। আমার কাছে ওষুধ আছে, লাগিয়ে দেব। ওঠ। উঠতে পারবে ?

—আমায় কোন গাছতলায় শুইয়ে দিন প্রভু।

—না। ঘরে বিশ্রাম করবে।

—না।

আর্তস্বরে সে বলে উঠল।

—না নয়। ওঠ।

—তা হলে ওই গোশালায়—

—না। না। ওঠ। একি, তুমি যে কাঁপছ!

—বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। আঃ—

মুখ ঠোঁট যেন শুকিয়ে গেছে, চোখ দুটির পাতা ঢলে আসছে। দাঁড়িয়ে ভেঙে পড়ছে। রঙ্গনাথন তাকে দুই হাত প্রসারিত করে, হাতের উপর শুইয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। বিড় বিড় করে প্রতিবাদই করলে লল্লা, কিন্তু কণ্ঠস্বর জিহ্বা যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। রঙ্গনাথন তার মুখে খানিকটা জল দিলেন খাবার জন্য। মুখ ধুইয়ে দিলেন। মাথাটা

ধোয়ানোর প্রয়োজন। পিছনের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে প্রচুর জল ঢাললেন মাথায়। আরও খানিকটা জল খাওয়ালেন। এনে একটু সুস্থ হয়ে চোখ মেলতে চেষ্টা করলে লল্লা। রঙ্গনাথন বললেন—চুপ করে শুয়ে থাক। আমি বাইরে থেকে একটা শিকড় তুলে আনি। খাওয়ালেই এবং ওইখানে ঘষে লাগালেই অনেকটা সেরে যাবে। কিন্তু কথা শুনো, উঠ না তুমি।

বাইরে এসে নিজের বাগান খুঁজে শিকড় ওষুধ তুলে এনে গোলমরিচ মিশিয়ে বেটে খানিকটা খাইয়ে দিলেন, কয়েক মুহূর্ত পরেই লল্লা যন্ত্রণা উপশমের আরামে বলে উঠল, আঃ! সঙ্গে সঙ্গে হাতখানি বাড়িয়ে কিছু যেন খুঁজলে।

রঙ্গনাথন জিজ্ঞাসা করলেন—কি. কি খুঁজছ?

—আপনার চরণের ধুলো একটু—

—না।

—প্রভু, দিন। তাতে আমার মনে বল হবে।

এবার দ্বিধা করলেন না রঙ্গনাথন। তিনি বিশ্বাসের বলকে জানেন। নিজে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—এবার ঘুমোও দেখি একটু।

—আমাকে এইবারে বাঁচাবে—

—চুপ কর।

উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তিনি জানালার দিকে তাকিয়েছিলেন। উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালেন। বৃক্ষবেষ্টনীর একটি ফাঁক দিয়ে দেখা যায় শহর থেকে গ্রামে আসবার যে পথটা তাঁর আশ্রমের সুমুখ দিয়ে চলে গেছে, সেই পথে দূরে, জন দুই সওয়ার এবং কয়েকজন লোক আসছে। সওয়ারদের পোশাক যে কোয়ালীর পোশাক। মান্দ্রাজের ফিরিঙ্গিদের কোতোয়ালী! কোথায় যাবে? এখানে নয় তো? যদি হয়! হওয়া খুবই সম্ভব! হঠাৎ তাঁর মাথাটা ঘুরল যেন আপনা-আপনি।

লল্লা অবসন্ন লতার মত পড়ে আছে। বোধ হয় ঘুম আসছে। বিষ এবং ওষুধ দুয়ের ক্রিয়াতেই এখন ও আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকবে কয়েক প্রহর। তারা লল্লাকে খুঁজেছিল। শ্রীনিবাসন প্রতিজ্ঞা করে গেছেন, এর প্রতিকার সে করবেই। লল্লাকে যদি ধরে! মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেললেন রঙ্গনাথন। পাশের ছোট ঘরটির দরজা খুলে ফেললেন। ঘরটিতে আবার দুখানি ঘর। একখানি ভাণ্ডার,

তার ওপাশের খানি পুজোর। পুজোর ঘরে সুন্দর একখানি সিংহাসনে বরদরাজ স্বামীর অনুকৃতি, তাঁর পাশে লক্ষ্মী, আর একটি আসনে পিত্তলের নটরাজমূর্তি। নানান ধরনের সুশোভন সামুদ্রিক শঙ্খ, কড়ি ঝিনুক দিয়ে সাজানো। ফুল বিছানো। এই ঘরে, দেবতার সামনে মেঝের উপর, লল্লার অসাড় নমনীয় দেহখানি বয়ে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। মনে মনে বললেন, ওর অপরাধ কিছু নেই প্রভু। যদি অপরাধ হয় তবে আমার। দণ্ড আমাকে দিয়ো। তুমি ওকে রক্ষা কর।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে তালা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ভাণ্ডার ঘর থেকে এ ঘরে এসে, দরজা বন্ধ করে আপন আসনে বসলেন।

মাথার ক্ষতে এতক্ষণ যেন যন্ত্রণা বোধ করছেন। ক্লান্তিও বোধ হচ্ছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে মনে বললেন, হে বরদরাজ! হে বৈকুণ্ঠেশ্বর!

অশ্বপদশব্দ যেন আশ্রমের বাইরেই থামল। রঙ্গনাথন বুঝলেন, তাঁর অনুমান মিথ্যা হয় নি। যারা আসছিল তারা এখানেই এসেছে। কণ্ঠস্বরও শুনলেন পরমুহূর্তে—আচার্য রঙ্গনাথন!

—আসুন।

ভিতরে এলেন কোতয়ালীর কর্মচারী। অভিবাদন করে দাঁড়ালেন। রঙ্গনাথন উঠে বাইরে এলেন—বলুন।

—মাননীয় শ্রীনিবাসন আমাদের পাঠালেন। বললেন, আচার্যের আশ্রম পাহারা দিতে হবে। সারা শহরে নানান গুজব রটেছে। বলছে, আচার্যের আশ্রম যে কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে।

—সে কি! কে আক্রমণ করবে? এবং কেনই বা করবে?

—যারা আক্রমণ করেছিল, এবং যে কারণে করেছিল তারাই করবে, সেই কারণেই করবে।

রঙ্গনাথন বিব্রত হয়ে উঠলেন এবং তিক্তও হলেন—না না না। এ ধারণা ভ্রান্ত। এ হতে পারে না। আপনারা যান।

—আমরা আদেশের দাস। স্থানত্যাগের তো আদেশ নেই।

—বেশ, আমি স্থানত্যাগ করছি।

—তাহলে, প্রভু, আমরা একজন আপনার সহগামী হব, একজন এখানে আপনার গৃহ রক্ষার জন্য থাকব।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রঙ্গনাথন। সারা চিত্ত বিদ্রোহী হয়ে বলে উঠল, এ কী অত্যাচার!

কর্মচারীটি বললে—শুধু তাই নয় আচার্য, মাননীয় শ্রীনিবাসন বলে দিয়েছেন যে আপনি যেন এখন তাঁকে না জানিয়ে কোথায়ও গান করতে যাবেন না।

—কাঞ্চীভরম এবং মহাবলীপুরম তাঞ্জোরে সব স্থান এখনও কোম্পানীর অধিকারের বাইরে। সেখানে নিশ্চয় এ আদেশ বলবৎ নয়।

—তা নয়। কিন্তু মাদ্রাজের এলাকা পর্যন্ত আমরা সঙ্গে থাকব তারপর অন্য সীমানায় পা দিলেই আমরা ফিরে চলে আসব। আচার্য, জানেন না আমরা শুনে আসছি শহরে উত্তেজনা প্রবল। পাদরীরা উত্তেজিত হয়েছে তাদের উপর দোষারোপ করা হয়েছে বলে, হিন্দুদেরও শৈব যারা তারা উত্তেজিত হয়েছে, তাদের সন্দেহ করা হয়েছে বলে। আপনার গুণমুগ্ধেরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ আপনার উপর আক্রমণের জন্য। ওদিকে প্রভু শ্রীনিবাসন কোম্পানীর বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তিনি আদেশ দিয়েছেন আক্রমণকারীদের সন্ধান করা চাই। সারা শহরে লোক বেরিয়েছে, খুঁজছে কোথায় গেল সেই সন্দেহ ভিখারিণী।

অসহায় অথচ তিক্ত কণ্ঠে রঙ্গনাথন বললেন—তার জন্য আমাকেই গৃহবন্দীর মত আপনাদের প্রহরাধীনে বাস করতে হবে?

—না না না। আমরা আপনার আজ্ঞাধীন। আপনাকে রক্ষা করবার জন্যই এসেছি। আপনার মঙ্গলের জন্য।

—আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছি। আমি মনে করি আমার শত্রু কেউ নেই। আমি কারুর শত্রু নই। রক্ষা আমাকে করেন এবং করতে পারেন একমাত্র আমার দেবতা আমার প্রভু শ্রীবরদরাজ।

কিসের যেন শব্দ উঠছে না? রঙ্গনাথন কথা বলতে বলতেও উৎকর্ণ হয়ে আছেন। প্রায় চেতনাহীন হয়ে পড়ে আছে লল্লা। তার তো নিজের উপর কোন সংযম নেই, সে তো জানে না এদের উপস্থিতির কথা।

কোতোয়ালীর কর্মচারী বললে—আচার্য জানেন না এমন কথা অনেক আছে।

দৃঢ় কণ্ঠে উষ্ণ হয়েই বললেন রঙ্গনাথন—সব কথা কেউ জানে না ভাই। ভাল, এখন আমার অনুরোধ—আপনারা কোন বৃক্ষতলে ছায়াতে বিশ্রাম

করুন। আমার পূজার সময় হয়েছে। আমি পূজা করব এ সময়—

—নিশ্চয়। নিশ্চয়। তাই আমরা যাচ্ছি।

তারা বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে ছায়াঘন একটি লতামণ্ডপের তলদেশে গিয়ে বসল।

রঙ্গনাথন ছোট ঘরটির প্রথম দরজা খুলে ভাণ্ডার ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর ঢুকলেন পূজার ঘরে। অসম্বৃতবাসা লল্লা লুটিয়ে পড়ে আছে লতার মত। মুখে এখনও যন্ত্রণার ছাপ রয়েছে। তার একখানি হাত গিয়ে পড়েছে পূজোপকরণগুলির উপর। ছোট একটি ধূপাধারে ধূপশলাকা পুড়ছিল—সেটি পড়ে গেছে। হাতখানির চাপে ধূপশলাকা নিভে গেছে। শব্দটি সম্ভবত এই জন্য হয়েছে। মৃদু কাতর শব্দ একটি মধ্যে মধ্যে বেরিয়ে আসছে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। রঙ্গনাথন নাড়ী দেখলেন। নাড়ী দুর্বল—কিন্তু আশঙ্কা করার মত কিছু নয়। একটু দুধ দিলে বোধ হয় উপকার হ'ত। ভোগের দুধ আছে। পূজাতে তাঁর আড়ম্বর নেই। অল্প কিছু ফুল-চন্দন-ধূপ-দীপ আর দুধ ও শর্করা এবং নারিকেল ও কদলী; ভোরের পূজা হয়ে গেছে। দ্বিপ্রহরের পূজার সমগ্রা সাজিয়ে তারপর তিনি সহানুভূতি-জ্ঞাপন-কারীদের সঙ্গে দেখা করেছেন। এখন দ্বিপ্রহরের পূজা কেমন করে করবেন? ভোগ না দিয়েই বা দুধ কেমন করে খাওয়াবেন লল্লা হাঁ করছে—জল চাইছে। চোখ মেলেও চাইলে একবার। চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। চোখের তারা দুটি যেন স্বচ্ছ। তিনি মৃদু স্বরে ডাকালেন—লল্লা! লল্লা সাড়া দিলে না। আবার হাঁ করলে।

রঙ্গনাথন দেবতার চরণোদক নিলেন কুশীতে, তারপর ঢেলে দিলেন তার মুখে। আবার সে হাঁ করলে, আবার—আবার। একবার আরক্ত চোখ মেলে বিভ্রান্তের মত লল্লা বললে—আঃ। তারপর তার দিকে তাকিয়ে বললে—বড় জ্বালা সর্বাঙ্গে।

বলেই আবার সে চোখ বন্ধ করলে। রঙ্গনাথন ভাবলেন একটু, তার পর সংকল্প স্থির করে দেবতার সামনে থেকে একটু সরিয়ে পূজোপকরণ-গুলি আবার ঠিক করে নিয়ে বসে করজোড়ে বললেন—হে বরদরাজ! করুণাময়! যদি অপরাধ হয়, সে দণ্ড আমাকে দিয়ো। তোমার ভক্তিতে বিগলিত এই বালিকার প্রাণ রক্ষার জন্য তোমার পূজা করব সংক্ষেপে এবং তোমার প্রসাদ দিয়েই ওর সেবা করব।

আবার লল্লা অস্ফুটস্বরে বললে—বড় দাহ, বড় জ্বালা!

রঙ্গনাথন ভেবে নিলেন এক মুহূর্ত। তারপর আসন ছেড়ে উঠে ভাণ্ডার-ঘরের কোণে রক্ষিত বড় মাটির কলসী থেকে বড় ভৃঙ্গার পরিপূর্ণ করে নিয়ে এসে বসলেন। আচমন করে, সংক্ষেপে প্রাথমিক কৃত্যগুলি সেরে, ভৃঙ্গারের জল নিয়ে উচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করে দেবতার মাথায় কুশীতে করে জল ঢেলে গোটা ভৃঙ্গারটি নিয়ে উঠে এসে লল্লার শিয়রে বসে আবার উচ্চ কণ্ঠেই উচ্চারিত মন্ত্রের সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ জলধারায় অভিষিক্ত করে দিলেন—

আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযুর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী॥
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
সর্ব্বা সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ॥
সিন্দু-ভৈরব-শোনাত্মা যে হ্রদা ভুবি সংস্থিতা।
সর্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥
লবণেক্ষু—সুরাসপি র্দ্দধিদুগ্ধ-জলাত্মকাঃ।
সন্তেতে সাগরাঃ সর্বে ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥

অভিসিঞ্চনের স্নিগ্ধতায় লল্লার দেহের জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেল। সে আবার চোখ মেলে চাইলে। মৃদুস্বরে বললে—আরও। আঃ!

আবার এক ভৃঙ্গার জল এনে দেবতার চরণ স্পর্শ করিয়ে নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে তাকে স্নান করিয়ে দিলেন। লল্লার ধূলি-ধূসরতা ধুয়ে গেল—শুষ্কতাও মুছে গেল খানিকটা। সে আবার মৃদুস্বরে বললে—আঃ!

এবার পূজা সারলেন রঙ্গনাথন। লল্লার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ-স্পর্শ না থাকলেও তার অস্তিত্বের স্পর্শ রঙ্গনাথন অনুভব করেও নিজেকে অশুচি মনে করলেন না। পূজা সেরে ভোগ নিবেদন করে দুধটুকু নিয়ে তিনি লল্লার মাথার গোড়ায় বসে মৃদুস্বরে ডাকলেন—লল্লা!

লল্লা চোখ মেলে চেয়ে বললে—অ্যাঁ! তারপর সকৃতজ্ঞ হেসে বললে—প্রভু!

—দুধটুকু খাও তো। হাঁ কর, আমি ঢেলে দিই। হাঁ কর।

লল্লা কিন্তু হাতে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করলে। একটু উঠেই সে সভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। তিনি এক হাতে লল্লার মুখ চেপে ধরে বললেন—চুপ কর লল্লা। বাইরে কোতোয়ালীর লোক।

থরথর করে কাঁপছে লল্লা। ফিসফিস করে বললে—আমি শবর-কন্যা, পূজার ঘরে—

—চুপ কর। না হলে উপায় ছিল না। দেবতা তাতে রুষ্ট হন নি। তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন। আমি বলছি। খাও। তুমি খাও। ওদের অনেক অর্ধসত্যে ছলনা করে বৃক্ষতলে বসিয়ে রেখে এসেছি। তুমি সুস্থ হয়ে ঘুমোও। আর ভয় নেই। এবার সুস্থ হয়ে উঠবে। শুধু শব্দ করো না।

বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে রঙ্গনাথন বাইরে গেলেন। লল্লা হাত জোড় করে বরদরাজের ক্ষুদ্র অনুকৃতিটির দিকে তাকিয়ে বসে রইল। কিন্তু একটু পরেই আবার ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল।

রঙ্গনাথন বাইরে এসে দেখলেন প্রহরী দুটি বৃক্ষচ্ছায়াতলে সমুদ্রের আর্দ্র বায়ুস্পর্শে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তিনি ওপাশের বারান্দায় রান্নাঘরে রান্নার আয়োজনে বসলেন। এ বাড়িতে তিনি একাই বাস করেন। এ পর্যন্ত কোনদিন শত্রুর ভয় তিনি করেন নি। রমণীহীন সম্পদহীন গৃহ, থাকবার মধ্যে দুটি দুগ্ধবতী গাই। তা নিয়েও চোরের ভয় ছিল না। নিজেও সুস্থসবলদেহ যুবা। বাল্যাবধি কর্মের পরিশ্রমে অভ্যস্ত। বৈষ্ণব গুরুর আশ্রমে এবং সঙ্গীত শিক্ষক আচার্যের গৃহে শ্রমসাধ্য কর্মে তাঁদের সাহায্য করতেন। কুড়ুল দিয়ে কাঠ-চেলানো এবং নিজ হাতে কুপিয়ে বাগান করা ছিল তাঁর প্রিয় কর্ম। জলও তুলতেন কূপ থেকে। এখানে নিজের আশ্রমে এখনও কাজগুলি অবসরমত করে থাকেন। পরিচারক বৃদ্ধ কুড়ুমণির কর্মের লাঘব করে দেন। বৃদ্ধ পরিচারক কুড়ুমণির পাশের গ্রামেই বাড়ি। সে রাত্রে বাড়ি যায়, সকালে আসে। গরু দুটির পরিচর্যা করে। শহর থেকে প্রয়োজনমত জিনিসপত্র আনে। তিনি গানের নিমন্ত্রণে বাইরে গেলে সে অবশ্য এখানেই শোয়। আজ ভোর বেলাতেই তিনি তাকে পাঠিয়েছেন তিরু আল্লিকেনি—পার্থসারথি মন্দিরে। সেখানে আজ পূর্ণিমায় তাঁর গানের কথা ছিল। দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে মার্জনা চেয়েছেন রঙ্গনাথন। সংবাদ হয়তো তাঁরা পেয়েছেন, কিন্তু তবু তাঁর দিক থেকে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর সঙ্গের যন্ত্রীরা কজন কাল রাত্রে এখানে থেকে সকালে আপন আপন বাড়ি চলে গেছে। নিরীহ যন্ত্রশিল্পী—তারা ভয়ও পেয়েছে। তাদের বাড়ি সব এই দিকেই কাছাকাছি পল্লীতে। বৃদ্ধকে না পাঠিয়ে উপায় ছিল না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন রঙ্গনাথন। ভাগ্যে বৃদ্ধ এখানে ছিল না।

থাকলে তার চোখ এড়িয়ে বেচারা লল্লা ওই পোয়ালের মধ্যে আত্মগোপন করতে পারত না। কোতোয়ালীতে তার লাঞ্ছনার সীমা থাকত না। আজ তার চেয়ে এই বৃশ্চিক বিষ-জ্বালাও তার পক্ষে অনেক ভাল।

বরদরাজ তাকে রক্ষা করেছেন। তাঁর পায়েই তাকে তিনি রেখে এসেছেন।

আবার তিনি বললেন—এবার স্ফুটকণ্ঠেই বললেন—হে বরদরাজ! তুমি পতিতের ভগবান! আজ তোমার চরণে তার আশ্রয় নেওয়ায় যদি অপরাধ হয়ে থাকে তবে সে অপরাধ আমার—তার নয়। দণ্ড দিতে হলে আমাকে দিয়ো। তুমি অন্তর্যামী, তুমি জান—তোমার জন্য তার কত আকুতি। তুমি তাকে রক্ষা কর।

* * *

বরদরাজস্বামী—পতিতের ভগবান! বিপন্নের রক্ষক! অনন্ত করুণার আধার! রঙ্গনাথনের উপলব্ধি মিথ্যা নয়। তিনি সঠিক সত্যকেই উপলব্ধি করে গান রচনা করেছিলেন—"যিনি বসবাস করেন বৈকুণ্ঠে তিনিই বাস করেন শবর-পল্লীতে, নকল পতিত পল্লীতে—ওই ওদের মধ্যে—ওদের কৃষ্ণচর্মের অন্তরালে। কৈলাসে যিনি বাস করেন ভবানীপতি—তিনিও আছেন ওদের মধ্যে। ওদের কৃষ্ণচর্ম দেখে যদি তোমার ঘৃণা হয়, ওদের পল্লীর অপরিচ্ছন্নতার কটু গন্ধে যদি তোমার দ্বিধা হয় কাছে যেতে, তবে তোমার জানা হবে না তাঁকে। ব্রাহ্মণ-তনয় তুমি ব্রহ্মাভিলাষী,—ক্রোধে, ঘৃণায়, অহংকারে শিক্ষার মধ্যে তোমার জানা হয় নি ব্রহ্মকে। আমি নারী—আমার ধর্মে আমি অধিষ্ঠিতা। আমার যিনি পতি তিনি শুধু আমার পূজ্যই নন, তিনি আমার প্রিয়—প্রিয়তম। তাঁর সেবা আমার ধর্মই শুধু নয়—সেই আমার জীবনধর্ম, সেই আনন্দসুধার স্বাদে আর ব্রহ্মের স্বাদে প্রভেদ নেই। তুমি তাতে আমার উপর ক্রুদ্ধ হলে। সে ক্রোধে ক্ষতি হয় নি, হবে না আমার। সুতরাং তোমার পরমসত্য পরমতত্ত্বকে জানা সম্পূর্ণ হবে ব্যাধ-পল্লীতে, ব্যাধধর্মে অধিষ্ঠিত ধর্মব্যাধের কাছে। ঘৃণা করো না, নাসিকা কুঞ্চন করে প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে যেয়ো না। প্রবেশ করো। তুমি কি জানো, ভবানীপতি মহারুদ্র কিরাতরূপেই দেখা দিয়েছিলেন তপস্যাপরায়ণ অর্জুনকে। অর্জুন কিরাত বলে অবজ্ঞা করেছিল, ঘৃণাও করেছিল। কিরাতরূপী ভগবান তার সে শক্তির অবজ্ঞা

চূর্ণ করেছিলেন তার বুকে একটি মুষ্ট্যাঘাত করে। ঘৃণাকে উপহাস করেছিলেন—অর্জুনের ইষ্টকে নিবেদন করা মাল্যখানি তাঁর কণ্ঠে ধারণ করে। হিমগিরির কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণচ্ছটায় প্রতিভাত স্বর্ণকান্তি কিরাত নীলগিরিতে যখন আসেন তখন তিনি সুনীল সমুদ্রলাবণ্যে অবগাহন করে হন নিবিড় নীলকান্তি।"

অপার বরদরাজের করুণা। এবং হয়তো আশ্চর্য সত্য তাঁর উপলব্ধি। লল্লা যেন রহস্যের মহিমা দেখিয়েই গভীর রাত্রে ঘুমন্ত প্রহরীদের ব্যঙ্গ করে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

অপরাহ্ণে সুস্থ হয়ে উঠেছিল লল্লা এবং কেঁদেছিল। তাকে বলেছিল—আর নয়, এবার আমার জ্ঞান হয়েছে, আমি সুস্থ হয়েছি। প্রভু, এ পূজা-মন্দিরে আতুর বলে চেতনাহীনা আমার যে অধিকার ছিল সে আর নেই। আমার অপরাধের জন্য আমি ভাবি না প্রভু, রাজপ্রতিনিধির শাস্তি-লাঞ্ছনাকেও আমার ভয় নেই। আপনি আমাকে বের করে প্রহরীদের হাতে সমর্পণ করুন। প্রভু—

রঙ্গনাথন বলেছিলেন, না।

—আমার জন্য বরদরাজ আপনার উপর রুষ্ট হবেন। আপনার তপস্যা—

বাধা দিয়ে রঙ্গনাথন বলেছিলেন, আমার তপস্যা এতেই পূর্ণ হবে কল্যাণী। তুমি লল্লা নও, নও কলাবন্তী, তুমি কল্যাণী। তুমি থাক। দেবতার মহিমার মত তুমি এই ঘরে থাক। মিথ্যা বলব না কল্যাণী, আমি যে বরদরাজের করুণাধন্য মহিমাকে আজ প্রত্যক্ষ করছি আমার পূজার ঘরে। কিন্তু আর কথা বলো না। ওরা এখনও সন্দেহের অবকাশ পায় নি। এরপর কখন কোন মুহূর্তে সন্দেহ করে বসবে। এই প্রভুর প্রসাদ রইল—দুধ, শর্করা, কদলী। খেয়ো। দুর্বল হয়েছ—বল প্রয়োজন।

—কিন্তু কতদিন রাখবেন প্রভু?

—ওই ওঁকে প্রশ্ন কর।

—যদি আমার অস্তিত্ব ওরা জানতে পারে তবে আপনাকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। প্রভু, না—

—চুপ। তারপর স্মিত হেসে বলেছিলেন—সেই লাঞ্ছনায় আমার তপস্যা পূর্ণ হবে লল্লা।

লল্লা শব্দটির মধ্যে সঙ্গীত আছে। শব্দটি আপনি বেরিয়ে এসেছিল কল্যাণীর পরিবর্তে। তিনি বাইরে এসে বীণা বাজিয়ে গান করেছিলেন।

প্রথমেই সঙ্গীত অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বন্দনা করে গেয়েছিলেন গোটা দক্ষিণ ভারতে বহু প্রচলিত স্তবগান—

কলাদেবতে শরণম্
বন্দে মধুর চরণম্—
বন্দে মধুর সঙ্গীত দেবতে—কলাদেবতে শরণম্—
সত্য সুর স্বরূপিণী
সমস্তকে দুখহারিণী
আনন্দ মৃদবাহিনী
আনন্দ ভৈরব মোহিনী
তালমেল সম্মিলিত নাশিত
রাগরঙ্গিণী হৃদয়হাসিনী
মেঘ মধুরিম মঙ্গল বদনম্
মোহ দরদী
জীবজীবনী জীবজীবনী
কলাদেবতে—
কলাদেবতে শরণম্।

প্রহরী দুটি বিভোর হয়ে শুনেছিল। কুড়ুমণি বাড়ি যেতে-যেতেও যেতে পারে নি। কুড়ুমণি পার্থসারথি মন্দির থেকে ফিরে এসেছে একটু আগে। বৃদ্ধ মানুষ, তার উপর একটু পেটুক সে। সেখানে প্রসাদ পেয়ে দুপুরে বিশ্রাম করেছে। তার উপর নদী পার—সমুদ্রের কাছাকাছি নদীগুলি মোহনার কাছে বিস্তারে বিপুল; খরায় নৌকা এপার থেকে ওপারে গেলে ফিরতে প্রায় একবেলা কেটে যায়। আদিয়ার নদী পার হতে দেরি হয়েছে। ফিরবার পরই সে বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। তাকে এবং প্রহরী দুটিকে তাদের রাত্রের খাবার দিয়ে তিনি বীণা নিয়ে বসেছিলেন। তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন গানে। তাঁর নিজের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল, প্রহরী দুটি বার বার চক্ষু মার্জনা করছিল, কুড়ুমণি ফুঁফিয়ে কেঁদেছিল। তিনি বেশ অনুভব করেছিলেন পূজার ঘরেও লল্লা কেঁদেছিল শুয়ে শুয়ে। রাত্রির প্রথম প্রহর পার হয়ে গেলে বীণাটি তিনি রেখে তাঁর শয্যার উপর শুয়ে পড়েছিলেন। কান পেতে জেগে ছিলেন, নিদ্রা তাঁর আসে নি লল্লার সাড়ার জন্য। লল্লা কি ঘুমিয়েছে? ঘুমন্ত অবস্থায় গভীর দীর্ঘায়িত শ্বাস-প্রশ্বাস উঠছে কি? কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রহরী

দুটির মৃদু নাসারব উঠতে শুরু করেছিল। কুড়ুমণির নাসাগর্জন প্রবল। লল্লা কি এখনও জেগে ? কই, তার শ্বাস-প্রশ্বাস তো গভীর হয়ে ওঠে নি। উঠে গিয়ে দেখতেও সাহস হয় নি। কি জানি কখন কে জেগে উঠবে। সন্ধ্যায় ভোগ ও দীপারতির পর দেবতার শয়ন হয়, তারপর সে দ্বার প্রভাত পর্যন্ত খোলা হয় না। দরজা খুললে যদি শব্দে জেগে ওঠে। দরজা তিনি তালাবন্ধ আজ করেন নি এই জন্যই। ভেজানো আছে। তবু যদি দেখে, শব্দ হয়! রাত্রে প্রহরী দুটিকে গাছতলা দেখিয়ে দিতে পারেন নি। তারা বারান্দায় শুয়ে।

এরই মধ্যে তাঁরও তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ পায়ে কিছুর স্পর্শে তিনি জেগে উঠেছিলেন। চোখ মেলে চেয়ে দেখে তিনি যেন পাথর হয়ে গেলেন। লল্লা! লল্লা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। সে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। তাঁর কণ্ঠ থেকে একটা চীৎকার বেরিয়ে আসতে চেয়েও পথ পেলে না। কে যেন তাঁর কণ্ঠ রোধ করে চেপে ধরেছে। লল্লা কিন্তু দাঁড়াল না, কোন কথাও বললে না, প্রণাম করেই লঘু পদে ঘর থেকে বেরিয়ে ঘর এবং বারান্দার মাঝের দরজায় ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াল; বাইরে পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না, দুগ্ধ-শুভ্র স্বচ্ছতায় প্রকৃতি যেন ক্ষীরসমুদ্রে অবগাহন করে অমলধবল স্পষ্টতায় স্পষ্ট; অদূরবর্তী সমুদ্রে পূর্ণিমার জোয়ার উঠেছে। তরঙ্গাঘাতের শব্দের সঙ্গে কল্লোলধ্বনি উঠেছে। লল্লা মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে—বোধ হয় বারান্দায় ঘুমন্ত তিনজন মানুষকে দেখে নিয়ে সন্তর্পিত লঘু পদক্ষেপে তাদের পাশের খালি জায়গার উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে নেমে গেল বারান্দা থেকে। উদ্যানে জ্যোৎস্নার মধ্যে ওকে স্পষ্ট দেখলেন। লঘু দ্রুত পদে লল্লা উদ্যান প্রবেশমুখে আশ্রম-প্রবেশের ফটকে গিয়ে দাঁড়াল। সেও ক্ষণেকের জন্য—তারপর সে বেরিয়ে দৃষ্টির অন্তরালে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতক্ষণে তাঁর স্তম্ভিত চেতনা ফিরল তড়িতাহতের মত। তিনি চীৎকার করতে চাইলেন—লল্লা! কিন্তু সংযত করলেন নিজেকে। এবং উঠে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। এই গভীর রাত্রি, এই রাত্রে একা কিশোরী লল্লা কোথায় যাবে ? মাৎস্যন্যায়ের কাল। রাজশক্তি সারা দেশে ভেঙে পড়েছে। গ্রামে গ্রামে হিংসক চোর ডাকাত লম্পট ঘুরে বেড়ায় দল বেঁধে। শহরে কোম্পানির তেলেঙ্গী সিপাই, গোরা সিপাই মদ খেয়ে সমুদ্রতটে হল্লা করে। ধনীর উদ্যান-বাটিকাক্ষ

মত্ত কণ্ঠের স্খলিত বাক্য, তাল ছন্দ কাটা নূপুরধ্বনি নটরাজের অপমান করে। ভগবানের পৃথিবীতে ধ্যানমগ্ন ভগবানের অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হয় অশুচি আবর্জনা—এই রাত্রে ও যাবে কোথায়? তার উপর আজ সারাটা দিন বৃশ্চিক-বিষে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। মৃত্যু-যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা ভোগ করেছে। ও যাবেই বা কতদূর? দ্রুতপদে তিনি আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলেন। কই, কোথায় লল্লা?

জ্যোৎস্না-প্লাবিত পৃথিবী; গাছের তলদেশে শুধু অন্ধকার। তিনি তাকালেন লল্লাদের গ্রামের পথের দিকে। কই? সারা বালুময় পথটা জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে। শূন্য পথ। মাদ্রাজ যাবার পথের দিকে চাইলেন। সে দিকেও তাই। অনেক দূরে শহরের দুটো পাকা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আলো জ্বলছে শীর্ষদেশে। বহু দূর থেকে ভেসে আসছে কয়েকটা কুকুরের চীৎকার। কিন্তু লল্লা কই? নেই তো! পূর্ব দিকে সমুদ্রবেলা। তবে কি এদিকে গেল! ছুটে এগিয়ে গেলেন তিনি। উঁচু বালুর বালিয়াড়ি ক্রমশ নিম্নভূমিতে নেমে গেছে। তার পরই তাল নারিকেল সুপারি বনের সারি: পূর্ণিমার চাঁদ মধ্যগগনে, গাছগুলির ছায়া তাদের পায়ের তলায় জমেছে ঘন হয়ে, মধ্যে মধ্যে পত্র-পল্লবের ফাঁক দিয়ে গড়া টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না দীর্ঘ রশ্মিভল্লের মত ওই ছায়াকে বিদ্ধ করছে। বায়ু তাড়নায় পল্লব আন্দোলনে যেন উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। হ্যাঁ, ওই যে, ওই চঞ্চল দোলায়মান জ্যোৎস্নার খণ্ডগুলি কখনও একটি মনুষ্যমূর্তির মাথায়, কখনও পিঠে, কখনও পায়ে পড়ছে। তার আভায় সর্বাঙ্গ আভাসে ছায়ামূর্তির মত দেখাচ্ছে। লল্লা চলেছে—ওই নারিকেল তালের সারির কোল ঘেঁষে, ওরই ছায়ায় আত্মগোপন করে চলতে চাচ্ছে।

তিনি আবার চীৎকার করে ডাকতে গিয়ে থেমে গেলেন। প্রহরীরা জেগে উঠবে। তিনি নিজেই ছুটলেন। এসে দাঁড়ালেন নারিকেল তালের সারির মধ্যে। সামনে সমুদ্র; পূর্ণিমায় উত্তাল জোয়ারে উচ্ছ্বসিত। আঘাতের পর আঘাত করছে তটভূমিতে, এক একটা বৃহৎ উচ্চ তরঙ্গ আছড়ে পড়ে এই গাছগুলির তলদেশ পর্যন্ত চলে আসছে। একটা তরঙ্গ তাঁর পা ভিজিয়ে দিল।

ওই চলেছে লল্লা! ওই! টুকরো টুকরো আলোর মধ্যে রহস্যমূর্তির মত দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। তিনি আবার ছুটলেন দক্ষিণ মুখে। ওই মুখেই লল্লা চলেছে, সম্ভবত মহাবলীপুরমের দিকে।

খানিকটা গিয়ে আবার তিনি দাঁড়ালেন। কতদূরে লল্লা! লল্লা, যেও না, এত দূর পথ! তুমি দুর্বল, তুমি যুবতী, এই গভীর রাত্রি। লল্লা, তুমি দাঁড়াও। কিন্তু কই, আর তো দেখা যাচ্ছে না!

স্বল্প উচ্চকণ্ঠে তিনি ডাকলেন—লল্লা!

সমুদ্রের কলরোলে ঢাকা পড়ে গেল। একটা ঢেউ আবার আছড়ে পড়ে এগিয়ে এসে তাঁর পা ডুবিয়ে দিল। আবার অগ্রসর হলেন। ডাকলেন—লল্লা!

এবার চোখে পড়ল নারিকেল সারির ছায়ার মধ্যে সঞ্চরমাণ জ্যোৎস্নার একটি ফালি তাঁকে দেখিয়ে দিল একটি নারিকেল কাণ্ডে ঠেস দিয়ে বসেছে লল্লা। তার দেহের কাপড়ের কয়েকটি অংশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। লল্লা বসেছে। ক্লান্ত হয়ে বসতে বাধ্য হয়েছে। এ কি! এলিয়ে পড়ল যেন!

দ্রুতপদে তিনি এগিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, লল্লা নারিকেল গাছের তলায় কাত হয়ে শুয়ে পড়েছে। একটু নত হয়ে তিনি ডাকলেন—লল্লা!

চমকে উঠল লল্লা—কে?

—ভয় নেই লল্লা আমি।

—প্রভু! আপনি!

সে আবার স্থির হ'ল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—ভেবেছিলাম, পারব চলে যেতে। কিন্তু পারছি না। বড় দুর্বল বোধ হচ্ছে।

—কেন চলে এলে লল্লা? ছি ছি ছি!

রঙ্গনাথন বসলেন তার শিয়রে। মাথাটি তুলে নিলেন কোলে—তুমি বেরিয়ে এলে, আমি তোমাকে কথা বলতে পারলাম না ওরা জেগে উঠবে বলে।

তার ললাটে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—দেখি তোমার নাড়ী। মণিবন্ধটি হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে বললেন—দুর্বল! এই দুর্বল অবস্থায় কি করলে বল তো!

লল্লা চুপ করে রইল শিষ্ট বালিকার মত।

রঙ্গনাথন ভাবলেন কি করবেন একে নিয়ে। মহাবলীপুরম অনেক দূর। মাদ্রাজ, তার নিজের গ্রাম, তার জন্য বন্ধনরজ্জু আর নির্যাতনের দণ্ড ধরে বসে আছে। জ্যোৎস্নার একটি মোটা টুকরো এসে পড়ল তাঁদের উপর। তিনি দেখলেন লল্লা একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মুহূর্তে তাঁর দৃষ্টিও নিবদ্ধ হয়ে গেল লল্লার

মুখের উপর। লল্লার চুল একরাশি এবং সেগুলি ঘন কুঞ্চনে কুঞ্চিত। চোখ ছুটি আয়ত, প্রশান্ত, প্রসন্ন। শুভ্রচ্ছদ ছুটি মুক্তাগর্ভ শুক্তির ভিতর দিককার মতই নীলাভ শুভ্র, গাঢ় কালো মুক্তার মতই তারা ছুটি টলটল করছে। চন্দ্রালোকে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।
লল্লা বোধ হয় সচেতন হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টিতে। সে চোখ বুজলে। রঙ্গনাথন ডাকলেন—লল্লা!
—প্রভু—
—কি ভাবছিলে লল্লা?
বলতে পারলেন না, কি দেখছিলে লল্লা আমার দিকে তাকিয়ে। কণ্ঠস্বর তাঁর গাঢ় হয়ে এসেছে। একটা উত্তাপ যেন তাঁকে উত্তপ্ত করে তুলছে। একটা মাদকতার ক্রিয়ার মত ক্রিয়া তাঁকে যেন আচ্ছন্ন করেছে। দেহের শিরায় রক্তের প্রবাহে মাথায় স্নায়ুর মধ্যে কি যেন উষ্ণতা; কিছু যেন; সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন করবার মত তীব্র একটা কিছু বয়ে যাচ্ছে। মুদিত-চক্ষু লল্লার ললাটে জ্যোৎস্নার প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে। ললাটে হাত বুলিয়ে দিয়ে আবার ডাকলেন—লল্লা!
লল্লার ললাট শীতল। চোখ বুজেই অতি ক্ষীণ হেসে সে উত্তর দিল—ভাবছিলাম আপনিই আমার সাক্ষাৎ বরদরাজস্বামী।
আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন রঙ্গনাথন। গভীর স্নেহে মুখটি আনত করে হঠাৎ থামলেন। আপন মুখের উপর তাঁর উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শে চোখ মেললে লল্লা। বিস্ফারিত চোখে বললে—প্রভু!
রঙ্গনাথন উত্তর দিলেন না, বিরত হলেন না, তার ললাটে একটি চুম্বন দিয়ে বললেন—এ তোমার বরদরাজের আশীর্বাদ।
একমুহূর্তে কেঁদে আকুল হয়ে পড়ল লল্লা। শুধু বাক্যহীন রোদন।
রঙ্গনাথন তাঁর কাঁধ ধরে একটু আকর্ষণ করে বললেন—ওঠ। পারবে উঠতে?
মন্ত্রমুগ্ধার মতই লল্লা উঠল। রঙ্গনাথন বললেন—আমার কাঁধে ভর দাও। না পার তো বয়ে নিয়ে যাব। বল।
—কোথায় প্রভু?
—কেন, আমার গৃহে।
—প্রভু—
—কোন ভয় নেই লল্লা।

—প্রভু, প্রহরীরা—

—কোন ভয় নেই। তোমায় ধরে নিয়ে যেতে পারবে না তারা। দেব না। ভেবো না তুমি।

—আপনার বিপদ হবে। না না—

—হবে না।

—কি বললেন? কি করে বাঁচাবেন প্রভু? একটা ভিখারিণী শবর-কন্যার জন্য আপনি শুদ্ধ জাতিচ্যুত হবেন?

—জাতিচ্যুত? না।

স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রঙ্গনাথন বললেন—না। তবুও তোমাকে ছেড়ে দেব না।

আবার বললেন উচ্চতর কণ্ঠে—না। তোমাকে কোন কালে ছেড়ে দেব না। না।

দৃষ্টি তাঁর উন্মাদের মত। দেহ তাঁর কাঁপছে। হাতে তাঁর অগ্ন্যুত্তাপ। শঙ্কিত কণ্ঠে লল্লা বললে—প্রভু!

রঙ্গনাথন বললেন—ভয় পেয়ো না। আমাকে ঘৃণা করো না লল্লা। প্রয়োজন হয় তোমার জন্য জাতিচ্যুত হব। আমি শবর হব। তোমাকে ছাড়তে আমি পারব না।

লল্লাকে সবলে বুকের মধ্যে আকর্ষণ করলেন রঙ্গনাথন। যৌবনের যে নিত্যলীলায় অকস্মাৎ একদা শীতান্তে, বাতাসের স্পর্শে গতি পরিবর্তিত হয়, সূর্যের স্পর্শে নব তাপের সঞ্চার হয়, পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কামনা জাগে, সেই তাপে কামনায় রঙ্গনাথনের এত কালের সব সংকল্প ভেসে গেল।

লল্লার অধরোষ্ঠের উপর নিজের অধরোষ্ঠ স্থাপন করে মূক করে দিলেন তাকে, নিজেও মূক হয়ে গেছেন। কয়েক মুহূর্ত পর তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন—কামনার কাছে আমি পরাজিত হয়েছি, মাথায় করে নিয়েছি তাকে, কিন্তু আমি কামার্ত পশু নই লল্লা। তোমাকে আমি বিবাহ করব।

নিজের গলা থেকে তুলসীর মালাখানি খুলে তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন—সমুদ্র সাক্ষী রেখে তোমাকে বরণ করলাম আমি। প্রয়োজন হয় আমি জাতিচ্যুত হব। আমি জানি, সমাজ জাতিচ্যুত করলেও বরদরাজ ত্যাগ করবেন না। একান্তে দূরে চলে যাব দু'জনে। শবরী নয়, ব্রাহ্মণী হবে তুমি।

লল্লা তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে—আপনিই আমার বরদরাজ।
—তুমি তা হলে লক্ষ্মী।
আবার তাকে তুলে বুকে ধরলেন। তারপর বললেন—চল।
—শান্ত কণ্ঠে লল্লা বললে—বড় ভাল লাগছে এখানে। কী সুন্দর চাঁদ! অপরূপ জ্যোৎস্না! সমুদ্রের কী রূপ!
—বেশ, এই সমুদ্রবেলাভূমে হোক আমাদের বাসর।
সস্নেহে রঙ্গনাথন লল্লাকে নারিকেলকুঞ্জতলে বসিয়ে দিয়ে তার পাশে বসলেন।
একটি উচ্ছ্বসিত উত্তাল তরঙ্গ বেলাভূমে আছড়ে পড়ে তাঁদের পা পর্যন্ত এসে স্পর্শ করে ফিরে গেল।
রঙ্গনাথন বললেন— আজ পূর্ণিমা, সমদ্র উতরোল হয়ে উঠেছে।

* * *

বালুচরে পাতা বাসরশয্যায় তাঁরা দু'জনেই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙল পাখীর কলরবে। সামুদ্রিক পাখীর দল ভোরের মরা জ্যোৎস্নায় দল বেঁধে চক্রাকারে উড়তে শুরু করেছে আকাশ থেকে ঝরে-পড়া শুভ্রদল আকাশকুসুমের মত। স্থলচারী বিহঙ্গেরা গাছের মাথায় মাথায় কলরব করছে। যে দু-একটি শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট গাছ আছে তার পত্রপল্লবের মধ্যে ছোট পাখীরা দলবদ্ধ শিশুর মত প্রভাতী কাকলীতে মুখর হয়ে উঠেছে। পূর্বে অন্তহীন সমুদ্রের যেখানে আকাশ সমুদ্র-জলে অবগাহনে নেমেছে—সেখানে দীর্ঘায়িত একটি পাণ্ডুর রেখা জেগেছে; তারই মধ্য-বিন্দুর ঈষৎ উত্তর দিকে এক স্থানে সে পাণ্ডুরতা মণ্ডলাকালে ক্রমশ আয়তনে বাড়ছে। পূর্ব দিগন্তে একপাদ আকাশে জ্যোৎস্না ম্লান বিবর্ণ হয়ে গেছে, আকাশের প্রথম পাদ-সীমার একটু উপরে শুকতারা নীলাভ জ্যোতিতে হাসছে।
এ পাশে পশ্চিম দিগন্তে দিগন্তশায়ী পূর্ণচন্দ্র। রক্তাভ পাণ্ডুর হয়ে এসেছে। কিন্তু তার জ্যোৎস্না এখনও পশ্চিমে দিগন্ত থেকে আকাশের ত্রিপাদ পর্যন্ত আলো করে রেখেছে। সে জ্যোৎস্না পড়ে রয়েছে শাখা-প্রশাখাহীন দীর্ঘশীর্ষ নারিকেল বৃক্ষগুলির পশ্চিম ভাগে, শীর্ষদেশ থেকে তলভূমি পর্যন্তআলোকিত করে। পূর্ব ভাগে বালুচরে সমুদ্রগর্ভ পর্যন্ত জেগে রয়েছে অস্পষ্ট ছায়া। পশ্চিম দিগন্তাগত

খানিকটা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে শবরীর মুখের উপর। নিশ্চিন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন লল্লা।

প্রথম ঘুম ভাঙলো রঙ্গনাথনের। রাত্রি শেষ হয়েছে। আর এক দণ্ডের মধ্যেই ওই পাণ্ডুর মণ্ডলটি ঈষৎ রক্তরাগে ভরে উঠবে। তারপর সে রক্তরাগ একদিকে সমুদ্রের জল একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে পরিধিতে আকাশের উর্ধ্বলোকে পরিব্যাপ্ত করবে এবং কেন্দ্রে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে হতে জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্য মাথা তুলবেন। যেন সমুদ্রবক্ষতল থেকেই সূর্যদেব উঠে আসছেন। তারপর এক সময় লাফ দিয়ে উঠবেন আকাশে, সমুদ্রের নীল তরঙ্গশীর্ষে রক্তরাগের ছটা বাজবে।

পাশে শবরকন্যা এখনও নিদ্রিতা। রঙ্গনাথন তার মুখের দিকে তাকালেন। বারেকের জন্য চিত্ত যেন নিজের উপরেই বিরূপ হয়ে উঠল রঙ্গনাথনের। ভাবাবেগে এ তিনি কাল কি করেছেন?

হে বরদরাজ, এ কি করলে! তোমার চরণতলে কাল বিষ-জর্জরা চেতনাহীনা এই কন্যাকে আশ্রয় দেবার সময় বলেছিলাম, এতে যদি অপরাধ হয় তবে সে অপরাধের দণ্ড আমাকে দিও। দোষ তো এর নয়। আমার। তুমি কি আমাকে মোহগ্রস্ত করে আমার ব্রত ভঙ্গ করিয়ে তপস্যাচ্যুত করিয়ে তারই দণ্ড দিলে? স্থির হয়ে গেছেন তিনি, পাষাণ হয়ে গেছেন যেন। দিবালোক যত স্পষ্ট হচ্ছে, পৃথিবী যত বাস্তব রূপে প্রকাশিত হচ্ছে, তত তিনি যেন পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন। এ কি করেছেন তিনি : দয়া করতে গিয়ে এ কি বন্ধনে নিজেকে শৃঙ্খলিত করেছেন! লল্লাকে ডাকতে পারছেন না তিনি। চোখ মেলেই লল্লার নিদ্রা-জড়িমা-মুক্ত চোখে সমুদ্র-বক্ষে রক্তিম সূর্যের আবির্ভাবের মত প্রেমের দীপ্তি ফুটে উঠবে। তার সারা মুখ কোমল অনুরাগচ্ছটায় অনুরঞ্জিত হবে। সলজ্জ হাসির রেখায় ঠোঁট দুটি বিকশিত হবে। কি করবেন তিনি তখন?

লল্লার গলায় তাঁর গলার বৈষ্ণবজনের মালাটি পড়ে রয়েছে।

অকস্মাৎ রঙ্গনাথন যেন বেত্রাহতের মত অধীর হয়ে উঠলেন। লল্লাকে একটি বৃশ্চিকে দংশন করেছিল—তাঁর মনে হ'ল তাঁকে যেন সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করেছে।

কি করবেন তিনি? লল্লা যেন এখনও তাঁকে বৃশ্চিকের মত ধরে আছে। লল্লার একখানি হাত তাঁর কোলের উপর সত্যই পড়েছিল। তিনি আতঙ্কিত ব্যক্তির মতই হাতখানাকে সজোরে কোল থেকে

বালুচরের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। লল্লা সেই আঘাতে চোখ মেললে। সদ্য ঘুম-ভাঙা দৃষ্টির মধ্যে আঘাতের বেদনাবোধও ছিল না। ছিল শুধু প্রসন্ন অনুরাগ। নিদ্রাঘোরের মধ্যে সে আঘাতটা পূর্ণমাত্রায় অনুভব করে নি, এবং অনুমানও করে নি, বা করবার কোন কারণ ঘটে নি তার। চোখ মেলে চেয়ে সে স্মিতহাস্যে বললে—প্রভু! বোধ হয় তার মনে হয়েছিল রঙ্গনাথন তাকে ডাকছে। রঙ্গনাথন তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। প্রভু বলে সাড়ার মধ্যে লল্লার প্রশ্ন ছিল—কি বলছেন প্রভু? কিন্তু রঙ্গনাথনের বলার কিছু ছিল না। পথিপার্শ্বে নিদ্রিত চোর যেমন ভোরের আলোয় জেগে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায় তেমনিভাবে তিনি পালিয়ে গেলেন। লল্লা উঠে দাঁড়াল। তার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এমন করে ছুটে পালালেন কেন? প্রহরী! চঞ্চল হয়ে উঠল সে। পরমুহূর্তেই তার সব চঞ্চলতা স্থির হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল—কাল রঙ্গনাথন তাকে ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন—কিসের ভয়? তুমি আমার পত্নী। তুমি যাবে আপনার গৃহে—

তা হলে? তা হলে?—

সে যে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার কণ্ঠে যে এখনও তাঁরই পরানো মালা—বৈষ্ণবজনের মালাখানি দুলছে! তবে?

পাথর-মূর্তির মতই সে দাঁড়িয়ে রইল। প্রহরীর ভয় আর তার নেই। নিয়ে যাক, তারা তাকে ধরে নিয়ে যাক। করুক, নির্যাতন করুক, লাঞ্ছনা করুক।

সূর্য উঠবে। একটি মণ্ডলাকার রক্তোজ্জ্বলরঞ্জন ধীরে ধীরে আকাশলোকে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে, পাখীরা দূরদূরান্তরে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলেছে। সমুদ্রবক্ষে নৌকা দেখা দিয়েছে। দূর উত্তরে মাদ্রাজ বন্দরে জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। বড় বড় নৌকা পাল তুলে বের হচ্ছে। ছোট মাছ-ধরা নৌকা সারি সারি ছুটছে গভীর সমুদ্রের দিকে। মানুষের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। সূর্য উঠছে। কিন্তু সে কোথায় যাবে? দিনের আলোয় কি করে সে পথে বের হবে? সে সব বুঝেছে। আর কিছু তার অগোচর নেই। এই হয়! এই বুঝি নিয়ম! সূর্য উঠল। আলো রৌদ্র হয়ে ফুটল—উত্তাপের স্পর্শ লাগল দেহে। সেই স্পর্শে সে সচকিত হয়ে উঠল। যেতে হবে—কোথাও যেতে হবে। অনেক দূরে, অনেক দূরে। পালাতে হবে তাকে। দ্রুতপদে

সে বনবীথির ঘন-সন্নিবিষ্ট নারিকেল তালের কাণ্ডগুলির মধ্য দিয়ে চলতে লাগল। দক্ষিণ মুখে।

আবার সকালে জোয়ার আসছে। তার পদচিহ্নগুলি দূরে নিয়ে গেল জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস।

* * *

রঙ্গনাথন বেত্রাহতের মত ছুটে আসছিলেন।

প্রহরী দুজনও সকালে ঘুম ভেঙে তাঁকে না পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। তাঁকে দেখে আশ্বস্ত হ'ল, কিন্তু তাঁর অবস্থা দেখে তাঁকে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে আচার্য? ভোরবেলা উঠে কোথায় গিয়েছিলেন? সমুদ্রকূলে বুঝি?

তিনি বললেন—অ্যাঁ—? হ্যাঁ।

বলেই তিনি তাদের পিছনে ফেলে প্রায় ছুটে এসে ঘরে আপন শয্যার উপর গড়িয়ে পড়লেন। সর্বাঙ্গের বালুকণা ঝরে পড়ল শয্যার উপর। কিন্তু তার পীড়া অনুভব তিনি করলেন না। মুখ গুঁজে পড়ে রইলেন।

এ কি মর্মপীড়া! এ কি করলেন! হে বরদরাজ! এ কি শাস্তি দিলে তুমি! আবার উঠলেন। উঠে ভাণ্ডার ঘরের দরজা ঠেলে পূজোর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু প্রবেশ করতে গিয়েও প্রবেশ করতে পারলেন না।

স্নান করতে হবে তাঁকে। বেরিয়ে এলেন। কুড়ুমণিকে এবং প্রহরী দুটিকে বললেন—আমি স্নান করতে যাচ্ছি সমুদ্রে। মধ্যপথ থেকে ফিরে এলেন। যেতে পারলেন না। লল্লা—লল্লা নিশ্চয় নারিকেল কুঞ্জতলে এখনও পড়ে আছে। কঁদেছে। তাঁকে দেখলেই সে 'প্রভু' বলে এগিয়ে আসবে। পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদবে।

ফিরে এসে বললেন—না কুড়ুমণি, শরীর আমার অসুস্থ। সমুদ্রস্নান সহ্য হবে না। কূপ থেপে জল তুলে স্নান করে পূজোর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। ঘরখানি এখনও লল্লার অবস্থানের চিহ্নে মলিন হয়ে আছে। সযত্নে তিনি সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে পূজোর আয়োজন করে পূজোয় বসলেন। কিন্তু হ'ল না, পূজা হ'ল না। চোখ বন্ধ করলেই লল্লাকে দেখছেন। একটি দিনে লল্লা যেন শতমূর্তিতে নিজেকে তাঁর মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

গোশালার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে ম্লান মুখে, সজল চোখে ক্লিষ্ট শ্যামলতার মত।

লল্লা বিচালিস্তূপ থেকে যন্ত্রণাকাতর ভয়ার্ত মুখে বের হয়ে আসছে। লল্লা বৃশ্চিক-বিষে চেতনাহীন হয়ে ভেঙে পড়েছে।

লল্লা তাঁর বাহুর উপর।

লল্লাকে তিনি বরদরাজের সম্মুখে শুইয়ে দিয়ে বলছেন—তোমারই চরণপ্রান্তে একে সমর্পণ করলাম প্রভু। তুমি তাকে রক্ষা করতে পারবে না দেবতা? বুকের ভিতরটা তাঁর কেমন করে উঠল। চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল দরদর ধারে। পরমুহূর্তে তিনি চমকে উঠলেন। চোখ দুটি খুলে গেল। বিস্ফারিত হয়ে উঠল। মনের ভিতর থেকে বিপরীত প্রশ্ন জেগে উঠল। দেবতা তাকে তারই হাতে দিয়েছিলেন। দেবতা তো প্রতারণা করেন নি।

ওঃ! লল্লার সেই মুখ মনে পড়ছে। সেই দৃষ্টি মনে পড়ছে। তাঁর নিজের মাল্যখানি তার গলায় যখন পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—কামনা আমার আছে, কিন্তু কামার্ত পশু নই আমি। লল্লা, তোমাকে ছাড়তে পারব না আমি। এই মালা পরিয়ে তোমাকে সমুদ্র সাক্ষী রেখে বরণ করছি—তুমি আমার পত্নী—সেই মুহূর্তের লল্লার সেই অপরূপ সুষমা-দীপ্ত, প্রসন্ন-ক্লান্ত মুখখানি মনে পড়ছে। সারা ঘরখানিতে এখনও লল্লার দেহগন্ধ পাচ্ছেন তিনি।

লল্লা, লল্লা, লল্লা! সারা অন্তর ভরে লল্লাকে আহ্বান করে উঠল তাঁর হৃদয়। লল্লা! লল্লাকে তিনি ভালবাসেন। লল্লাকে তিনি পত্নী বলে গ্রহণ করেছেন। বরদরাজের যে প্রেরণায়, যে ইঙ্গিতে ওই গান তিনি রচনা করেছিলেন—কৃষ্ণচর্মের অন্তরালে যে দেবতা বাস করেন,—সেই দেবতাই বাস করেন বৈকুণ্ঠে—যে দেবতা বাস করেন বৈকুণ্ঠে—তিনিই বাস করেন কৃষ্ণবর্ণ চর্মের অন্তরালে—সেই প্রেরণাতে তিনি তাকে গ্রহণ করেছিলেন। হৃদয়ের অকপট, অকৃত্রিম, ছলনাহীন কামনা—যে কামনার পুণ্যে নারী পূর্ণ হয় পুরুষের মধ্যে, পুরুষ পূর্ণ হয় নারীর মধ্যে, সেই অকৃত্রিম পবিত্র কামনায় কাল তিনি তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। ভুল—ভুল করেছেন তিনি পালিয়ে এসে। ভুল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। ভুল সংশোধন না হলে জীবনের সে ক্ষতি আর পূর্ণ হয় না।

হে বরদরাজ! এ কি মতিভ্রান্তিতে তুমি ছলনা করলে?

কেন ? কেন ? কেন এমন ভ্রান্তি হ'ল তাঁর ? এত বড় আঘাতে তিনি বিচলিত হন নি, মিথ্যা বলেন নি। কারুর ভয়ে তাঁর উপলব্ধ সত্যকে অসত্য বলেন নি। কিন্তু তাঁর জীবনের চরমতম সত্যকে কি করে, কেন তিনি এইভাবে মুহূর্তের ভ্রান্তিবশে সাগর বালুবেলায় ফেলে দিয়ে চোরের মত পালিয়ে এলেন ?

আসন ছেড়ে উঠে পড়ছিলেন। আবার বসলেন। প্রণাম করে বললেন—লল্লাকে ফিরিয়ে আনতে চললাম প্রভু। লল্লা আমার জীবনের চরম সত্য। তাকে আমি ভালবাসি। তাকে আমি চাই তোমার প্রসাদের মত। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি চললেন সমুদ্রতটের দিকে। প্রহরী দুটিকে বললেন—আমি চললাম সমুদ্র-তটে। তটভূমি ধরে আমি যাব মান্দ্রাজ পর্যন্ত। তোমরা ফিরে যাও। কুড়ুমণিকে বললেন—ঘর রইল। ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

সাগর তটভূমে এসে দাঁড়ালেন।

রৌদ্র-ঝলমল সাগরজল—রৌদ্র এবং রৌদ্রকরোজ্জ্বল সাগর-জলচ্ছটায় প্রদীপ্ত বেলাভূমি পরম শুচিতায় পরিমার্জিত দেবতার অঙ্গনের মত প্রসারিত নারিকেল সুপারি বৃক্ষের তরবারির মত দীর্ঘ পাতাগুলি ঝিকমিক করছে। সরসর সরসর শব্দ উঠছে তাদের আন্দোলনে। সমুদ্রকল্লোল অবিরাম—অশ্রান্ত। কাঁদছে—কান্নাই মনে হচ্ছে তাঁর এই মুহূর্তে।

শূন্য বালুচরে লল্লা তো নেই।

তিনি হাঁটতে শুরু করলেন—উত্তর মুখে।

প্রথমে যাবেন লল্লাদের গ্রামে। তারপর মান্দ্রাজে। মান্দ্রাজে মায়লাপুরে—পার্থসারথি মন্দিরে দেখবেন। তারপর মহাবলীপুরম। তারপর কাঞ্চীভরম। লল্লাকে না পেলে যে হবে না তাঁর। না হলে যে সব মিথ্যে হয়ে যাবে। জীবন মিথ্যা হয়ে যাবে।

* * *

বেলা প্রথম প্রহর পার হচ্ছে। সমুদ্র নৌকোয় নৌকোয় ভরে গেছে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়েই ভাবছিলেন তিনি। একটি বড় যাত্রীবাহী নৌকা থেকে হাত তুলে কারা নমস্কার করলে। তাদের মধ্যে গৈরিকধারিণী এক প্রৌঢ়া। তিনি চিনলেন। পুরী থেকে ফেরার পথে পার্থসারথি দর্শনের জন্য মান্দ্রাজে নেমেছিল। সে দিন রাত্রে গান শুনে প্রৌঢ়া এসে তাঁকে হাত ধরে বলেছিল, শতায়ু হও। তারা ফিরছে

আজ। পথে সমুদ্রতটে তাঁকে দেখে চিনে অভিবাদন করছে। কিন্তু চিন্তামগ্ন রঙ্গনাথন যেন দেখেও দেখলেন না! প্রত্যভিবাদন না করেই উত্তর মুখে হাঁটতে শুরু করলেন। লল্লা। লল্লা। যোশেফদের গ্রামের প্রবেশপথে থমকে দাঁড়ান নি—কিন্তু যোশেফের বাড়ির দরজায় থমকে দাঁড়ালেন। গ্রামের পুরুষেরা অধিকাংশই বাইরে গেছে কাজে। মেয়েরা বিস্মিত হ'ল। তার পথ থেকে সরে দাঁড়াল, আপন আপন ঘরের ভিতর গিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। আচার্য একজন প্রবেশ করেছেন তাদের গ্রামে। চোখমুখে তাদের উত্তেজনা ফুটে উঠল।

—হে বরদরাজ! হে মহেশ্বর!

খৃষ্টানেরা ঘরে ঢুকল না, পথের পাশে সরে দাঁড়াল। রঙ্গনাথন যত অগ্রসর হলেন যোশেফের দরজার দিকে তত যেন দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। অকস্মাৎ এক সময় যেন সম্পূর্ণ পরাভূত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর বুকের ভিতর আলোড়ন উঠেছে আবার। কি বলবেন তিনি? কি করে বলবেন? কি করে বলবেন, লল্লাকে তিনি কাল রাত্রে সমুদ্র সাক্ষী করে—শেষ হ'ল না মনের প্রশ্ন। একজন খৃষ্টান যুবক উত্তেজিত উদ্ধত ভঙ্গিতে পাশের গলিপথ থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে। মুষ্টি উদ্যত করে বললে—কেন প্রবেশ করেছ তুমি আমাদের পল্লীতে? কি প্রয়োজন তোমার? গোক্ষুর সর্প, কাকে দংশন করতে এসেছ?

চোখ বুজলেন রঙ্গনাথন। মনে মনে বরদরাজকে স্মরণ করে নিজের মনকে দৃঢ় করতে চেষ্টা করলেন। মনের মধ্যে যে অগ্নি জ্বলজিল, যার শিখা গ্রামে প্রবেশ করার থেকেই নিভে আসছে ধীরে ধীরে, তাতে আবেগ এবং সংকল্পের ইন্ধন ও হবি দিয়ে তাকে জ্বালাবার চেষ্টা করলেন।

যুবকটি বললে—তোমাকে কে আঘাত করলে আর তুমি নাম করলে আমাদের।

চমকে উঠলেন রঙ্গনাথন, বললেন—না। আমি কারও নাম করি নি। আমি কাউকেই তাদের চিনতে পারি নি। অসত্য আমি বলি না।

ধীরে ধীরে পাশে লোক এসে জমেছিল। তাদের মধ্যে থেকে একটি নারী-কণ্ঠস্বর বলে উঠল—উনি বলেন নি, বলেছে লল্লা। সমস্ত খৃষ্টানদের সে শত্রু। শবরদেরও সে ঘৃণা করে—সেই বলেছে। আমি গোড়া থেকে বলছি। তার কথাতেই কোতোয়ালীতে আমাদের জোয়ানদের ধরেছে।

রঙ্গনাথনের মনে আগুন জ্বলল আবার। তিনি প্রশ্ন করলেন—কাকে ধরেছে? কবে ধরেছে?

—মান্দ্রাজ শহরে থাকে আমাদের যে সব জোয়ানেরা তাদের দশজনকে ধরেছে আজ ভোরে। লোক এই কিছুক্ষণ আগে সংবাদ এনেছে।

আর একজন বললে—ন্যাকা সাজছে। কিছু যেন জানে না।

অন্যজনে বললে—গ্রামে ও এসেছে আমাদের মুখ দেখে চিনতে। ওকে ধর ধর—ঘরে বন্ধ কর। রাত্রে—

কলরব করে উঠল লোকেরা। কিছু লোক পালিয়ে গেল। রঙ্গনাথন তখন মনের বল ফিরে পেয়েছেন। বললেন—বরদরাজের নাম নিয়ে বলছি—আমি কিছুই জানি না। লল্লাও কিছু জানে না। জান তোমরা লল্লা কোথায়? তাকে কি তোমরা সন্দেহ করে আটকে রেখেছ? দোহাই তোমাদের, সত্য বল।

নির্ভীকতা শুধু আক্রমণকারীকে প্রতিহত করে না, খানিকটা পশ্চাৎপদও করে দেয়। এই নির্ভীকতার সঙ্গে সহৃদয় আকুতি থাকলে আক্রমণকারীর বিদ্বেষকেও নষ্ট করে। বিস্ময় জাগায়।

তাই হ'ল। এরা রঙ্গনাথনের কথায় স্তব্ধ হয়ে সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রঙ্গনাথন বললেন—আমাকে একটি সত্য কথা বল—লল্লা কোথায়? আমি নিজে এখনি কোতোয়ালীতে যাচ্ছি। নিশ্চিন্ত থাক—আমি মিথ্যা বলব না। তারা সঙ্গে সঙ্গেই ছাড়া পাবে। বল।

একজন প্রৌঢ় এসে বললে—মেইরীর নামে শপথ করে বলছি আচার্য, লল্লা কোথায় আমরা জানি না। সে তো গ্রাম পরিত্যাগ করেছে তার মায়ের মৃত্যুর পর।

—আজ? আজ সকালে? আজ সকালে সে আসে নি?

—না আচার্য। শপথ করে বলছি। বিশ্বাস করুন।

রঙ্গনাথন আর দাঁড়ালেন না। তিনি মান্দ্রাজের পথে ছুটলেন।

একি বাধা, একি বিঘ্ন তাঁর গতিকে অন্যদিকে ভিন্নমুখে আকর্ষণ করছে! লল্লার সন্ধান থেকে বিরত হয়ে তাঁকে যেতে হবে কোতোয়ালী। সেখানে তারা যে কি করবে—কতক্ষণ তাঁকে আটকে রাখবে, কে জানে। লল্লা কোন দূরদূরান্তরে ছুটে পালাচ্ছে লজ্জায়, ঘৃণায়—তাঁর প্রতি ঘৃণায়। লল্লাকে যে তাঁকে ধরতে হবে—বলতে হবে, লল্লা, আমি বুঝেছি; লোকলজ্জার ভ্রান্তি আমার কেটেছে, সমাজের ভয় আমার

নেই। তোমার মধ্যে আমার জীবনের লালসাকে তো নয়—আমার ভালবাসাকে পেয়েছি। ভালবাসার কাছে ভ্রান্তি ভয় সব তুচ্ছ। আমাকে ক্ষমা কর। ফিরে এস।

সে পথে এ কি বাধা।

কোতোয়ালীতে তখন শ্রীনিবাস তাঁর প্রতীক্ষা করছিলেন। এ ধ্যে তাঁর কাছে সওয়ার চলে গেছে। কোতোয়ালীর কর্মচারীরা গোপন তদন্ত করে দশজন শবর খৃষ্টান এবং পাঁচজন শৈবকে ধরেছেন। এরা নামে শৈব হলেও ধর্মের কোন ধার ধারে না—আসলে দুষ্ট প্রকৃতির লোক।

শ্রীনিবাসনের ঘরের বারান্দায় যোশেফ বসে আছে, একজন ফাদার বসে আছেন। মায়লাপুরের শিবমন্দিরের একজন প্রতিনিধি বসে আছেন। আচার্য চিদাম্বরমও এসেছেন।

শ্রীনিবাসন বললেন—কোথায় গিয়েছিলেন আচার্য? সওয়ার ফিরে এসে বললে, আপনি মান্দ্রাজ রওনা হযেছেন প্রাতঃকালে পূজা সেরেই?

রঙ্গনাথনের দৃষ্টির মধ্যে একটি প্রখরতা বিস্ফুরিত হচ্ছিল।

লল্লার কামনা—নিজের অনুশোচনা তাঁকে অধীর করে তুলেছে। একটা উন্মত্ত বিদ্রোহ তাঁকে ক্ষিপ্তপ্রায় করে তুলেছে। নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সমাজ ধর্ম সবকিছুর বিরুদ্ধে। কোতোয়ালীর বিরুদ্ধেও। কারণ কোতোয়ালী লল্লাকে খুঁজছে। মিথ্যা সন্দেহে খুঁজছে। যোশেফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আচার্য চিদাম্বরমের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ। সবাই, সবাই যেন হেতু—যার জন্য তিনি লল্লাকে ফেলে কুৎসিত প্রকৃতির ভীরু চোরের মত পালিয়ে এসেছেন; মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন জাগছে একটা; আশ্চর্য, একটি নারীর জন্য একি উন্মত্ততা! সঙ্গে সঙ্গে সে উন্মত্ততা প্রবলতর হয়ে চীৎকার করে উঠছে—হাঁ, লল্লাকে না পেলে আমি উন্মাদ হয়ে যাব। এখন অর্ধোন্মাদ। পরে পূর্ণোন্মাদ হয়ে যাবে।

প্রখর কণ্ঠেই বললেন রঙ্গনাথন—আপনি রাজকর্মচারী। আপনি আপন অধিকারের মানুষদের রাজকর্মের প্রয়োজনমত চালিত করতে চান। কিন্তু মানুষের হৃদয় তো সে প্রয়োজনে চলে না। বরদরাজের অনুজ্ঞায় হৃদয়ের প্রয়োজনে আমি গিয়েছিলাম যোশেফদের পশ্চাতে। সেখানে সংবাদ পেলাম আপনারা সন্দেহবশে কয়েকজন মান্দ্রাজের বাসিন্দা ওই গ্রামের যুবকদের ধরেছেন। কয়েকজন শৈবধর্মানুরাগীকেও ধরেছেন। সংবাদ পেয়েই আমি ছুটে আসছি। আমি তো বার বার বলেছি—

আমি তাদের কাউকে চিনতে পারি নি এবং সন্দেহও কাউকে করি না। সুতরাং কেন অনর্থক সন্দেহবশে—

বাধা দিলেন শ্রীনিবাসন—আচার্য রঙ্গনাথন, দেশের আইন যা তা আপনি মানতে বাধ্য। ধর্মত বাধ্য। নন কি?

চুপ করলেন রঙ্গনাথন। একটু নীরব থেকে বললেন—বেশ, বলুন কি করতে হবে?

—যাদের সন্দেহবশে আমরা ধরেছি তাদের দেখুন। চিন্তা করে মনে মনে মিলিয়ে বলুন, কারও সঙ্গে আকার আয়তন অবয়ব দৃষ্টিগত কোন সাদৃশ্য আছে কি না?

—চলুন।

কোতোয়ালীর পশ্চাৎভাগে একটি খোলা জায়গায় প্রহরাধীন লোক কয়েকজনকে এনে দাঁড় করানো হ'ল। রঙ্গনাথন সামনে এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীনিবাসন বললেন—ভাল করে দেখুন।

রঙ্গনাথন তাকালেন তাদের দিকে। বিচিত্র। একবার মুখখানা পাংশু হ'ল—পরমুহূর্তে কঠিন হ'ল, পরমুহূর্তে মাথাটা ঝাঁকি দিলেন অকারণে। খৃষ্টান শবরদের দেখা হয়ে গেলে বললেন—না, মাননীয় শ্রীনিবাসন, আমি কারুর সঙ্গে কোন মিল দেখতে পাচ্ছি না। এরা কেউ নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

মানুষগুলির মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল একমুহূর্তে। স্মিত হাসি ফুটল মুখে—প্রসন্ন হয়ে উঠল মুখ। দৃষ্টি এমন কিছু বললে যা রঙ্গনাথনের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে উঠল।

শ্রীনিবাসন বললেন—ছেড়ে দাও এদের। চলুন, এবার ওদিকে চলুন। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছিল শৈবধর্মানুরাগীরা। সেখানেও সেই একই ঘটনা ঘটল।

রঙ্গনাথন বললেন—এবার আমাকে মুক্তি দিন, আমি যাই।

শ্রীনিবাসন বললেন—আপনি ইচ্ছাপূর্বক চিনতে চাইলেন না রঙ্গনাথন।

—ইচ্ছাপূর্বক চিনতে চাইলাম না? প্রশ্ন করলেন। বোধ হয় নিজেকেই করলেন। তারপর বললেন—না।

—আর যেন দোষীকে ধরতে না পারার জন্য আমাকে দোষ দেবেন না।

—না দিই নি, দেব না। আমি আসি মাননীয় রাজ-প্রতিনিধি। আমার দাঁড়াবার সময় নেই।

—কোথায় যাবেন ?

—আমি ? ক্ষণেক স্তব্ধ থেকে বললেন—ঠিক জানি না। উদ্দেশ্যহীন যাত্রা শ্রীনিবাসন। বিস্মিত হবেন না। বরদরাজের অনুজ্ঞা—হৃদয়ের নির্দেশ আমাকে তাড়না করে ছোটাচ্ছে।

বাইরে আসতেই পাদ্রীটি উঠে বললেন—আপনি সত্যবাদী। ঈশ্বর আপনার উপর খুশী হবেন। ধন্যবাদ আপনাকে।

যোশেফ বললে—আচার্য রঙ্গনাথন, আপনাকে শ্রদ্ধা করি আমি। আমরা এ কখনও ভুলব না।

রঙ্গনাথনের চোখ দুটি মুহূর্তের জন্যে বিস্ফারিত হ'ল—কোন চিন্তার প্রতিফলন পড়ল। তারপর বললেন—একটা অনুরোধ করব তোমাকে ?

—বলুন। আমরা অকৃতজ্ঞ নই।

—লল্লা যদি ফিরে আসে তাকে বলো, সে যেন আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার জন্যে আমার ঘরে অপেক্ষা করে। বলো আমার পূজোর ঘরে যে বরদরাজের ছোট মর্তি আছে—তার সেবার অধিকার তাকে আমি দিয়ে গেলাম।

—আচার্য! প্রবল বিস্ময়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল যোশেফ। সমবেত জনমণ্ডলীরও বিস্ময়ের সীমা রইল না।

রঙ্গনাথনের চোখে অর্ধোন্মাদের চোখের অস্বাভাবিক দৃষ্টি। তিনি বললেন—কাল রাত্রে আমায় বরদরাজ এই আদেশ করেছেন।

—বরদরাজ আদেশ করেছেন ?

ওদিক থেকে আচার্য চিদাম্বরম বলে উঠলেন—হাঁ-হাঁ, করবেন বই কি! কালের মহিমা। কলিযুগ, হিন্দু কাল বহু দিন বিগত, মুসলমান কালেও দেবতা এমন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন নি। এবার এসেছে শ্বেত ইংরাজ। এবার দেবতাদেরও ম্লেচ্ছাচারে অনাচারে রুচি না হলে কাল-মহিমা প্রকট হবে কেন ? কিন্তু আচার্য রঙ্গনাথন—দেবতার এ আদেশ আমরা মানব না। দেবমূর্তি কলুষিত হলে আমরা তা নিক্ষেপ করি নদীগর্ভে। এই কলুষ-অশুচি-অভিলাষী তোমার দেবমূর্তিটাকে তুমি সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ কর—নতুবা তোমাকে ক্ষমা করব না আমরা। তুমি পতিত—শবরতুল্য হলে আজ থেকে।

রঙ্গনাথন বললেন—জয় বরদরাজ স্বামী! তোমার অমৃত প্রসাদ দাও। হে প্রভু!

তিনি বেরিয়ে এলেন কোতোয়ালী থেকে। চললেন পার্থসারথির দিকে।

মন্দিরে তিনি ঢুকলেন না। যেদিকে ভিক্ষার্থীরা থাকে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—লল্লাকে দেখেছ ?

—না তো প্রভু।

মায়লাপুরে কপালীশ্বর শিবনিকেতনের আশপাশের ভিক্ষার্থীদেরও এই প্রশ্ন করলেন—

—লল্লা ? লল্লা কোথায় জান ?

—কই. না তো !

চলো তবে মহাবলীপুরম। পথ চলতে চলতে হঠাৎ স্মরণ হ'ল এক-বস্ত্রে কপর্দকহীন হয়ে বেরিয়ে এসেছেন তিনি।

কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন। তারপর আবার চলতে শুরু করলেন। এই ভাল। এই শ্রেয়ঃ। ফিরে গিয়ে অর্থ এবং কাপড়-চোপড় আনতে যে সময় যাবে তার মধ্যে লল্লা কত—কত দূরান্তরে চলে যাবে। লল্লার জন্য তিনি অধীর উন্মাদ হয়ে যাচ্ছেন মুহূর্তে মুহূর্তে। ধর্ম নয়, কর্তব্য নয়, তার থেকেও বড় কিছু। জীবনের তৃষ্ণা—শুধু তৃষ্ণা নয়, অমৃত তৃষ্ণা!

চলো মহাবলীপুরম—

মহাবলীপুরমেই বা কই লল্লা ? সে তো আসে নি !

চলো কাঞ্জীভরম—

কাঞ্জীভরমেই বা কই লল্লা ? কাঞ্জীভরমে শুধু এইটুকু শুনলেন —তাঞ্জোরে অনেক যাত্রী গেল। ভিক্ষুক দলও গেছে। সেখানে বিরাট উৎসব।

চলো তাঞ্জোর। একমাত্র বস্ত্র ধূলি-মলিন হয়ে গেল ; দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল মুখ ; পাদুকা ছিন্ন হয়ে গেল, ফেলে দিলেন। উত্তরীয়খানি থেকে তৈরি করলেন ভিক্ষার ঝুলি। গান রচনা করলেন—সুর যোজনা করলেন, সেই গান গেয়ে ভিক্ষাজীবী রঙ্গনাথন চললেন। অমৃতপ্রসাদ দাও—জয় বরদরাজ হে! হায়, কোথায় অমৃত প্রসাদ ! হায়—কোথায় অমৃত প্রসাদ !

অমৃত হয়তো কথার কথা। না, একবার তো তার সৌরভ অনুভব করেছিলেন। মুখের কাছে পাত্রখানি ধরে মুগ্ধ হয়ে বসেই ছিলেন ; তারপর ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আর মিলল

না। সম্ভব একবারই মেলে। যে পান করে সে অমর হয়—যে ফেলে দেয় তার আর মেলে না। তৃষ্ণার্ত ধরিত্রী শোষণ করে নেয়; অথবা পরিত্যক্ত পাত্রের আধেয় বাতাস রৌদ্র পান করে ধন্য হয়। পড়ে থাকা পাত্রখানিতে তার আর কোন চিহ্ন পর্যন্ত মেলে না। শূন্য পাত্রখানি হাতে নিয়ে তখন উপলব্ধিতে আসে আসল সত্য। 'সব মিথ্যা' এইটেই সত্য।

* * *

জীবনে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কতবার এই কথা রঙ্গনাথনের মনে হ'ল—তার সংখ্যা তাঁর মনে নেই। তাঞ্জোরে মনে হয়েছে। মাদুরায় মনে হয়েছে। প্রতি স্থানেই মনে হয়েছে এই কথা। আজও নিজের বীণাখানির উপর হাত রেখে এই কথাই ভাবলেন।

চার বৎসর পর। চার বৎসরের মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে তাঁর জীবনে। সংসারে সব মিথ্যা। তাঞ্জোর গিয়ে তিনি বিতাড়িত হলেন—মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করতে পেলেন না। তাঁর আসবার পূর্বেই মান্দ্রাজে আচার্য চিদাম্বরমের দণ্ডের কথা তাঞ্জোরে পৌঁছে গিয়েছিল। মহাবলীপুরম যখন পৌঁছেছিলেন—তখন সেখানে বার্তা পৌঁছয় নি। তিনিই সেদিন সেই মুহূর্তের প্রথম যাত্রী মান্দ্রাজ থেকে মহাবলীপুরম মুখে। কাঞ্জীভরমেও তিনি যাত্রা করতে বিলম্ব করেন নি। কাঞ্জীভরম থেকে যাত্রা করে পথে তিনি বিলম্ব করেছিলেন। তিনি সমুদ্রতটের দিকে ফিরেছিলেন পথ থেকে। খোঁজ করতে চেয়েছিলেন তটভূমে এমন একটি কিশোরীর মৃতদেহ কি কেউ পড়ে থাকতে দেখেছে?—কয়েক দিন পর মনে হয়েছিল—না।—সে সে তা করবে না। তার বাবা তাকে বলে গেছে—সে বরদরাজের প্রসাদ পাবে। তার মা তাকে বলে গেছে—কোন দেবমন্দিরের চারিপাশ মার্জনা করে গোপুরমের বাইরে দাঁড়িয়ে তার সুন্দর কণ্ঠে বন্দনা গাইলেই জীবন চরিতার্থ হবে। সে তো সমুদ্রে ঝাঁপ খাবে না। আবার ফিরে তাঞ্জোরেই গিয়েছিলেন। তখন তিনি একেবারে ভিক্ষুক।

গোপুরমের বহির্দেশে কাঞ্জীভরমের একজন শৈবপাণ্ডা একদল তীর্থযাত্রী সঙ্গে করে তাঞ্জোরের শিবমন্দিরের পাণ্ডাদেব হাতে দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই ব্যক্তি তার নিজের বরদরাজ মূর্তিকে খৃষ্টান শবরদের হাতে দিয়েছে। নিজে খুঁজে

বেড়াচ্ছে এক শবরীকে। এ লোকটা গায়ক কিন্তু কি গান করে জান? গান করে শবর ব্রাহ্মণে ভেদ নেই। পাষণ্ড, পাষণ্ড—! এর পদার্পণে মন্দির অপবিত্র হবে!

মন্দিরে তিনি প্রবেশ করেন নি। প্রয়োজনও ছিল না। লল্লা থাকলে মন্দিরের বাইরেই থাকবে। কিন্তু ব্রাহ্মণরা ইঙ্গিতে ও বক্র বাক্যে নানান জনে তাঁকে নানা লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত করেছিল। বিদ্রূপের আর অন্ত ছিল না। ভেঙে পড়েছিলেন আর একবার।

লল্লার জন্য আর এমন করে উন্মাদের মত ঘুরবেন না। ফিরে যাবেন মান্দ্রাজে। একটি বৃক্ষতলে সারারাত্রি পড়েছিলেন। মধ্যে মধ্যে মনে মনে বলেছিলেন—হ'ল না। পারলাম না। লল্লা, লল্লা।

পরদিন তাঞ্জোর ত্যাগ করে মান্দ্রাজের পথে খানিকটা এসে আবার ফিরেছিলেন। লল্লাকে না পেলে বেঁচে তাঁর লাভ নেই। এর পর কিন্তু তাঁর আর সন্ধানের কোন শৃঙ্খলা ছিল না। পথে পথে চলেছিলেন, যে দিকে বেশী লোক চলে সেই দিকে—সে পথে যে স্থান পড়ে, সেই স্থানেই তাকে খুঁজেছেন। গান গেয়ে ভিক্ষা করেছেন, কিছু সঞ্চয় করেছেন, আবার চলেছেন।

এমনি করে আট মাস ঘুরেছিলেন। তিনি তখন প্রায় উন্মাদ।

সারা দেশে অরাজক। একে একে হিন্দু-মুসলমান রাজবংশ সামুদ্রিক ঝড়ে সমুদ্রতটের নারিকেল তালবৃক্ষের মত উৎপাটিত হয়ে পড়ছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির ভাই কর্নেল ওয়েলেসলি ঝড়ের মত বিক্রম নিয়ে একের পর এক মারহাটা টিপু সুলতান, ত্রিবাঙ্কুর রাজশক্তিকে পরাভূত করছে। ওদিকে পিণ্ডারী, ঠগ, চোর ডাকাতে দেশ পরিপূর্ণ। এর মধ্যে পূর্ণোন্মাদ বলেই তাঁর ঘোরা সম্ভবপর হয়েছিল। দেহের শ্রীও তখন পথের ধূলায় ঢাকা পড়েছে; মলিন বেশবাস এবং কাঁধের ভিক্ষার ঝোলাই ছিল আত্মরক্ষার বর্ম। আর একটি অস্ত্র ছিল। সে তাঁর গান। যেই হোক, গান শুনে তারা করুণাই করেছে। তারপর এক ঘটনা ঘটল। তিনি তখন শ্রীরঙ্গমে। সেই অবস্থাতেই গোদাদেবীর উপাখ্যান নিয়ে গান রচনা করে মুখেই শুধু গেয়ে ভিক্ষা করতেন। তাঁর বড় ভাল লেগেছিল এ উপাখ্যান। বিষ্ণুভক্ত পেরিয়ার কন্যা গোদা; স্বপ্নাদেশ দিয়ে শ্রীরঙ্গনাথস্বামী পেরিয়ার কন্যা গোদাবরীকে বিবাহ করেছিলেন। এ কাহিনীর মধ্যে কোথায় যেন লল্লার সঙ্গে মিল দেখতে পেতেন। মধ্যে মধ্যে ভাবতেন—লল্লা আর নেই।

লল্লা তাকে বলেছিল বরদরাজ।—তার সে ভুল ভেঙে দিয়েছেন বরদরাজ। রঙ্গনাথনকে দিয়েই নিজের স্বরূপ নিজে খুলিয়ে দিয়েছেন। এবং তাকে টেনে নিয়েছেন। লল্লাও গোদাবরী-কন্যার মত মরদেহ থেকে মুক্ত হয়ে বরদরাজের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। যিনি শ্রীবরদরাজ তিনিই শ্রীরঙ্গনাথন। অর্থ তাঁর কিছু জমেছিল। শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর বিশাল মন্দিরের স্তরে স্তরে বিন্যস্ত চত্বরের মধ্যে পাগলের মত খুঁজতেন —লল্লা! লল্লা! লল্লা!

একদিন একজন লোক তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল—বাঈ সাহেব ডাকছেন। প্রশ্ন করেছিলেন ক্রুদ্ধভাবেই—কে বাঈ?

নাম শুনে সম্ভ্রমে মাথা নত করেছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে সে নাম তাঁর স্মরণে ছিল। বিখ্যাত সরস্বতী বাঈ; সঙ্গীতজ্ঞদের আম্মা। মা। তিনি শ্রীরঙ্গনাথস্বামী দর্শনে এসেছেন, দুদিন তাঁর গান শুনেছেন। শুনে ডেকেছেন।

পক্ককেশী বৃদ্ধা সরস্বতী বাঈ। তিনি তাঁকে পুত্র বলে সম্বোধন করেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন—এমন মূলধন থাকতে ভিক্ষা কর কেন? প্রথমটা রঙ্গনাথন মৌন ছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে হৃদয়ের উত্তপ্ত স্পর্শে বিগলিত হয়েছিলেন।

তিনি তাঁর পিঠে মলিন বস্ত্রের উপর পরম স্নেহে হাত রেখে বলেছিলেন —দেবতাকে খোঁজ?

সে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন—সে কি মেলে পুত্র? আমি তো বলতে পারব না। জানি না। আমার জীবনে তো—। একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন —প্রথম জীবনে রূপ আর কণ্ঠের জন্য বিক্রি হয়েছিলাম। রাজা সুলতানের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে দেখলাম মনোরঞ্জন করা যায়, সেও অল্পক্ষণ বা দিনের জন্যে। সম্পদ মেলে। মন মেলে না। এ বয়সে বিগ্রহ দর্শন করতে এসেছি। দর্শনই মিলে, তার বেশী কিছু না।

তবুও তিনি কিছু বলতে পারেন নি তাঁকে। তারপর বলেছিলেন—আমি খুঁজছি একজনকে।

—মানুষ?

—হ্যাঁ।

—নারী?

—হ্যাঁ।

—তোমার স্ত্রী ?
—হ্যাঁ।
—হারিয়ে গেছে ?
—হ্যাঁ।
সরস্বতী বাঈ বলেছিলেন—পুত্র, ঈশ্বর হলে বলতাম হয়তো পেতে পার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বলছি আর তো পাবে না তাঁকে।
—পাব না ?
—না। সে যুবতী। দেশ অরাজক। অরাজক বলেই বা কেন, পুরুষদের মধ্যে লম্পট কামুক বেশী। নরখাদকের চেয়েও তারা হিংস্র। হারিয়ে গিয়ে থাকলে পাবে না। নিজের কথা মনে পড়ছে। বললাম না আমার রূপ ছিল কষ্ট ছিল। ফলে—
—তারও আছে।
—তবে আর কি! সে হয় মরেছে নয় হাটে বাজারে বিক্রি হয়ে গেছে। খুঁজতে খুঁজতে দেখা হয়তো পাবে কিন্তু সেও তোমাকে চিনবে না, তুমিও চিনতে পারবে না, চিনতে পারলে আত্মহত্যা করবে।
রঙ্গনাথন উন্মাদের মত উঠে চলে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আম্মা তাঁর হাতে ধরে বলেছিলেন – আমি আম্মা, পুত্র, যেও না, আমার কথা শোন। তোমার এমন কণ্ঠ, এমন গান। বস। পথে মরলে বড় কষ্ট পাবো। বস। গান গাও। শোনাও আমাকে কিছু।
—পারব না। মার্জনা করুন।
বৃদ্ধা বলেছিলেন—তাহলে আমিই গাই, শোন। বলেই তাঁর বীণা নিয়ে বসেছিলেন। গেয়েছিলেন রঙ্গনাথস্বামীর স্তোত্র।

পদ্মাধিরাজে-গরুড়াধিরাজে বিরিঞ্চিবাজে গুররাজরাজে
ত্রৈলোক্যরাজেহখিইলোকরাজে শ্রীরঙ্গরাজেরমতাং মনোমে।
লক্ষ্মী নিবাসে জগতাং নিবাসে-উৎপন্ন বাসে রবিবিম্ববাসে—
ক্ষীরাব্ধিবাসে ফণিভোগবাসে শ্রীরঙ্গবাসেরমতাং মনোমে!

শান্ত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলন শ্রীরঙ্গনাথন। আম্মা বলেছিলেন—কিছুদিন আমার কাছে থাক। সুস্থ হও। তুমি অসুস্থ।
তাই ছিলেন তিনি। তাঁর পরামর্শেই তিনি পালাগান ফেলে দক্ষিণী মার্গসঙ্গীত নতুন করে চর্চা করেছিলেন। মাস চারেক পর। তখন তাঁরা পণ্ডিচেরীতে। গোলযোগ তখন ঘনিয়ে উঠছে দক্ষিণ পথের উত্তর অংশে। দক্ষিণ পর্যন্ত তার ঢেউ এসেছে। ভোঁসলে সিন্ধিয়া হোলকার একসঙ্গে

মিলে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দক্ষিণ মুখে আসছে। সরস্বতী বাঈ শেষ মহীশূর যুদ্ধে শ্রীরঙ্গপত্তনে ছিলেন। সে রক্তপাত লুঠতরাজের স্মৃতি তাঁকে বিহ্বল করেছিল। বলেছিলেন, পুত্র, মানুষ যখন যুদ্ধ করতে নামে তখন রাক্ষস হয়ে যায়। আমি জানি। চল। পণ্ডিচেরী ফরাসী এলাকা ; সেখানে চল।

পণ্ডিচেরীতে এসে আম্মা সরস্বতী বাঈয়ের কাছে কয়েক মাস ছিলেন। তাঁর কাছে নতুন করে চর্চা করেছিলেন মার্গসঙ্গীতের। মন তাঁর ধীরে ধীরে অনেক সুস্থ হয়ে এসেছিল।

পণ্ডিচেরীতে কয়েকটা মজলিসে গান গেয়ে খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। হঠাৎ এরই মধ্যে মনে পড়েছিল লল্লাকে। লল্লা যদি মান্দ্রাজে এর মধ্যে ফিরে এসে থাকে? কয়েক দিনের মধ্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। একদিন বলেছিলেন সরস্বতী বাঈকে—আমাকে যেতেই হবে আম্মা। আমাকে যেতেই হবে। আমার মন বলছে—সে এতদিনে মান্দ্রাজ ফিরেছে। আম্মা বাধা দেন নি।

পণ্ডিচেরী থেকে একদিন আম্মা সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে মান্দ্রাজে ফিরেছিলেন। স্থলপথে নয়, সমুদ্রপথে বড় মালবাহী নৌকোয়। আম্মা তাঁকে অর্থ দিয়েছিলেন, আর একটি বীণা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—পুত্র, মনকে বাঁধো। তাকে আর পাবে না। এই দুনিয়ায় হারানোই নিয়ম। মানুষ হারাতেই আসে। বেঁচেও যদি থাকে, তবুও ঠিক সেই তাকে আর পাবে না।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—ঈশ্বর খুঁজতে বারণ করবার অধিকার আমার নেই। নিজে এই বৃদ্ধ বয়সে ওই ছাড়া তো বাঁচবার পথ দেখি না। তবুও বারণ করছি। তোমার মূলধন আছে। ওই ভাঙিয়ে যদি চিরকাল রাখতে পার তবে যে সুখ পাবে সে চোখের জলের সুখ।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন—তার থেকে তুমি ঈশ্বরকে খুঁজো। না পেলেও দুনিয়া তেতো হবে না। তাঁকে শুধু জীবনেই মেলে না, মরণেও মেলে। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

তারপর বলেছিলেন—কিন্তু—। তুমি কি এখানেই থাকতে পার না পুত্র? শবরীকে তুমি পত্নী হিসাবে গ্রহণ করতে চাও—তুমি কি আমাকে জননী হিসাবে গ্রহণ করে, আমার কাছে থাকতে পার না? তোমাকে সম্পদের লোভ দেখাব না। কিন্তু সঙ্গীত, সে তো দেবদুর্লভ সম্পদ। তাই দেব আমি তোমাকে।

রঙ্গনাথন বলেছিলেন—আম্মা, ভেবে দেখুন—রামচন্দ্র বনবাসে এসে-ছিলেন—এসে সীতাকে হারিয়েছিলেন। বনবাস-অন্তে সীতা উদ্ধার করে ফিরেছিলেন। সীতাকে না নিয়ে তিনি কি কৌশল্যা মাতার কাছে ফিরতে পারতেন? ফিরলে কৌশল্যা মাতাও কি তাঁকে ফিরিয়ে দিতেন না, বলতেন না, সীতাকে নিয়ে তবে তুমি ফিরে এস?

সরস্বতী বাঈ বলেছিলেন—ঠিক বলেছ পুত্র। আমিও তোমাকে তাই বলছি—তুমি যাও। লল্লাকে নিয়ে তবে তুমি ফিরে এস। আর না পেলেও যেন এস।

রঙ্গনাথন প্রথমেই ফিরেছিলেন মান্দ্রাজ। প্রথম দেখা হয়েছিল যোশেফের সঙ্গে।

যোশেফ প্রশ্ন করেছিল—তুমি কোথায় গিয়েছিলে আচার্য?

—তারই সন্ধানে।

—লল্লার?

—হ্যাঁ যোশেফ। আমি তোমার কাছে সত্য বলব। তাকে আমি বরদরাজের নাম নিয়ে সমুদ্র সাক্ষী করে বিবাহ করেছিলোম। সেইদিন রাত্রে যেদিন—। সংক্ষেপে সমূহ বলেছিলেন তিনি যোশেফকে। বলেছিলেন—আমার অপরাধ। আমার অপরাধে—। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি।

যোশেফ সবিস্ময়ে বলেছিল—তুমি শবর হয়েছ রঙ্গনাথন?

রঙ্গনাথন বলেছিলেন—না যোশেফ, লল্লাকে ব্রাহ্মণী করব বলে গ্রহণ করেছিলাম।

যোশেফ আক্ষেপ করে বলেছিল—হতভাগিনী, সে হতভাগিনী। নির্বোধ। সে আমার কাছে এল না কেন? একটু পরে সে প্রশ্ন করেছিল—কিন্তু তুমি এখন কি করবে রঙ্গনাথন?

—ঠিক তো জানি না।

যোশেফ সাগ্রহে বলেছিল—একটা কথা বলব আচার্য?

—বল।

—তুমি কৃশ্চান হবে? তোমার সঙ্গে আমি খুব সুন্দরী কৃশ্চান-কন্যার বিবাহ দেব। যারা ব্রাহ্মণ থেকে কৃশ্চান হয়েছে তাদের কন্যা। পাদরীরা আমার কথা শুনবে।

হেসে রঙ্গনাথন বলেছিলেন—না যোশেফ। লল্লা—লল্লা ছাড়া আর কারুর আমার জীবনে স্থান নেই। সে হয় না যোশেফ।

যোশেফ একটু চুপ করে থেকে ছিল, তারপর বলেছিল—তা হলে তুমি আর মান্দ্রাজে থেকো না রঙ্গনাথন। এ কথা প্রকাশ হবে—

—তাতে তো আমি লজ্জিত হব না যোশেফ। পতিত তো আমি হয়েই আছি।

লজ্জিত তিনি সত্যিই হন নি। মান্দ্রাজকে তিনি জয় করেছিলেন গানে। পালাগান গান নি। মার্গসঙ্গীত গেয়ে তিনি নতুন করে মানুষকে জয় করেছিলেন। মন্দিরে নয়—সঙ্গীত-বিলাসী মানুষদের নিমন্ত্রণে শুধু মানুষের আসরে। তাঁর অপূর্ব সঙ্গীতের জন্য তাঁর পাণ্ডিত্যকে মানুষের হৃদয় আর প্রশ্রয় দেয় নি। লোকে বলেছিল, রঙ্গনাথন পাগল হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছে গানে।

আচার্য চিদাম্বরম বলেছিলেন—তুমি একটা প্রায়শ্চিত্ত কর রঙ্গনাথন।

রঙ্গনাথন হেসে বলেছিলেন—মার্জনা করবেন আচার্য !

*　　　*　　　*

সমাজ থেকে দূরে তিনি সেই সমুদ্রতটে আপনার ঘরে বাস করতে লাগলেন। কাটাবেন লল্লার তপস্যায়। লল্লার স্মৃতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। নিশীথ রাত্রে পূর্ণিমার দিন—সমুদ্রে যখন জোয়ারের ডাক উঠত তখন অকস্মাৎ তাঁর মনে হ'ত সমুদ্রতটে নারিকেল বনের বাতাসে যেন একটি নারী-কণ্ঠের আকুল ডাক ভেসে আসছে।

—প্রভু ! প্রভু ! বরদরাজ ! লল্লার বরদরাজ !

তিনি উৎকর্ণ হয়ে শুনতেন।

নিরবচ্ছিন্ন আহ্বান ভেসেই আসত—ভেসেই আসত।

রঙ্গনাথন উদ্‌ভ্রান্তের মত বেরিয়ে পড়তেন ঘর থেকে। সমুদ্রতটের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করতেন। উঁচু বালিয়াড়ি পার হয়ে নিচে নামতেন সমুদ্রতটে। সেই নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর দীর্ঘ ছায়া আর পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার দুগ্ধধবল আলোয় চিত্রিত-বিচিত্রিত বালুবেলার উপর তিনি ঘুরে বেড়াতেন। চীৎকার করে ডাকতেন—লল্লা—লল্লা—। জীবনলক্ষ্মী ! কোথায় তুমি ?

সমুদ্রবক্ষে সমুদ্রবিহঙ্গের দল—রাত্রেও তাদের বিশ্রাম নেই—তারা জ্যোৎস্নায় কলরব করে উড়ে বেড়াত।

কতদিন সেই নারিকেল বৃক্ষজোড়ার তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। ভোররাত্রে ঘুম ভাঙত ; পাশের দিকে তাকাতেন—। লল্লা নেই ! চুপ

করে তিনি কিছুক্ষণ বসে থেকে তারপর উঠতেন। বাড়ি ফিরতেন। এসে পূজার ঘরে বসতেন; কাঁদতেন।

পূজার ঘরটিতে সবই আছে, নেই কোন মূর্তি। সেই যে বরদরাজের মূর্তিটি চুরি গেছে, স্থানটি শূন্য হয়েছে, সে স্থান তিনি আর পূরণ করেননি। এক-এক সকালে ঘুম ভেঙে উঠেও তাঁর ভ্রম দূর হ'ত না। তিনি সেইদিনের মতই ভাবতেন—লল্লা তাঁকে না পেয়ে চলে গেছে। তিনি সমুদ্রতট ধরে হাঁটতে শুরু করতেন যোশেফদের পল্লীর দিকে।

যোশেফদের পল্লীর ছেলেমেয়েরা তাকে দেখে হাসত। ব্যঙ্গের হাসি। বলত—কি আচার্য! লল্লাকে চাই?

—লল্লা? কোথায় সে? কোথায়?

—আছে। কাল সে ফিরেছে গো।

—ডাক। তাকে ডাক। আঃ!

—কিন্তু সে তো আসবে না!

—কেন?

—সে কৃশ্চান হয়েছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা শরণ নিয়েছে। তুমি যদি কৃশ্চান হও তবে সে তোমাকে দেখা দিতে পারে।

ধীরে ধীরে তাঁর স্বাভাবিক চেতনা ফিরত। তিনি বুঝতে পারতেন—এরা তাঁকে ঠাট্টা করছে। বিষণ্নচিত্তে তিনি ফিরে আসতেন।

মধ্যে মধ্যে যোশেফের সঙ্গে দেখা হলে সে তাকে সম্ভ্রম করে অভিবাদন করে বলত—আচার্য, আবার তুমি রাত্রে বেরিয়েছিলে? পূর্ণিমার ভ্রম পেয়েছিল তোমাকে!

রঙ্গনাথন বলতেন—হ্যাঁ যোশেফ। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরের মধ্যে অকস্মাৎ যেন লল্লার ডাক শুনতে পেলাম। বার বার শুনেছি। ভ্রম তো ঠিক নয়।

যোশেফ গায়ে ক্রশ এঁকে বলত—মেইরী তোমাকে রক্ষা করুন আচার্য। প্রভু তোমাকে দয়া করুন। ভ্রম হয়তো নয়, এ সত্যই হয়তো বটে। লল্লা মরেছে তাহলে, তার প্রেতাত্মা তোমাকে ডাকে। ডেকে নিয়ে যায় সমুদ্রকূলে। তার কামনা সে তোমাকে ওই সমুদ্রে ফেলে তোমাকে আত্মহত্যা করাবে। তারপর তোমার আত্মাকে তার সঙ্গী করবে।

চুপ করে থাকতেন রঙ্গনাথন। ভাবতেন—তাই কি? মন বলত—না—লল্লা যদি মরেই থাকে তবু সে তাকে কখনও আত্মহত্যায় প্রলুব্ধ করবে না। না। তা সে কখনও করতে পারে না। তার তো কামনা

ছিল না। ছিল প্রেম—শুধু প্রেম। সে তো লীলাময়ী নয়—তাই তার নাম লল্লার বদলে কলাবন্তী থেকে কল্যাণী করে দিয়েছিলেন। তার শ্যামবর্ণ মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

মাস কয়েক পর এই ভ্রান্তিটা যেন তাঁর কমে আসতে আসতে ঘুচে গেল। কিন্তু রঙ্গনাথন তাতে তৃপ্তি পেলেন না। মনে হ'ল সব যেন শূন্য হয়ে গেছে। এই ভ্রান্তির মধ্যে তিনি যেন লল্লাকে হারিয়েও লল্লার সঙ্গে বাস করেছিলেন।

কত দিন রাত্রে এই ভ্রমের বশে কত নারিকেলছায়ার মধ্যে শীর্ণ একটি জ্যোৎস্নার ফালিকে লল্লা বলে মনে করে ছুটে গেছেন; সেখানে তাকে পান নি— তবু ভ্রম ভাঙে নি, মনে হয়েছে লল্লা কৌতুকভরে বা অভি-মানবশে এখান থেকে সরে গিয়ে গাঢ় ছায়ার মধ্যে লুকিয়েছে—তিনি খুঁজেছেন। খুঁজে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে সেই জোড়া নারিকেল বৃক্ষের তলদেশে শুয়েছেন; ভেবেছেন, সে একসময় এসে তাঁর পাশে বসে তাঁকে মৃদুস্বরে ডাকবে, প্রভু, আমি এসেছি! আমার বরদরাজ, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেছেন। স্বপ্নঘোরে মনে হয়েছে লল্লা তাঁর পাশে আছে। হাত দিয়ে তিনি নারিকেল বৃক্ষের গোড়াটি জড়িয়ে ধরেছেন। ঘুম ভেঙে গেছে। সে যেন মিথ্যার মধ্যেও তিনি বিরহ-মিলনের পরম আনন্দের সত্যলোকে বাস করেছেন। সেই বাস্তবে আনন্দলোক ক্রমে ক্রমে পরম সত্য কোথায় যেন মিলিয়ে গেল!

তিনি অনেক ভেবে স্থির করলেন— আবার তিনি দেবতা মন্দিরের বাইরে বসে দেবতাকে গান শোনাবেন।

সেদিন তিনি মান্দ্রাজ ছেড়ে আবার গেলেন কাঞ্চীভরমে বরদরাজের মন্দিরের সম্মুখে। মন্দিরচত্বরের বাইরে একটি গাছতলায় বসে তিনি বীণা নিয়ে ভজন শুরু করলেন:

> মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং
> মধু তেহপি মধুরং মধুরং মধুরং।
> মধুরং বদনং মধুরং বচনং
> মধুরং মধুরং কলেবরং।
> মধুরমধীরম নিষ্কৃতি মধুরং
> মধুতোহপি মধুরং পীতাম্বরং

মধুরং চরং চরণাভয়ণং
মধুরস্মুরঃ স্থিত রত্নং।
মধুর স্মিতমেতদহো
পেক্ষণম তনু মনোহরং।

আপন মনে তিনি গেয়ে চলেছেন। কোনদিকে দৃষ্টি তাঁর ছিল না। আত্মমগ্ন হয়ে গাইছিলেন। হঠাৎ মন্দিরচত্বর মধ্য থেকে কাঁসরঘণ্টা শিঙ এবং দামামা বাজিয়ে একদল লোক এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। তখন দেখলেন অনেক লোক তার চারিপাশে জমে গেছে, তাদেরও ওপাশে মন্দিরের সিংহদ্বার থেকে বেরিয়ে একদল লোক এসে উচ্চরোলে বাজনা বাজাচ্ছে যার মধ্যে নিজের কণ্ঠস্বর তিনি নিজেই শুনতে পাচ্ছেন না। মধ্যপথেই গান বন্ধ করলেন তিনি। বুঝলেন পুরোহিতেরা তাঁকে ক্ষমা করেন নি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন তিনি।

নাঃ। দেবমন্দির থেকে তিনি নির্বাসিত হয়েছেন। দেবমন্দিরে দেবতা কেউ নন। পুরোহিতেরাই সব। ভুল হয়েছিল তাঁর। ভুল হয়েছিল।

সেখান থেকে উঠে কাঞ্চীপুরমের প্রান্তদেশে এসে রাত্রিটা কাটিয়ে দিলেন উন্মুখ আকাশের তলায়। আশ্রয় কারুর কাছে নেবেন না তিনি। তিনি পথিক। সন্ধানে চলেছেন—লল্লার সন্ধানে। পথই তাঁর আশ্রয়।

ঘুম তাঁর আসে নি। ক্ষুধা পেয়েছিল। দুরন্ত ক্ষুধা। ক্ষুৎকাতর অবস্থায় জেগে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অকস্মাৎ কিছু দূরে মানুষের সাড়া পেয়ে তিনি একটু শঙ্কিত না হয়ে পারেন নি। মনে পড়েছিল এই বরদরাজের মন্দিরে তাঁর সেই প্রথম পালাগানের কথা। পালাগান সেরে সমুদ্রতটে নৌকা ধরবার জন্য যখন আসছিলেন তখন তাঁকে অজ্ঞাত আততায়ীরা মাথায় আঘাত হেনেছিল। প্রশ্ন করেছিল, এই গান রচনা করতে কে শেখালে তোমাকে?

আবার আজও কি তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে? সেদিন যারা আঘাত করেছিল, তাদের তিনি চিনেছিলেন। তারা যোশেফের দল। তারা কৃশ্চান হয়ে আজ নতুন শিক্ষা পেয়েছে, উন্নত হয়েছে, তারা আজ শবরদের সমাজে পতিত বললে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তিনি তাদের প্রতি উচ্চবর্ণের অন্যায় অত্যাচারে বেদনায় তাদেরই জয়ধ্বনি তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা তা বোঝে নি। আঘাত করেছিল।

আর আজ নিঃসন্দেহে যারা আসছে, তারা ঐ পুরোহিতের দল। তারা তাঁকে ক্ষমা করেন নি। তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে শবরকন্যাকে ভালবেসেছেন, তাকে বরদরাজের মূর্তিটি দিতে বলেছিলেন যোশেফকে, সে কথা শুনে অবধি তাঁর প্রতি তাদের মর্মান্তিক ক্রোধ। তিনি ফিরে এসে মার্গসঙ্গীতে সাধারণ মানুষের চিত্ত জয় করেছেন, সম্মান পেয়েছেন, সম্পদও পেয়েছেন, পেয়ে ভেবেছিলেন তিনি পুরোহিতদের চিত্তও জয় করেছেন। কিন্তু না। এদের জয় তিনি করতে পারেন নি। তারা তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেছিল—তাও তিনি করেন নি। তাতে ওদের আক্রোশ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আজ বরদরাজের মন্দিরসীমানার বাইরে বসে গান করাটাকে তারা চরম আস্পর্ধা ধরে নিয়ে, তাকে নিষ্ঠুর আঘাত করতে আসছে। তিনি স্থির হয়ে বসলেন। আসুক, যা আসবে আসুক।

লোক কটি কিছু দূরে এসে দাঁড়াল।

তিনি প্রশ্ন করলেন—কে? কারা তোমরা?

—আপনি আচার্য রঙ্গনাথন?

হেসে রঙ্গনাথন বললেন—আচার্য কি না জানি না। তবে আমি রঙ্গনাথন।

—আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বিস্ময়ে চমকে উঠলেন রঙ্গনাথন। এ যে নারীকণ্ঠ!

সর্বাঙ্গ আচ্ছাদনে আবৃত করে একটি বালকমূর্তির মত কেউ তাঁর দিকে এগিয়ে এল। এসে তাঁর সামনে, বালুর উপর হাঁটু গেড়ে বসল। নিজের অঙ্গের আচ্ছাদন সে খুলে ফেলে বললে—প্রণাম আচার্য।

সেদিন পূর্ণিমা ছিল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় প্রান্তর ঝলমল করছিল। সেই জ্যোৎস্নায় অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন রঙ্গনাথন। কী রূপ! এ কৃষ্ণাঙ্গী নয়, গৌরী—অপরূপ লাবণ্যবতী পূর্ণযৌবনা একটি মেয়ে।

রঙ্গনাথন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

মেয়েটি বললে—আমি সামান্যা। আমার নাম 'হেমাম্বা'।

—হেমাম্বা! বিস্ময়ের আর অবধি রইল না রঙ্গনাথনের। দেবদাসীশ্রেষ্ঠা হেমাম্বা! অনেককাল আগে তাকে দেখেছেন রঙ্গনাথন। সে দেখেছে আলোকমালায় উজ্জ্বল নাটমন্দিরের মধ্যে, নর্তকীর বেশে। অপূর্ব প্রসাধনে প্রসাধিতা, পুষ্পমাল্যে অলঙ্কারে সজ্জিতা। আর এ মেয়ের

অঙ্গে সে সবের চিহ্ন নেই। কিন্তু তার থেকেও অনেক শ্রীমতী মনে হচ্ছে। তার উপর এই ভুবনভরা জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার আলোয় সূর্যের দীপ্তি নেই, কিন্তু একটি আশ্চর্য রহস্য আছে। রূপকে সে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে বিশ্লেষিত করে না, একটি কুহেলী রহস্যে রহস্যময়তায় অপরূপা করে তোলে। শুভ্র সৌন্দর্যের একটি বিলেপনের প্রসাধন বুলিয়ে দেয়। মনের মধ্যে তাঁর গুঞ্জন করে উঠল—

"স্বর্ণ-কমলবর্ণাভাং সুকোমলাং সুলোচনাং শুভ্রজ্যোৎস্না বিলোপিতাং অপরূপাং মনোরমাং—।"

সলজ্জ হেসে হেমাম্বা বললে—আচার্য, আপনাকে আমি আহ্বান করতে এসেছি আমার গৃহে। যখন পুরোহিতেরা দামামা নাকাড়া শিঙা বাজিয়ে আপনাকে গানে বাধা দিয়ে স্তব্ধ করে দেয়, তখন আমি নিজেকে আচ্ছাদনে আবৃত করে ওই জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনার গান শুনছিলাম। চোখ থেকে আমার জল পড়েছিল। আপনি গান বন্ধ করলেন। তারপর উঠে নগরের পথ ধরে চলে গেলেন, আমি অনেক দুঃখ পেলাম। কাঞ্চীভরমে আপনি কোথায় যাবেন, কোথায় স্থান পাবেন তা বুঝতে পারলাম না। একটি অনুগত লোককে আপনার পিছনে পিছনে পাঠিয়েছিলাম আপনি কোথায় যান তাই দেখতে। সে গিয়ে বললে, আপনি নগর পার হয়ে এই বালুপ্রান্তরে এসে উত্তরীয় পেতে শুয়েছেন তার উপর। অভুক্ত। কারণ সে আপনাকে কোথাও খেতে দেখে নি। তাই আমি এসেছি আচার্য। কিঞ্চিৎ আহার্য নিয়ে এসেছি, দয়া করে গ্রহণ করুন, আর দয়া করে আমার গৃহে আসুন, রাত্রির মত অবস্থান করবেন।

অবাক হয়ে গেলেন রঙ্গনাথন।

বললেন—দাও, আহার্য দাও। সত্যই বড় ক্ষুধা পেয়েছিল আমার। কিন্তু তোমার ঘরে আমি যাব না দেবদাসীশ্রেষ্ঠা, তাতে তোমার বিপদ হবে।

হেমাম্বা বললে—আর আমি দেবদাসী নই আচার্য। বোধ হয় আপনি জানেন না। একদিন রাত্রে মন্দির থেকে বেরিয়ে যাবার পথে আমি অপহৃতা হয়েছিলাম। ফিরিঙ্গী পল্টনের ক'জন গোরা আমাকে ধরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সকালে আমি অচেতন হয়ে পড়েছিলাম, নগর থেকে ক্রোশখানেক দূরে। তার পর থেকে আর আমি দেবদাসী নই। এখন আমি গণিকা।

মাথা হেঁট করে বসে রইল হেমাম্বা।

রঙ্গনাথন বললেন—দাও, আমাকে আগে খেতে দাও। বলে হাত পাতলেন তিনি। আহার করে জল পান করে বললেন—আঃ! প্রাণ আহার নইলে বাঁচে না। তুমি আমাকে আহার দিলে না—প্রাণ দিলে!

হেমাম্বা বললে—এবার আমার ঘরে চলুন। আমি জানি শ্রীরঙ্গমে আপনি আম্মা সরস্বতী বাঈয়ের ঘরে অনেক দিন ছিলেন। আম্মা আপনাকে মায়ের মতই স্নেহ করতেন।

কণ্ঠস্বর মৃদু করে সে বললে—আজীবন আপনার কৃতদাসী হয়ে থাকব আচার্য। আপনি এক শবরীকে ভালবেসে তাকে হারিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়ে গেছেন। গৃহহীন বৈরাগী আপনি। আমি শবরীর চেয়ে বেশী ভালবাসতে জানি প্রভু। আমি শুধু একদিনের জন্য নয়, চিরদিনের জন্য আপনাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি। আমার অর্থ আছে প্রভু। আমি আপনাকে নিয়ে শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করে চলে যাব। মান্দ্রাজে আপনার লজ্জা হবে হয়তো। মান্দ্রাজ নয়, চলে যাব পণ্ডিচেরীতে, নয়তো কলকাতায়। যেখানে বলবেন আপনি।

স্তব্ধ নিস্পন্দ মাটির মূর্তির মত বসে রইলেন রঙ্গনাথন।

—আচার্য!

—দেবী!

—দেবী নয়, আমি হেমাম্বা—আপনার দাসী।

—অমৃতের মত বাক্য তোমার মধুর থেকেও মধুর। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

একটু চুপ করে থেকে হেমাম্বা বললে—একটা প্রশ্ন করব আচার্য?

—বল।

—কৃষ্ণাঙ্গী লল্লা, এর, অর্থাৎ যে সব গুন-রূপের কথা বলবেন, তার থেকেও অধিকতর রূপ-গুণের অধিকারিণী?

—তা আমি বলছি না, দেবী।

—তবে?

—একদিন সমুদ্রতটে, আজকের মতই এক পূর্ণিমা রাত্রে সে আমাকে বলেছিল, আপনি আমার বরদরাজ। আমি তাকে বলেছিলাম, আমি যদি তোমার বরদরাজ হই লল্লা, তবে তুমি আমার লক্ষ্মী। অথবা গোদাদেবী, যিনি লক্ষ্মী হয়েও অনার্য গৃহে জন্ম নিয়ে নিজ তপস্যায় নারায়ণের পাশে নিজ অধিকার অর্জন করে আজও প্রতিষ্ঠিতা আছেন।

—কিন্তু সে তো হারিয়ে গেছে আচার্য।

—মনে সে অক্ষয় হয়ে আছে হেমাম্বা। নইলে তোমার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতাম না। মাথায় করে নিতাম। সে আমার কাছে বরদরাজের নির্মাল্য, আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। তুমি আমাকে মার্জনা কর।

হেমাম্বা কয়েক মুহূর্ত নতমস্তকে চুপ করে রইল, তারপর প্রণাম করে উঠে ভোজনপাত্রটি হাতে করে চলে গেল। রঙ্গনাথন দেখলেন, জ্যোৎস্নার আলোয় তার গালের উপর ত্বটি রেখা চকচক করছে। কাঁদছিল হেমাম্বা।

সে দিন তিনিও কেঁদেছিলেন, তবে তারপরে—

পরদিন ভোরবেলা যাত্রা করে মান্দ্রাজ এসে পেঁছেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কাঞ্জীভরম থেকে এল বিচিত্র সংবাদ, মান্দ্রাজের উচ্চবর্ণের সমাজে এ নিয়ে পরিহাস ও ব্যঙ্গের অবধি রইল না।

ম্লেচ্ছ উচ্ছিষ্টা দেবদাসী হেমাম্বার ঘরে অন্নজল গ্রহণ করেছেন রঙ্গনাথন। রঙ্গনাথনের উপাধি রটে গেল "হেমাম্বার জার", "শবরীর অধরপিয়াসী"। মান্দ্রাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মজলিসে মার্গসঙ্গীতের আসরে তিনি গান ধরলেই কোথাও থেকে কেউ বলে উঠত—"জয় লল্লা"। গান শেষ হলে ধ্বনি উঠত, "জয় হেমাম্বা"।

তিক্ত হয়ে একদিন রঙ্গনাথন অনেক তদ্বির করে ইংরেজদের জাহাজে স্থান সংগ্রহ করে চড়ে বসলেন। যাবেন কলকাতা। কলকাতা থেকে উত্তর ভারত ঘুরবেন।

*　　　*　　　*

উত্তর ভারতের তীর্থে তীর্থে। বারাণসী প্রয়াগ অযোধ্যা বৃন্দাবন পর্যন্ত গিয়ে আর যেতে পারলেন না। সমগ্র উত্তর ভারত তখন একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অযোধ্যার নবাবের রাজ্যে কিছু শান্তি। বৃন্দাবনে কিছুদিন থাকলেন। রাধা আর কিষণজী। কিষনণজীর থেকেও রাধা প্রধান। রাধারানীর রাজ্য। জগতের পতি, পুণ্যাবতার কিষণজী তাঁর অধীন। পায়ে ধরে মান-ভঞ্জন করেছিলেন। তারপর চলে গিয়েছিলেন। সারা জীবন কেঁদেছিলেন রাধা।

কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরে বেড়াতেন, কান পেতে শুনতেন সে ক্রন্দন শোনা যায় কি না। তার মধ্যে মিল পেতেন নিজের জীবনে লল্লার ক্রন্দন আর রাধার ক্রন্দনে তফাত ছিল না তাঁর কাছে।

বিচিত্র মানুষের মন। আবার একদিন উতলা হয়ে উঠল। মনে হ'ল দক্ষিণের কথা। মান্দ্রাজ! লল্লা যদি ফিরে এসে থাকে! মনে মনে নানান কাহিনী রচনা করেন। লল্লা পথভ্রান্ত হয়ে গিয়ে পড়েছিল কোন স্থানে হয়তো। মারাঠাদের এলাকায় কিম্বা নিজামের এলাকায়—সেখানে লড়াই চলছেই চলছেই। সর্বত্র আছে ইংরেজ ফিরিঙ্গী। তারা হয়তো তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। অথবা নির্মম অত্যাচার করেছিল। মনে পড়েছিল মাল্যবান পর্বত যাবার সময়কার সেই আশ্রয়স্থল শবরপল্লী। সেই "উন্নি" মেয়েটি। ওদের গোষ্ঠী-পতির কন্যা। অত্যাচারে পাগল হয়ে গিয়েছিল। দিন রাত্রি চীৎকার করত—'না-না-না, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। মেরে ফেল। মেরে ফেল আমাকে। মেরে ফেল।' সেই 'উন্নি'র মতই হয়তো পাগল হয়ে পথে পথে ফিরে আবার ক্রমে সুস্থ হয়েছে এত দিনে। সুস্থ হয়ে মান্দ্রাজ ফিরে এসেছে। যোশেফ তাকে নিশ্চয় সব বলেছে। হয়তো বা যোশেফদের পল্লীতেই তাঁর পথ চেয়ে সে বসে আছে।

ভাবতে ভাবতে মনের বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়ে ওঠে। শেষে একদিন স্বপ্ন দেখলেন। পরদিন তিনি আবার ওঠেন। চল মান্দ্রাজ। আবার মান্দ্রাজ ফিরে যাবেন। বৃন্দাবন থেকে শহরে শহরে বড় বড় মজলিসে গান শুনিয়ে উপার্জন করে, কোথাও নৌকায়, কোথাও উটের গাড়িতে, কোথাও পদব্রজে ঘুরে কলকাতা এসে পৌঁছুলেন। এবার ফিরিঙ্গী কোম্পানির জাহাজে স্থান সংগ্রহ করবেন। মান্দ্রাজ যাবেন। মান্দ্রাজে নেমেই নিশ্চয় যোশেফদের পল্লীর কারুর সঙ্গে দেখা হবেই। তারা নৌকায় কাজ করে।

জাহাজে একটু নিজের স্থানের জন্য গিয়ে কিন্তু যোশেফের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়ে গেল।

—যোশেফ!

যোশেফও কম আশ্চর্য হয় নি, সে বললে—আশ্চর্য!

—তুমি কি আমাকে খুঁজতে কলকাতায় এসেছ? লল্লা ফিরেছে?

যোশেফ হাসলে। অতি বিষণ্ণ সে হাসি। বললে—সে দুর্ভাগিনীকে এখনও তুমি ভুলতে পার নি, আচার্য?

—ভুলতে কি পারি যোশেফ! তাকে যে আমি সত্যই ভালবেসেছি। শুধু সমাজের ভয়ে কয়েক দণ্ড বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। তার জন্য

এতদিন দুঃখ পাচ্ছি। কিন্তু তার কত বড় দুঃখ, কত বড় দুর্দশা হয়েছে ভাব তো! ওঃ—।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যোশেফ বললে—না আচার্য, সে তো ফেরে নি।—ফেরে নি। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রঙ্গনাথন। এত বড় বিশ্বাস, তীর্থের স্বপ্ন সব মিথ্যা হয়ে গেল! সংসারে কি সবই মিথ্যা! সত্য কি কিছুই নেই! হে বরদরাজ! হে শ্রীরঙ্গনাথন প্রভু! হে একাম্বরেশ্বর! হে কন্যাকুমারী! তোমার অনাদিকালের মহেশ্বর কামনার তপস্যা তাও কি মিথ্যা?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই ফিরছিলেন রঙ্গনাথন। যোশেফ তাঁকে ধরে আটকালে।

—কোথায় যাবে?

—জানি না যোশেফ। যেমন পথে পথে ফিরছি, তেমনিই ফিরব। এখানে থাকি কিছুদিন। আবার উঠব।

—না। ফিরেই চল আচার্য। মান্দ্রাজ চল। তোমার অভাব আমরা অনুভব করি। আর মান্দ্রাজের লোক তোমার বিপক্ষে যাবে না। তুমি বারাণসীতে আর বৃন্দাবনে মন্দিরে গান করেছ, সেখানকার প্রশংসা লোকের মুখে মুখে মান্দ্রাজ পর্যন্ত পৌঁছেছে। চল, ফিরে চল।

শুনে ভাল লাগল রঙ্গনাথনের। সে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—সেই জন্যই এসেছিলাম এখানে। কোম্পানির জাহাজে জায়গার জন্য। বৃন্দাবনে স্বপ্ন দেখেছিলাম যোশেফ, লল্লা মান্দ্রাজে তোমাদের পল্লীর সমুদ্রতটে আমার জন্যে বসে আছে। সেই বিশ্বাসে ফিরছিলাম বড় আশা নিয়ে। আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন, তবে তাই চল।

যোশেফ তার হাত চেপে ধরে বললে—আমি বড় নৌকা নিয়ে এসেছি ব্যবসায়ীদের মাল নিয়ে। এখন আমি নিজে মালের বড় নৌকা করেছি। এখানকার মাল নিয়ে আবার কালই রওনা হব। চল তুমি।

সেই নৌকোয় ফিরেছিলেন রঙ্গনাথন। নৌকো পথে মধ্যে মধ্যে কূলে ভিড়িয়ে বিশ্রাম করে। প্রয়োজন হয় পানীয় জলের। খাবার-দাবারেরও দরকার হয়। নৌকো সেই কারণেই ভিড়েছিল পুরীতে।

নীলমাধবের রাজধানী পুরী। সমুদ্র থেকে তার মন্দিরচূড়া দেখা যায়। হঠাৎ রঙ্গনাথনের চিত্ত আলোড়িত হয়ে উঠল।

মহাতীর্থ জগন্নাথধাম। আচণ্ডালের পরমতীর্থ! জগন্নাথ নীলমাধবের পরম প্রিয় এই শবরেরা। শবরেরাও তাঁর সেবক। সেবার

অধিকারী। মহাপ্রসাদে জাতিভেদ নেই, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য নেই। সর্ব জাতির হাতের মহাপ্রসাদ অন্ন ফিরিয়ে দেবার হুকুম নেই এখানে। এখানে সব সমান, সব সমান। ভাবতে ভাবতে রঙ্গনাথনের চোখে জল এল। আপসোস হ'ল, এতকাল সে এই মহাপ্রভু—মহান দেবতাটিকে গান শোনায় নি!

রঙ্গনাথন বীণা হাতে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—যোসেফ, আমি এখানে নামব। জগন্নাথকে আমার আজও গান শোনানো হয় নি। আমি নামব।

যোশেফ হেসে বললে—নামবে আচার্য? কিন্তু মান্দ্রাজ?

—যাব। যাব। পরে যাব। এখন আমাকে নামিয়ে দাও।

একখানা ছোট নৌকো ডাকলে যোসেফ। বললে—মান্দ্রাজকে ভুলো না।

* * *

সেই অবধি রঙ্গনাথন এইখানে রয়ে গেছেন। বড় ভাল লেগেছে। বড় ভাল লেগেছে।

প্রথম যেদিন বীণা হাতে মন্দিরচত্বরে ঢুকে পাণ্ডাদের অনুমতি নিয়ে মহাপ্রভুকে গান শোনাতে বসলেন সেইদিন, সেই গানই গেয়েছিলেন। যে গান গেয়ে তিনি তিরস্কৃত হয়েছিলেন কাঞ্জীভরমে—সেই গান—"কৃষ্ণবর্ণ চর্মের অন্তরালে যিনি বাস করেন, তিনিই বাস করেন বৈকুণ্ঠে। তিনিই বাস করেন শ্বেত পীত গৌর শ্যাম সকল বর্ণ চর্মাবৃত মানুষের দেহের মধ্যে। জীবের মধ্যে, জড়ের মধ্যে। যিনি বসবাস করেন বৈকুণ্ঠে, তিনই বাস করেন ব্রাহ্মণ পল্লীতে এবং শবর পল্লীতেও তিনিই বাস করেন। ওই কৃষ্ণচর্মের অন্তরালে যিনি, তিনিই কোথাও বরদরাজ, কোথাও জগন্নাথ, কোথাও শ্রীরঙ্গনাথন, কোথাও রামেশ্বরম, কাশীতে তিনিই বিশ্বনাথ। কৈলাসের ভবানীপতি যিনি, তিনিই কিরাতরূপী হয়ে অর্জুনের প্রণতি এবং পূজার মাল্য কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন।"

জয়ধ্বনি উঠেছিল চারিদিকে—জয় জয় জগন্নাথ, জয় নীলমাধব! একদিনেই তিনি সকলের স্নেহ প্রশংসা দুই অর্জন করেছিলেন। চিত্ত তাঁর ভরে উঠেছিল। উঠে আসবার সময় প্রভুকে প্রণাম করে বলে এসেছিলেন, সান্ত্বনা তোমার কাছেই পাব। এখানেই রইলাম জীবনের বাকী দিনগুলি।

সেই অবধি এখানেই থেকে গেছেন। শবরপল্লীর পূর্বদিকে ঘন-ঝাউবন, পশ্চিমে চক্রতীর্থের ধার থেকেও ঝাউবন, সম্মুখে বেলাভূমি, সেখানে অশ্রান্ত সমুদ্রকল্লোল, উত্তরে নীলমাধবের মন্দির। এরই মধ্যে বেছে বেছে শবরপল্লীর পূর্বদিকের ঝাউবনের মধ্যে তিনি একটি কুটির তৈরি করালেন। মনোরম ছোট একটি কুটির। দক্ষিণ মুখে একটি বারান্দা, পশ্চিমে একটি বারান্দা। সকালে উঠে পশ্চিম দিকের বারান্দায় বসে বীণায় ঝঙ্কার তুলে আলাপ করেন ভৈরবী। আবার সন্ধ্যায় চলে যান মন্দিরে, আরতি দর্শন শেষে প্রণাম করে চলে এসে দক্ষিণের বারান্দায় বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আপন মনেই সঙ্গীত আলাপ করেন। সম্মুখে সমুদ্রবক্ষে উদ্বেল তরঙ্গ-শীর্ষে বিচিত্র দীপমালা জ্বলে ওঠে মধ্যে মধ্যে। মনে মনে বলেন—এই ভাল, এই ভাল....

জপ কোটি গুণংধ্যানং ধ্যান কোটি গুণংলয়ঃ।
লয় কোটি গুণং গায়ং গানাৎ পরতরং নহি।

এর মধ্যেই জীবন তাঁর পূর্ণ হয়ে উঠুক।

মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ আসে। দেবদাসীদের নৃত্য দেখবার জন্য মন্দিরের পুরোহিত বলে পাঠান—আজ নাটমন্দিরের প্রভুর সম্মুখে এক দেবদাসী নৃত্য দেখাবার নিমন্ত্রণ করেছেন আচার্য। উপস্থিত থাকবেন আপনি।

বাকী সময়টা কাটে তাঁর ওই শবর বালক-বালিকাদের নিয়ে।

কিন্তু তার মধ্যেও অকস্মাৎ লল্লা সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। মধ্যে মধ্যে এমনও হয় যে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে যান।

মনে হয় জগন্নাথদেবের মন্দিরের মধ্যে মণিবেদীর সম্মুখে দেবতাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে লল্লা। কখনও কখনও দিনরাত্রি সব বিষণ্ণতায় ভরে যায়।

তখন চলে যান পুরী ছেড়ে। ভুবনেশ্বরের দিকে।

বিন্দু সরোবর প্রান্তে গিয়ে বসেন। সরোবরের মাঝে মন্দির। বৈশাখে চন্দনযাত্রায় ভগবান এসে ওই মন্দিরে বাস করেন। কখনও ঘোরেন মন্দিরে মন্দিরে। দেবাদিদেব মহাদেব এবং মহাদেবীর চত্বরে বসে গান শোনান।

কখনও মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ বনস্পতি কাণ্ডে লীলায়িত দেহের ভার ন্যস্ত করে প্রতীক্ষমানা তরুণীকে দেখেন। তার মধ্যে লল্লার ছায়া দেখতে পান।

কখনও চলে যান খণ্ডগিরি উদয়গিরিতে। সেখানকার চারিদিকে গভীর বন জমে উঠেছে। বাঘের ভয় আছে। সাপের ভয় আছে। কিন্তু সে ভয় যেন তাঁর চলে গেছে। সেইখানেই কোন একটি গুহাতে বসে কাটিয়ে দেন দিন। অপরাহ্ন হলে চলে আসেন। কিছুদিনের মধ্যে ভুবনেশ্বরেও ছোট একটি কুটির তৈরি করলেন।

পুরীধামে যাত্রীদের ভিড় হলে এখানে চলে আসেন। মানুষের ভিড় তাঁর সহ্য হয় না। শুধু ভাবতে ভাল লাগে।

আম্মা সরস্বতী বাঈ ঠিক বলেছিলেন—পুত্র, সব মিথ্যা। আমি জন্মেছিলাম উচ্চকুলে, রূপের জন্য কণ্ঠের জন্যে ঘর-সংসার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মানুষ আমাকে নর্তকী করে আমার যত অপমান করুক—আমাকে নিরাসক্তি একটি দিয়েছে। নিরাসক্ত হয়ে পৃথিবীকে দেখবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। দেখে বুঝেছি, মানুষ পৃথিবীতে নিতে আসে না—দিতে আসে, পেতে আসে না, হারাতে আসে। পাওয়াটা মিথ্যা, হারানোটাই সত্যি। সব হারিয়ে ফকির হয়ে পথে দাঁড়াতে অনেক দুঃখ পুত্র। তাই যে জীবনের প্রথম থেকে ফকির সে কিছু হারায় না। লল্লাকে তুমি পেয়েছিলে, লল্লা সত্যই তোমার কাছে নিজেকে ঢেলে দিয়েছিল—তাই তাকে হারিয়েছ—এবং এত দুঃখ তোমার। ভুলতে হলে আর কাউকে পেতে হবে। তাই বলি, ভগবানকে পেতে চেষ্টা কর। যাকে পেলে হারাতে হয় না।

লল্লা হারিয়ে গেছে। কিন্তু তাকে ভুলতে তিনি পারছেন না—পারবেন না। দেবতাকেও তিনি পেতে চাইতে গিয়েও যেন চাইতে পারছেন না। তাতে যে লল্লাকে হারানোর দুঃখ হারিয়ে ফেলতে হবে।

লল্লা হারিয়েছে—কিন্তু তাকে হারানোর দুঃখ তিনি ভুলতে পারবেন না। কিছুতেই পারবেন না। তা হলে লল্লা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

* * *

সেদিনও বীণায় হাত রেখে ঠিক এই কথাই ভাবছিলেন। ফাল্গুন মাস—পুরীতে ভগবানের দোলযাত্রার মহোৎসব। যাত্রীরা দলে দলে আসতে শুরু করেছে। ভিড় জমেছে দিন-দিন। কোলাহল ছেড়ে পালিয়ে ভুবনেশ্বর প্রান্তে নির্জনে তাঁর কুটিরটিতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন রঙ্গনাথন।

আজ বসে আছেন বিন্দু সরোবরের ধারে। কোথায় পুষ্পিত হয়েছে

চম্পকবৃক্ষ। মদির গন্ধ আসছে। কাছে একটি নিমগাছকে আচ্ছন্ন করে একটি মাধবীলতা পীতবর্ম শুভ্রবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পস্তবকে যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। বেলা প্রায় এক প্রহর। কোলের উপর বীণাটি রয়েছে, তাতে সুর বেঁধে তিনি তারে ঝঙ্কার দিয়ে সুর তুলছেন। কি বাজাচ্ছেন—সে সম্পর্কে খুব সচেতন নন। আঙুল তাঁর বাজিয়ে চলেছে অবচেতন মনের খেয়ালে। তিনি নিজে ভাবছেন সব মিথ্যা, এইটেই সব থেকে বড় সত্য।

পুষ্পস্তবক আচ্ছন্ন করে বন্য মধুমক্ষিকারা গুঞ্জন করছে। সে গুঞ্জনে প্রমত্তা রয়েছে। বীণাতে তাঁর অঙুল ওই গুঞ্জন ঝঙ্কারকে তুলে চলেছে। একটি কলরব এসে কানে পৌঁছল।

তিনি চোখ তুললেন। কলরবের ভাষা তাঁকে আকৃষ্ট করলে। তামিল ভাষায় কথা বলছে। দক্ষিণের যাত্রী এই সময় আসে বেশী। এই ইংরেজ মারাঠা নিজাম পিণ্ডারীদের তাণ্ডবের মধ্যে স্থলপথ বিপদসঙ্কুল। সমুদ্রপথ আষাঢ় মাসে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। তাই নৌকো করে তারা এই বসন্তোৎসব দোলযাত্রার সময় বেশী আসে। তামিলভাষী যাত্রী। স্বাভাবিকভাবেই তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন। একদল নারী পুরুষ। সন্ন্যাসিনী একজন। অনাবৃত মস্তক, মাথার রুক্ষ কেশভার চূড়া করে বাঁধা। ও কে? গলায় তুলসীর মালা! ও কে?

মুহূর্তে পঙ্গু হয়ে গেলেন তিনি।

লল্লা! লল্লা সন্ন্যাসিনী! কণ্ঠে তার তাঁরই সেই তুলসীর মালা। গৈরিক-বাসা—শীর্ণা, তপস্বিনী। আয়ত দৃষ্টিতে বৈরাগ্য। সে-লল্লায় এ-লল্লায় অনেক প্রভেদ। তবুও সে লল্লা। লল্লাও তাঁকে দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। স্থির দৃষ্টিতে দেখছে। নিষ্পলক স্থির দৃষ্টি।

যাত্রীরা তাকে বলছে—কি হ'ল? এস। কল্যাণী! কল্যাণী! লল্লা নিরুত্তর।

তিনি চীৎকার করে ডাকতে চাচ্ছেন, কিন্তু কণ্ঠ কি তাঁর রুদ্ধ হয়ে গেল?

হে বরদরাজ—হে রঙ্গনাথস্বামী—ভাষা দাও, ভাষা দাও।

লল্লা নড়েছে। স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে কম্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। সে কাছে এসে নতজানু হয়ে বসল। চারিদিকের জনতাকে গ্রাহ্য করলে না। তিনি এবার বললেন—কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেছে তাঁর—বললেন—লল্লা!

সে হাত জোড় করে স্মিত হেসে বললে—আমি কল্যাণী। কন্যাকুমারিকায় দেবী কুমারীমাতার মন্দিরের বহির্দেশ পরিমার্জনা করি—আর মাতার দৃষ্টিতে তপস্যা করি। বরদরাজকে আমার কামনা। লল্লাকে আমি জানতাম। সে সেদিন সমুদ্রজলে ডুবে মরতে গিয়েছিল। তাকে তুলেছিলেন কন্যাকুমারীর সন্ন্যাসিনী মাতা। তাঁরা নৌকোয় ফিরছিলেন পার্থসারথি দর্শন করে।

সেদিন ভোরে যখন রঙ্গনাথন চলে গেলেন তার দিকে না তাকিয়ে, তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে চোরের মত, তখন লল্লা প্রথম ভেবেছিল, বোধহয় প্রহরীরা তাঁকে খুঁজতে এসেছে—এদিকে, তাদের সাড়া পেয়ে তিনি উঠে চলে গেলেন তাদের পথ রোধ করতে। তাকে বাঁচাতে। সে সভয়ে উঠে বসেছিল। নারিকেল বৃক্ষের সন্নিবেশ যেখানে নিবিড় সেখানে গিয়ে সে লুকিয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মনের ভয় স্থির হয়ে গিয়ে জেগেছিল সংশয় ও প্রশ্ন।

রঙ্গনাথন কাল তার সঙ্গে সমুদ্রতটে বাসর পেতে তাকে বুকে টেনে নেবার সময় বলেছিলেন—কিসের ভয়? তুমি আমার পত্নী। তুমি যাবে আপনার গৃহে।

তবে? তাহলে? বার বার তার গলায় ঝুলছিল যে তুলসীর মালাখানি যেখানি তিনিই পরিয়ে দিয়েছিলেন পত্নীরূপে বরণ করে, সেখানিকে সে হাত দিয়ে বার বার স্পর্শ করেছিল। এ তো তার স্বপ্ন নয়। মিথ্যা নয়। এ তো সব সত্য। তবে, তাহলে?

এর উত্তর নারীকে কাউকে দিতে হয় না। নারীর নিজের অন্তর দিয়ে দেয়।

ওঃ, তার সারা অঙ্গে রঙ্গনাথনের দেহের উষ্ণ স্পর্শ এখনও লেগে রয়েছে। তার অধরোষ্ঠে তার চুম্বনের স্পর্শ অনুভব করছে। কী আবেগ—কী গাঢ়তা সে চুম্বনে! সে ভেবেছিল তার নারীদেহ সার্থক, নারীজীবন সার্থক। সে ধন্য, সে ধন্য। সে ধন্য হয়ে গেল।

সে তাকে বলেছিল, আপনিই আমার বরদরাজ!

তিনি বলেছিলেন, তা হলে তুমিই আমার লক্ষ্মী।

সব মিথ্যা! সব মিথ্যা! সব মিথ্যা! সত্য এমন করে মিথ্যা হয়ে যাবে? হে বরদরাজ! চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করেছিল লল্লার। কিন্তু ভয়ে সে পারে নি। ভয় হয়েছিল তার নারীত্বের ব্যর্থতার লজ্জা প্রকাশের, ভয় হয়েছিল নিজের লাঞ্ছনার, ভয় হয়েছিল

রঙ্গনাথনের লাঞ্ছনা হবে, জাতিচ্যুতি ঘটবে তাঁর সমাজে। কিন্তু সে কি করবে?
সূর্য উঠবে তখন। পূর্ব দিগন্তে আকাশমণ্ডল এবং সমুদ্রগর্ভে একটি রক্তানুরঞ্জিত মণ্ডল ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। এইবার একসময় ওই অনুরঞ্জন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে হতে সমুদ্রগর্ভ থেকেই যেন সূর্য লাফ দিয়ে উঠবেন আকাশলোকে। তিনি দেখবেন তার এই লজ্জিত কলঙ্কিত লাঞ্ছিত মুখ। ছি ছি ছি!
মর্মযন্ত্রণায় ক্ষোভের আর সীমা ছিল না তার। সে ভেবেছিল মৃত্যু ভাল। সে মরবে, সে মরবে।
উন্মত্ত ক্ষোভে যন্ত্রণায় মানুষের এক-একটি মুহূর্ত আসে যখন তার মৃত্যুভয় থাকে না পৃথিবীর ভয় বড় হয়ে ওঠে। মৃত্যু তখন পরমাশ্রয় বলে মনে হয়। সে মুহূর্তে তার কর্তব্য স্থির করে নিয়ে তার বক্ষবন্ধনীখানি খুলে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল খাড়া বালুচরের উপরে। তখন আবার জোয়ার এসেছে। বালুচরের নিচেই সমুদ্রজল গভীর হয়ে উঠেছে, উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে আঘাতের পর আঘাত হানছে।--সেখানে বসে নিজের পা দুটি বেঁধেছিল, ওই বক্ষবন্ধনী দিয়ে। আর গলায় শক্ত করে পাক দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছিল তুলসীর মালাটিকে—যেন খুলে পড়ে না যায়। থাক তার ওই পরিচয়—সে পরপার পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যাবে।
সমুদ্রজলতলে আত্মগোপনই তার ভাল। কিন্তু সে সমুদ্রতটবাসী শবরকন্যা। সাঁতার সে জানে। শৈশব থেকেই সমুদ্রের বুকে ঝাঁপ দিয়ে সে খেলা করেছে। হয়তো ঝাঁপ দিয়ে পড়েও সে সাঁতার দেবে—পালিয়ে আসবে রত্নগর্ভ সমুদ্রতল থেকে বালুচরে। সমুদ্রগর্ভে বাতাস নেই। তাই সে বেঁধেছিল তার পা দুটো। তারপর বসে বসেই কিনারায় এসে উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁপ খেয়েছিল।
ডুবেও ছিল। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে খোলা হাত দুটো দিয়ে সাঁতার কেটে উঠেছিল উপরে। কিন্তু বাঁধা পায়ের জন্য আবার ডুবেছিল। আবার উঠেছিল। আবার ডুবেছিল। তারপর আর মনে নেই। জ্ঞান হারিয়েছিল সে।

যখন চেতনা হয়েছিল, তখন সে একখানা বড় নৌকোর উপর। তার মাথার কাছে বসে এক গৈরিক বস্ত্রধারিণী সন্ন্যাসিনী।
সন্ন্যাসিনী তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, সুস্থ বোধ করছ?

অবাক হয়ে তার শান্ত প্রসন্ন মুখের দিকে সে তাকিয়েছিল এবং তাকে সে চিনতেও পেরেছিল। মান্দ্রাজে পার্থসারথির মন্দিরে সে তাঁকে দেখেছে। দরিদ্রদের দান করেছিলেন। চাল দিয়েছিলেন। সাধারণ মুষ্টিভিক্ষা নয়। এক-একজনকে একদিনের আহারের উপযোগী চাল। তারপরও তাঁকে সে দেখেছে; দেখেছে তাঁকে রঙ্গনাথনের গানের আসরে। চোখ বন্ধ করে গান শুনেছিলেন। শুনেছিল—কন্যাকুমারীর সন্ন্যাসিনী তিনি। গিয়েছিলেন নাকি জগন্নাথধাম, মহাপ্রভু দর্শন করতে। সেখান থেকেই ফিরছেন। পথে মান্দ্রাজে নেমেছিলেন—আহার্য জল সংগ্রহের জন্য, এবং তার সঙ্গে দেবতা দর্শনও করেছেন।

তিনি আবার প্রশ্ন করেছিলেন, তোমার পা এমন করে বাঁধা কেন? তুমি নিজে বেঁধেছিলে?

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করেছিল, চোখের পাতার চাপে জল গড়িয়ে পড়েছিল গণ্ডদেশ বেয়ে। কথা বলতে পারে নি। ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল, হ্যাঁ।

—তা হলে মরবার জন্যই এমন করে ঝাঁপ খেয়েছিলে?

সে চুপ করে চোখ বুজে শুয়েছিল। শুধু অশ্রুই পড়ছিল গড়িয়ে গড়িয়ে।

—কেন? মরতে চাও কেন?

সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। কথা বলতে পারে নি।

—আচ্ছা থাক। বলতে হবে না। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেন নি। জানতে চেয়েছিলেন পরিচয়। সে বলেছিল, সে অনাথা। মা বাপ ভাই কেউ নেই।

—স্বামী?

আবার কাঁদতে শুরু করেছিল সে।

তিনি তখন তাকে আর প্রশ্ন করেন নি।

পরে সুস্থ হলে সে ধীরে ধীরে সব বলেছিল মাতাজীকে। শুধু রঙ্গনাথনের নাম করে নি। বলেছিল—এক ব্রাহ্মণ তাকে সমুদ্রতটে সমুদ্রকে সাক্ষী করে বিবাহ করেছিল। সাক্ষী তার এই তুলসীর মালা। কিন্তু—

আর বলতে পারে নি লল্লা।

মাতাজী তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তারপর?

সে একটু ঘুরিয়ে বলেছিল, তারপর যে তিনি কোথায় চলে গেলেন!

—একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল, আর সন্ধান জানি না। হয়তো তাঁর সমাজ—

মাতাজী তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, সমাজ নিষ্ঠুর। শাস্ত্রও নিষ্ঠুর। মানুষের হৃদয়কে সে পাথর চাপিয়ে পিষ্ট করে দেয়। কুটিল তাদের চক্রান্ত। ঋষি দুর্বাসা চক্রান্ত কার এমনি ভাবেই এক কুমারীর তপস্যা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন কল্যাণী।

লল্লা তাঁকে তার লল্লা নাম বলে নি—বলেছিল তার নাম কল্যাণী।

মাতাজী বলেছিলেন, তিনি আজও কুমারী অবস্থাতেই স্বামীর তপস্যা করছেন।—অথচ তিনি কে জান? তিনি আদ্যাশক্তি। স্বয়ং পার্বতী। কন্যাকুমারী তীর্থের নাম শুনেছ?

ঘাড় নেড়ে লল্লা তাঁকে জানিয়েছিল, হ্যাঁ—জানে।

—সেই কন্যাকুমারীতে আমি থাকি। আমিও তাঁর পূজা করি। আমিও কুমারী। বাণ অসুরকে বধ করতে দেবী পার্বতী কুমারীকন্যার রূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। অসুরকে বধ করে তিনি কামনা করলেন পশুপতিনাথ-মহেশ্বরকে। তিনি বিবাহ করবেন, তপস্যা করতে লাগলেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবতারা এসে বিবাহের লগ্ন স্থির করে গেলেন। এই লগ্নে বিবাহ হবে। দেবী সেদিন বিবাহের সজ্জায় সেজে বরমাল্য হাতে নিয়ে সজ্জিত মণ্ডপে বসে রইলেন। ওদিকে দেবতারা মহেশ্বরকে নিয়ে মর্তালোকে যাত্রা করে এলেন। কিন্তু মহর্ষি দুর্বাসা চাইলেন না এ বিবাহ। সেও এই প্রণ। দেবী পার্বতী হিমাচলদুহিতা উত্তরাবর্তের গৌরী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। আর এ দক্ষিণের নীল-গিরিদুহিতা শ্যামাঙ্গিনী। দুর্বাসা চক্রান্ত করে বিবাহলগ্ন ভ্রষ্ট করে দিলেন। বিবাহ আর হ'ল না। শিব আজও কন্যাকুমারী মন্দিরের কিছুদূরে প্রতীক্ষা করে রয়েছেন। কিন্তু সে লগ্ন আজও ফিরে আসে নি। অনন্তকাল কুমারীকন্যা তার মাল্যখানি হাতে সেই তপস্যাই করে চলেছেন। আমি তাঁরই সেবিকা। ছোট আশ্রম আছে। আমার যিনি কাম্য তিনি পৃথিবীতে নেই। পরপারে তাঁর সঙ্গে মিলব। তিনি মহেশ্বরে লীন হয়েছেন। চল, তুমি আমার সঙ্গে চল। সেখানে থাকবে। পার তো সেই তপস্যা করবে। যাবে?

আর যদি ফিরে আসতে চাও মান্দ্রাজ তবে মান্দ্রাজগামী নৌকোতে তোমাকে ফিরে পাঠিয়ে দেবো।

লল্লার চিত্ত ভরে উঠেছিল। সে তপস্যাই বেছে নিয়েছিল।

আর সে লল্লা নয়—লল্লা মরে গেছে সমুদ্রের জলে ; যে বেঁচে আছে সে তপস্বিনী কল্যাণী।

*　　*　　*

সে শবরী। দূর থেকে সে দর্শন করেছে কন্যাকুমারীর অপূর্ব লাবণ্যময়ী সর্বালঙ্কারভূষিতা বিবাহের কন্যাবেশিনী অপূর্ব মূর্তি। মুগ্ধ হয়ে গেছে। তার সব সন্তাপ যেন মুছে গেছে।

সে মাতাজীর আশ্রমে থাকে। আশ্রমের কাজ করে। গভীর সেবা করে। বাগানের গাছের পরিচর্যা করে।

মাতাজী বলেন—তুমি আর শবরী নও কল্যাণী, তুমি ব্রাহ্মণী। তোমার ব্রাহ্মণ প্রিয়তমের মাল্য তোমার কণ্ঠে, আচারে-আচরণে পবিত্র। কেন, দূরে থাক কেন ?

লল্লা হাসে। সবিনয়ে বলে—মাতাজী, আপনার করুণাই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ওই আমার ব্রাহ্মণত্ব। ওতে আর আমার প্রলোভন নেই। মানুষকে আমি চাই না মাতাজী—আমি চাই ভগবানকে।

মাতাজী তাকে বলছিলেন—তুমি তীর্থদর্শন কর কল্যাণী। নিশ্চয় তুমি ভগবানের দয়া পাবে। তুমি পরিপূর্ণা হয়ে যাবে।

লল্লা প্রথমেই এসেছে দোলযাত্রায় পুরী। নীলমাধব দর্শনে বরদরাজ ও নীলমাধবে ভেদ নেই।

দোলযাত্রায় নীলমাধবকে দর্শন করে তাঁর বসন্তোৎসবের আবীর কুমকুম প্রসাদ নিয়ে ধন্য হয়েছে। জীবনে মানুষ রঙ্গনাথনের শূন্যস্থান তিনি পূর্ণ করে বসেছেন। তারপর আজ এসেছে সে ভুবনেশ্বর দর্শনে। এসে দূর থেকে বিন্দু সরোবর প্রান্তে ওই পুষ্পিত মাধবীলতার তলায় রঙ্গনাথনকে দেখে প্রথমটা অবশ পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। তারপর আত্ম-সম্বরণ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তপস্যাকে সে আজ পরিপূর্ণ করবে। রঙ্গনাথনের সম্মুখে হৃদয়ের দ্বারখানি বন্ধ করে দিয়ে বিদায় নিয়ে বলবে—তোমাকে নীলমাধব রূপে পেয়েছি হৃদয়ে। আর তো স্থান নেই।

সেই কথা বলতেই সে এসে নতজানু হয়ে বসে প্রণাম করে বললে—

—প্রভু, সন্ন্যাসিনী লল্লাকে অচেতন অবস্থায় সমুদ্র থেকে তুললেও সে বাঁচে নি। সে মরে গেছে। আমি লল্লা নই, আমি কল্যাণী। তবে লল্লার মরবার সময় এইটি আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে। লল্লার প্রিয়তম আপনি। আপনাকে দিতে বলে গেছে।

বলে গলার মালাগাছি খুলে তাঁর পায়ের তলায় রেখে প্রণাম করলে।

রঙ্গনাথন জড়িত কণ্ঠে আর একবার বললে—লল্লা!

—আমি কল্যাণী। আমি আসি প্রভু।

লল্লা চলে যাচ্ছে। মালাগাছি পড়ে রয়েছে। তিনি স্থাণুর মত বসেই রইলেন।

চোখ বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। বোধ হয় আপনা থেকেই। চোখের ভিতর জল ছলছল করছে। রঙ্গনাথন আর্তকণ্ঠে ডাকলেন, কল্যাণী! সে আহ্বানে না দাঁড়িয়ে পারল না সন্ন্যাসিনী।

রঙ্গনাথন প্রশ্ন করলেন—চোখ থেকে তখন অশ্রুধারা উদ্গত হচ্ছে—আর্তস্বরেই বললেন—পৃথিবীর কি সবই মিথ্যা? সন্ন্যাসিনী সহসা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে উত্তর খুঁজে নিয়েই বললেন—না প্রভু, সব সত্য। বৃক্ষশাখার বৃন্তে পুষ্পকলিও সত্য—বিকশিতদল পুষ্পও সত্য। আবার বিগলিতদল ফুলও সত্য। এবার আসি। সব সত্য।

চোখ বন্ধ করেই বসে রইলেন রঙ্গনাথন। চোখ খুলতে সাহস হ'ল না। শুধু আঙুলগুলি চলছে বীণার তারের উপর। পদশব্দ কি মিলিয়ে যাচ্ছে? হঠাৎ মনে হ'ল—এ কি, কি বাজাচ্ছেন তিনি?

ক্ষীণ একটি হাস্যরেখা ফুটে উঠল তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে।

এ তো বসন্তরাগ!

মিথ্যা কথা। জীবনে বসন্তরাগ একবার আসে। তারপর সে চিরদিনের মত মিথ্যা হয়ে যায়। শুধু রেশ—না, রেশও থাকে না, থাকে স্মৃতি। লল্লা মিথ্যা হয়ে গেছে—সত্য হয়ে উঠেছে কল্যাণী। না, সেও না। সত্য এক তপস্বিনী। তাকে দেখে স্মৃতিবিভ্রমে বসন্তরাগ বেজে উঠেছে আঙুলে। বাজুক। চোখ বুজে বাজাতে লাগলেন। হঠাৎ কানে গেল—প্রভু!

চোখ মেললেন রঙ্গনাথন। দেখলেন, লল্লা ফিরে এসে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের দিকে তাকালেন রঙ্গনাথন। বীণায় বসন্তরাগ বেজে চলেছে। থামবার উপায় নেই। লল্লা বললে—মালাগাছি,—ও গাছি আমি ফিরে চাচ্ছি প্রভু। লল্লা মরেছে—তার আত্মা ফিরে চাচ্ছে। ওতেই সে বাঁধা আছে প্রভু।

বলে মালাগাছি সে তুলে নিয়ে চলে গেল। বসন্তরাগ অকস্মাৎ যেন বীণার তারে জীবন্ত অবস্থায় বাজতে লাগল।